কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ৫৭
রকিব হাসান
সেবা
প্রকাশনী
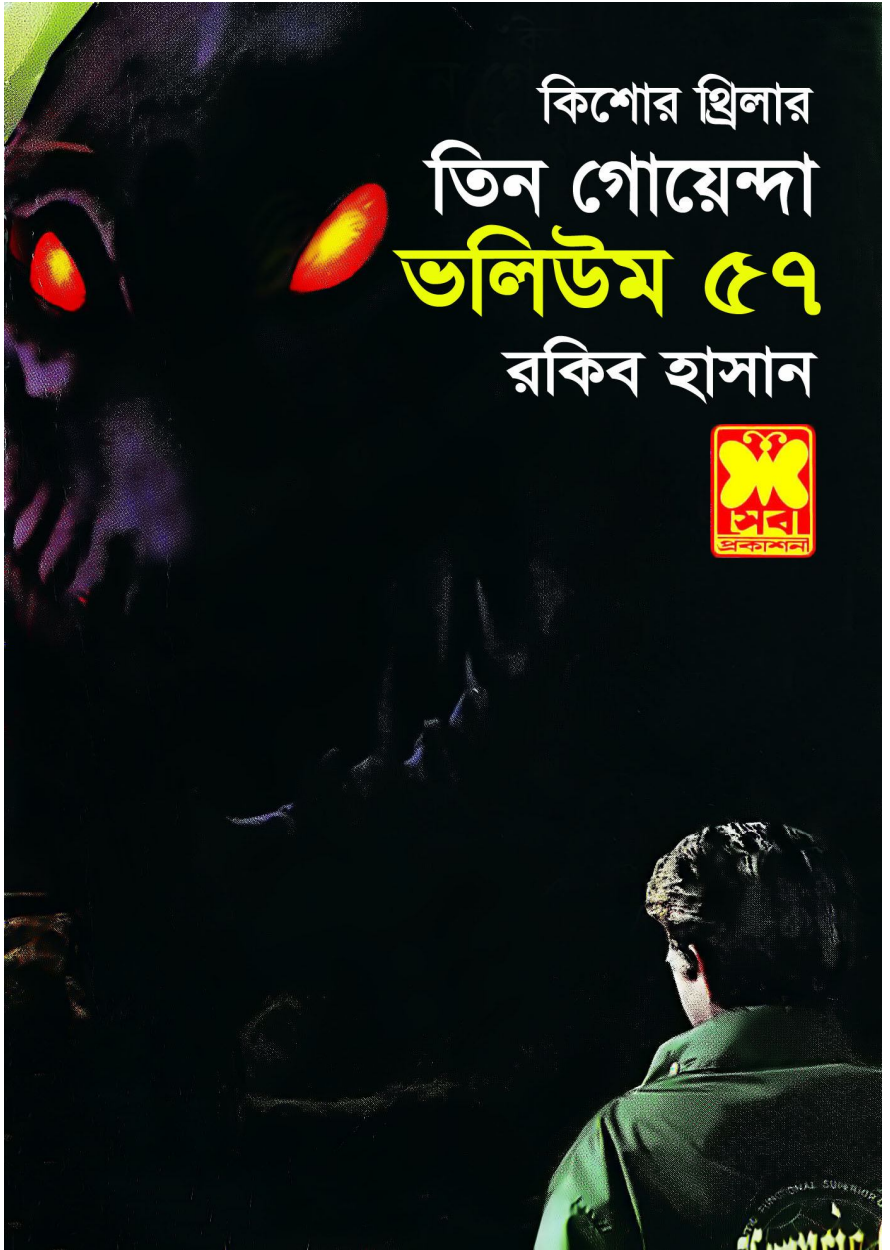
তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ৫৭

রকিব হাসান

ভলিউম-৫৭

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান
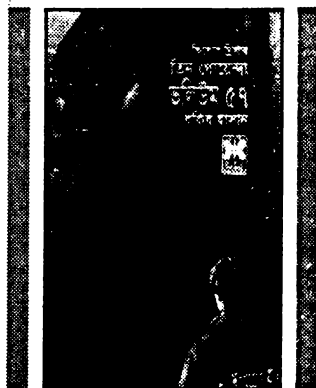
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-1513-4
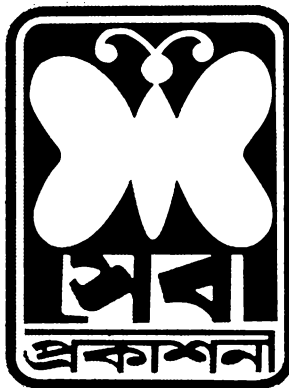
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৪

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Volume-57
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

তিপ্পান্ন টাকা

তিন গোয়েন্দা

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম:
তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অপরজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরনো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি এবার—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে!

ভয়াল দানব

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

অস্ফুট শব্দ করে উঠল রবিন।

সবগুলো চোখ ঘুরে গেল তার দিকে।

'কি হয়েছে তোমার?' জিজ্ঞেস করলেন কোচ রবিনের অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেছেন মনে হচ্ছে।

কথা বলতে চাইল রবিন। গলা দিয়ে বেরিয়ে এল ঘড়ঘড়ে বিচিত্র শব্দ। দম ফুরিয়ে আসা মাছের মত হাঁ হয়ে গেছে মুখ।

'হাঁপানির ব্যারাম আছে ওর,' বলে দিল মুসা আমান। 'কদিন আগে খুব ঠাণ্ডা লেগেছিল। তারপর থেকেই ওরকম। ইনহেলেটর লাগবে মনে হয়।'

'ইনহেলেটর!' চিৎকার করে উঠলেন কোচ, 'কোথায় ওটা? আনছ না কেন এখনও!'

এবারও জবাব দিতে পারল না রবিন। ঘড়ঘড়ে শব্দটা বেড়েছে। হেঁচকি ওঠার মত হুঁক হুঁক করতে লাগল। প্রতি মহর্তে খারাপ হচ্ছে অবস্থা। ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে হাঁটু। দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। মেঝেতে বসে আঙুল তুলে লকার রুমের দিকে দেখাল।

'নিশ্চয় লকারে রেখেছে!' মুসা বলল আবার। 'নিয়ে আসছি!'

ছুটে বেরিয়ে গেল সে। পেছনে গেল আরেকটা ছেলে। রবিনকে ঘিরে দাঁড়াল বাকি সবাই।

'অ্যাই, সরো তো দেখি,' হাত নেড়ে বললেন কোচ। 'বাতাস আটকাবে না। ওকে দম নিতে দাও।'

বাতাসের অভাব নেই। প্রচুর আছে। সমস্যাটা হলো রবিনের ফুসফুস ঠিকমত টেনে নিতে পারছে না সেটা। রোগটা বাধিয়েছে গত বছর। বড়দিনের ছুটিতে প্রবল তুষারপাতের মধ্যে বাইরে বেরিয়ে অতিরিক্ত ঘোরাঘুরি, তুষারের মধ্যে অন্য ছেলেদের সঙ্গে গড়াগড়ি করেছিল। স্নো-বল খেলেছিল। প্রথমে উঠল জ্বর। সেটা আর কমে না। ডাক্তার এসে দেখে বললেন, ফুসফুসে সামান্য দোষ আগেই ছিল, ঠাণ্ডাতে ইনফেকশন হয়ে অনেক বেড়ে গেছে। নিউমোনিয়া না হলেই বাঁচা যায়।

ওষুধ খেয়ে জ্বর সারল, নিউমোনিয়া হলো না, বিছানা থেকেও উঠল, কিন্তু হাঁপানির দোষ পড়ে গেল। বেশি পরিশ্রম করতে গেলে দম আটকে আসে। আবার যেতে হলো ডাক্তারের কাছে। দেখেটেখে তিনি বললেন, সারবে, তবে সময় লাগবে। অতিরিক্ত বেড়ে গেলে, দম নিতে কষ্ট হলে ইনহেলেটর ব্যবহার করতে হবে। তারপর থেকে সব সময় ইনহেলেটর সঙ্গে রাখে সে।

ছোট একটা প্লাস্টিকের যন্ত্র এটা। মুখে লাগিয়ে বোতাম টিপে দিলে তাজা

অক্সিজেন ঢুকে যায় গলায়। শ্বাস-নালীর পথ খুলে দিয়ে দম নিতে সাহায্য করে।

ইনহেলেটর নিয়ে ফিরে এল মুসা অন্য ছেলেটাও এল সঙ্গে।

মুসার হাত থেকে ওটা প্রায় কেড়ে নিয়ে মুখে চেপে ধরল রবিন। বোতাম টিপে দিল। দুই-তিন সেকেন্ডের মধ্যে আবার স্বাভাবিক শ্বাস নেয়া শুরু হলো ওর। গলার ঘড়ঘড় বন্ধ হয়ে গেল।

'ঠিক হয়ে গেছে,' বলে উঠে দাঁড়াল রবিন। মুসা আর অন্য ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'থ্যাংকস।'

সবাই চেয়ে আছে ওর দিকে। যেন ভূত দেখছে।

'ঘাবড়ে দিয়েছি তোমাদের, তাই না? সরি।' সবার দিকে তাকাল রবিন। হাসল। শুকনো দেখাল হাসিটা। 'এখন ঠিক হয়ে গেছে। আর অসুবিধে হবে না।'

গম্ভীর হয়ে কোচ বললেন, 'আগে জানাওনি কেন তোমার হাঁপানি আছে? ইনহেলেটর না থাকলে তো মারাই যেতে।'

'সেজন্যেই তো সব সময় সঙ্গে রাখি ওটা,' আবার হাসল রবিন। 'তাই তেমন কোন সমস্যা হয় না।'

রবিনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কোচ। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'সাহস আছে তোমার, ছেলে। বাহবা না দিয়ে পারছি না। তবে দুঃসাহস দেখানোর চেয়ে সুস্থ আর নিরাপদ থাকার কথাটা আগে ভাবা উচিত। আমি জানতামই না আমার ক্লাসে একজন হাঁপানির রোগী আছে। ওই লাফালাফিগুলো করা তোমার একদম উচিত হয়নি। আগে জানলে আমি কিছুতেই করতে দিতাম না।'

গরম হয়ে উঠছে রবিনের গাল। রাগ আর হতাশা চেপে ধরতে আরম্ভ করল ওকে। রোগটা হওয়ার পর থেকে সবাই করুণার চোখে দেখে ওকে। প্রচণ্ড দুর্বল ভাবে। সবাই খালি কথায় কথায় উপদেশ আর পরামর্শ দেয়। তাতে রাগ আরও বাড়ে ওর। যারা দেয় তাদের ওপর তো বটেই, নিজের ওপরও—রোগে ভুগছে বলে।

'সত্যি বলছি, অত মারাত্মক কিছু নয়, স্যার,' কোচকে বোঝানোর চেষ্টা করল সে। বিশবার লং জাম্প দিয়েছি আমি। আঠারোটাতে উতরে গেছি। তারমানে আমি দুর্বল নই।'

'সরি, সন,' গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন কোচ, 'কোন রিস্ক নিতে চাই না আমি। এখন থেকে এ সব লাফালাফি তোমার বন্ধ। স্কুলের ডাক্তার যতক্ষণ না সার্টিফাই করছেন, তোমাকে আর এ ক্লাসে আসতে দেয়া যাবে না।'

'কিন্তু, স্যার...'

'উঁহু!' আঙুল নেড়ে সাফ বলে দিলেন কোচ, 'অনুরোধ করে লাভ নেই। তোমাকে আর ক্লাসে ঢুকতে দিতে পারব না আমি। আগে সুস্থ হয়ে নাও। তারপর।'

*

'কিন্তু আমার ওপর যে অন্যায় করা হয়েছে, সেটা বুঝতে পারছ না!' মাকে বোঝানোর চেষ্টা করল রবিন।

টেবিলে খাবার সাজাচ্ছেন মা। 'তোর ভালর জন্যেই ক্লাসে যেতে মানা করেছেন কোচ। আমি তো তাঁর কোন দোষ দেখছি না। লাফালাফি করতে গিয়ে হাঁপ ধরে যাবে, দম আটকে মারা যাবি, সেটা আমিই বা ঘটতে দেব কেন? শোন, যতদিন না রোগটা সারে, ওসব দৌড়ঝাঁপের দরকার নেই। ঘরে বসে বসে বই পড়বি, সেটা অনেক ভাল। বরং দরকার হয়, প্রতিমাসে তোর বই কেনার টাকা দ্বিগুণ করে দেব।'

'তাই বলে খেলাধুলা একেবারে ছেড়ে দেব! বাঁচব কিভাবে?'

'শরীর খারাপ হলে কি করে খেলবি? বেশি বাহাদুরি করতে গিয়েই তো এই অবস্থা। অত মন খারাপ করার কিছু নেই। ডাক্তার তো বলেছেনই, বিশ্রাম নিলে সেরে উঠতে খুব বেশিদিন লাগবে না। ততদিন সহ্য কর।'

'কিন্তু সঙ্গে তো ইনহেলেটর থাকেই আমার,' তর্ক করতে লাগল রবিন, 'সব সময় তো অবস্থা খারাপ হয় না। মাঝে মাঝে যখন হয়, ইনহেলেটর নিলেই সেরে যায়। অত খারাপ কোথায় দেখল? তারজন্যে একেবারে ক্লাস থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে?'

'দিয়েছেন তোর ভালর জন্যেই,' শীতল কণ্ঠে বললেন মা। 'শেষে হয়তো দেখা যাবে ইনহেলেটরেও কাজ হচ্ছে না আর। বেশি বেড়ে গেলে মারা পড়বি। সেই ভয়েতেই ক্লাসে যেতে মানা করেছেন কোচ।'

যতই বোঝানো হোক না কেন, কিছুতেই মেনে নিতে পারল না রবিন। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল বিষণ্ণ ভঙ্গিতে। তুষারপাত আরম্ভ হয়েছে। বড়দিনের ছুটি চলছে। শুধু ঘরে বসে থেকে বাঁচবে কি করে? কিশোর চলে আসবে যে কোনদিন। ও এলেই তো কোন না কোন রহস্যের খোঁজ পেয়ে যায়। ওরা বাইরে গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াবে, আর সে ঘরের মধ্যে বসে বসে পচবে? এ মেনে নেয়া যায় না!

ওর মনের আগুন বাড়িয়ে দেয়ার জন্যেই যেন ঘরের পেছনের বড় ওক গাছের খোঁড়ল থেকে বেরিয়ে এল একটা কাঠবিড়ালী। কোথা থেকে একটা বাদাম জোগাড় করে এনে সেটা নিয়ে মহা আনন্দে নাচানাচি শুরু করল বরফের ওপর।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। আহা, কাঠবিড়ালীটার জীবনও তার চেয়ে কত সুখের!

রাস্তায় সাইকেলের বেলের শব্দ হলো। ফিরে তাকাল সে। ওদের গেটের সামনে এসে থামল দুটো সাইকেল। একটাতে মুসা। আরেকটাতে···

ধড়াস করে উঠল রবিনের বুক। কিশোর! এসে গেছে! লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। একটানে রান্নাঘরের দরজা টেনে খুলে, লাফ দিয়ে আঙিনায় নেমে ছুটে গেল গেটের দিকে।

সাইকেল ঠেলে ঢুকল কিশোর। চিৎকার করে বলল, 'হাই, রবিন, কেমন আছ?' চওড়া হাসিতে ভরে গেছে ওর মুখ। 'শুনলাম তোমার শরীর এখনও ভাল হয়নি। কিন্তু খারাপ হলে তো চলবে না। ফ্লোরিডায় যেতে হবে আমাদের। টিকিট হয়ে গেছে। পরশুদিন রওনা দেব। তাই তোমাকে নিতে এলাম।'

দুই

'হিরুচাচা নেপচুন কেমিক্যালসে চাকরি নিয়েছেন,' জানাল কিশোর। 'খুব আধুনিক ল্যাবরেটরি। রাসায়নিক পদার্থের গবেষণা হয়। চাকরির অফারটা ওদের কাছ থেকেই এসেছে। চাকরি মানে, গবেষণা। তাঁর মত কেমিস্ট এত বড় একটা ল্যাবরেটরিতে এ ধরনের কাজের মওকা পেয়ে লোভটা আর ছাড়তে পারেননি। হ্যাঁ বলে দিয়েছেন।'

কথা হচ্ছে রবিনদের বসার ঘরে। কিশোর আর মুসাকে দেখে টেবিলে খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন রবিনের আম্মা। খাওয়া শেষে রান্নাঘরে চলে গেছেন তিনি। তিন বন্ধু এসে বসেছে বসার ঘরে।

রবিনের বাবা মিস্টার মিলফোর্ড বাড়ি নেই। জরুরী কাজে বাইরে গেছেন। ফিরতে দেরি হবে।

যাঁর কথা বলা হচ্ছে—হিরুচাচা, অর্থাৎ ডক্টর হিরন পাশা কিশোরের আপন চাচা নন, ওর বাবার চাচাত ভাই। বাপের একমাত্র ছেলে। দাদা ছিলেন জমিদার। জমিদারি চলে যাওয়ার পরও টাকার পরিমাণ তো কমেইনি, বরং বেড়েছে আরও। ব্যবসা-বাণিজ্য করে বাড়িয়েছেন হিরুচাচার বাবা। তিনি নেই। মারা গেছেন বেশ কিছুদিন হলো। মা মারা গেছেন আরও অনেক আগে। তারপর আর বিয়ে করেননি হিরুচাচার বাবা। ছেলের জন্যে এত ধনসম্পত্তি করে রেখে গেছেন, কয়েক পুরুষ ধরে বসে খেলেও ফুরাবে না। কিন্তু সেই হিরুচাচা অন্যের কোম্পানিতে চাকরি নিতে গেলেন কেন?

'কাজটা তাঁর কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছে, তাই,' রবিনের প্রশ্নের জবাবে বলল কিশোর। 'সব সময় নতুন ধরনের কাজ আর রোমাঞ্চ খুঁজে বেড়ান। আমি জানি, কিছুদিন করবেন, তারপর বিরক্ত হয়ে গিয়ে একদিন হুট করে ছেড়ে চলে আসবেন। কোন কিছুতেই টেকেন না বেশিদিন।'

দুমাস আগে প্রথম হিরুচাচার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে ওর। এর আগে নামই শুনেছে কেবল, দেখেনি।

হঠাৎ করে স্যালভিজ ইয়ার্ডে এসে হাজির তিনি। বয়সে রাশেদ পাশার ছোট। মাত্র তিরিশ। কিন্তু এই অল্প বয়সেই এঞ্জিনিয়ারিং পাশটাশ করে বিরাট বিজ্ঞানী হয়ে বসে আছেন।

'সন্ধ্যার পর ঘরে বসে ভিসিপিতে ইনডিয়ানা জোনস দেখছিলাম—' কিশোর বলল, 'এই সময় হাঁক দিল চাচা—কিশোর, দেখে যা কে এসেছে! গত জন্মদিনে আমাকে একটা ভিসিপি উপহার দিয়েছে চাচী। ওই দেয়া পর্যন্তই, ছবি আর দেখতে দেয় না। বসে থাকতে দেখলেই তুলে নিয়ে গিয়ে ইয়ার্ডের কাজে লাগিয়ে দেয়। সেদিন চাচী বাড়ি ছিল না বলে সুযোগ পেয়ে ইনডিয়ানা জোনসের টেম্পল অভ ডুম ছবিটা ক্লাব থেকে এনে দেখছিলাম। অমৃশ পুরীর সঙ্গে ভয়ঙ্কর লড়াই চলছে হেরিসন

ফোর্ডের, এই সময় ডাক দিল চাচা। যেতে কি আর ইচ্ছে করে? মহাবিরক্ত হয়ে ভিসিপি বন্ধ করে নিচে নেমে গেলাম। ড্রইং রুমে লম্বা এক লোককে বসে থাকতে দেখলাম। সুন্দর চেহারা। হীরো হওয়ার উপযুক্ত। চাচাকে জিজ্ঞেস করলাম—ডাকছ কেন?

'কি করছিলি?—দাঁতে পাইপ চেপে রেখে জিজ্ঞেস করল চাচা।

'ছবি দেখছিলাম—রাগ করে বললাম—এমন সময়ে ডাক দিলে না···যাকগে, কি বলবে বলো?

'আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, মিটিমিটি হাসছেন আগন্তুক ভদ্রলোক।

'চাচাও হাসতে লাগল। গোঁফের কোণ ধরে টান দিয়ে, কনুইয়ের ইঙ্গিতে পাশে বসা ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলল—জানিস, ও কে?

'মুখ গোমড়া করে রেখেই মাথা নাড়লাম। যে খুশি সে হোক, আমার কি তাতে? কিন্তু বললাম না সেকথাটা।

'হাসতে হাসতে চাচা বলল—ডক্টর হিরন পাশা।

'বোমা ফাটালেও এতটা চমকে যেতাম না। হিরুচাচা! যাঁর নাম এতদিন কেবল শুনেই এসেছি, দেখিনি কখনও! শুধু বিজ্ঞানীই নন, দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চারারও তিনি। অভিযানের নেশা অবশ্য আমাদের বংশের সব পুরুষের রক্তেই কমবেশি রয়েছে। কিন্তু হিরুচাচা যেন সবার ওস্তাদ। একে তো বিজ্ঞানী, তার ওপর অ্যাডভেঞ্চারার, বোঝো ঠেলা। বাপের টাকা আছে, দেশেবিদেশে ঘুরে বেড়াতে, খরচ করতে অসুবিধে নেই। সেই লোক এসে হাজির হয়েছেন আমাদের বাড়িতে।

'তারপর আর কি? মহা জমান জমিয়ে ফেললাম। জমানোটা অবশ্য আমার চেয়ে বেশি হিরুচাচাই জমালেন। দিনরাত নানা রকম কাণ্ডকারখানা করে মাতিয়ে রাখতে লাগলেন সবাইকে। আমাদের বাড়িতে তাঁর হঠাৎ করে চলে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। জানালেন, লস অ্যাঞ্জেলেসে একটা কাজে এসেছিলেন। এত কাছাকাছি এসে আমাদের সঙ্গে দেখা না করে চলে যেতে মন চায়নি। তাই এসেছেন।

'ইয়ার্ডে আসার পর আর যেতে চাইলেন না হিরুচাচা। এতদিন পর প্রিয়জনদের কাছে পেয়ে সরতে মন চাইছে না, বোঝা গেল সেটা। আজ যাব কাল যাব করে করে রয়েই গেলেন।

'কয়েক দিন আগে নেপচুন কেমিক্যালসে চাকরি নেয়ার খবরটা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে ধরে বসলাম—আমিও যাব। কোনদিন ফ্লোরিডায় যাইনি। এভারগ্লেডস ন্যাশনাল পার্ক দেখার বড় শখ। আমাকে ফেলে যাওয়া চলবে না কোনমতেই।'

দম নেয়ার জন্যে থামল কিশোর।

'তুমি বলতেই রাজি হয়ে গেলেন?' অবাক হলো রবিন।

'হবেন না মানে? আমাকে ভীষণ পছন্দ করেন। এভারগ্লেডস দেখাতে নিয়ে যাওয়াটা তো কোন ব্যাপারই না। কথা দিয়ে ফেলেছেন, এরপর যত অভিযানে যাবেন, আমাকে সঙ্গে নেবেন।'

নাকমুখ কুঁচকে মুসা বলল, 'ইস্, তোমার ভাগ্যটাই ভাল! এত ভাল একজন চাচী পেয়েছ। যা-ই করো, কিচ্ছু বলেন না! রাশেদ পাশার মত সব কথা

শোনাঅলা চাচা তো একজন ছিলই, আরও একজন পেয়ে গেলে···আর আমাদের! দূর!'

রবিন বলল, 'বুঝলাম, তুমিই বলেকয়ে আমাদেরকেও সঙ্গে নিতে রাজি করিয়েছ হিরুচাচাকে···'

'মজাটাই তো ওখানে। আমি রাজি করাইনি। চাচা নিজে থেকেই বললেন নিয়ে যাওয়ার কথা। আমাদের সমস্ত কেসের গল্প শুনেছেন। ঝামেলার সঙ্গে ঝামেলা বাধানোর কাহিনী শুনে তো হেসে লুটোপুটি। না দেখেও তোমাদের চেনা হয়ে গেছে চাচার। খুব পছন্দ। ছোটবেলায় অনেক বেশি দুরন্ত ছিলেন তো, ছোটদের মন খুব ভাল বোঝেন। অহেতুক পেছনে লেগে থাকেন না, উপদেশ দেন না। এ কারণেই তাঁর সঙ্গে খাতিরটা আমার এত বেশি হয়েছে। দেখো, তোমাদেরও হয়ে যাবে। হিরুচাচা শুধু আমার একার নয়, আমাদের সবার চাচা। অতএব মুসা আমান, ও রকম একজন চাচা তোমার নেই বলে যে দুঃখটা তুমি করলে, সেটা অকারণ।'

হাসি ফুটল মুসার মুখে। হাত মুঠো করে ওপরে তুলে ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'হিপ-হিপ-হুররে ফর হিরুচাচা!'

রবিন আর কিশোরও সুর মেলাল।

চেঁচামেচি শুনে দরজায় উঁকি দিলেন রবিনের আম্মা। 'এই, কি হয়েছে? ভোটে দাঁড় করিয়েছিস নাকি কাউকে?'

'না, মা,' হাসিমুখে জবাব দিল রবিন, 'ফ্লোরিডায় যাচ্ছি আমরা। হিরুচাচার সঙ্গে।'

আরও অবাক হয়ে গেলেন মিসেস মিলফোর্ড। কিছুই না বুঝে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ছেলের মুখের দিকে।

তিন

দুদিন পর প্লেনে করে ফ্লোরিডা রওনা হলো ওরা। প্রথম যাবে মিয়ামিতে। ওখান থেকে আবার প্লেন বদল করে তারপর কিজারভিল।

অনর্গল কথা বলছে তিন গোয়েন্দা। এভারগ্লেড দেখার জন্যে উত্তেজিত হয়ে আছে।

আস্তে রবিনের হাঁটুতে টোকা দিয়ে হিরুচাচা বললেন, 'ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট কি বলে, শোনো।'

হেড অ্যাটেনডেন্ট দাঁড়িয়ে আছে কেবিনের সামনে। জরুরী পরিস্থিতিতে কি করতে হবে বলে দিচ্ছে। হাতে একটা অক্সিজেন মাস্ক। কি করে সেটা দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে ফেলতে হয়, দেখাল। বলল, সময়মত সীটের ওপর থেকে আপনাআপনি নেমে আসবে ওরকম একটা করে মুখোশ, নাকমুখ ঢেকে ফেলে তার মধ্যে শ্বাস নিতে হবে তখন। রবিনের কাছে অনেকটা ইনহেলেটরের মত লাগল জিনিসটা।

প্লেন ছাড়ল। সেরকম কোন জরুরী অবস্থায় পড়ল না, মুখোশ ব্যবহারেরও সুযোগ পেল না ওরা। তাতে যেন কিছুটা হতাশই হলো, বিশেষ করে কিশোর। অঘটন না ঘটায় অ্যাডভেঞ্চার কিংবা রহস্যে জড়াতে পারল না বলে। অ্যাটেনডেন্ট যে ভাবে বলে গেল, তাতে ওর মনে হয়েছিল কিছু না কিছু একটা ঘটবেই।

মিয়ামি পৌঁছে প্লেন থেকে নেমে ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে টারমিনালে ঢুকল ওরা। কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'চাচা, কি করব এখন?'

'এখানেই অপেক্ষা করব। আমাদের নিতে লোক আসবে।' ঘড়ি দেখলেন হিরুচাচা।

'ডক্টর পাশা?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ।

ফিরে তাকাল চারজনেই।

হিরুচাচা জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।'

'আমার নাম এডগার, স্যার। শুধু এড বলে ডাকলেই চলবে। আপনাদের নিতে এলাম।'

লোকটার বয়েস বিশের কোঠায়। খাটো করে ছাঁটা বাদামী চুল। কালো চোখ। নির্বিকার ভঙ্গি। পরনে ঢিলেঢালা প্যান্ট। শার্টের বুকে নেপচুন কেমিক্যালসের লোগো সিল মারা। ওদেরকে তার সঙ্গে যেতে অনুরোধ করল সে।

লোকটার চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত লাগল কিশোরের। চোখের তারা কালো, অথচ এক ধরনের হলদে আভা বেরোচ্ছে।

যার যার ব্যাগ তুলে নিয়ে এডগারের পেছন পেছন একটা প্রাইভেট হ্যাঙ্গার সেকশনের দিকে এগোল ওরা। নিজেদের প্লেন রাখে ওখানে লোকে।

ছোট একটা প্লেনের পেছনে মালপত্রগুলো তুলে দিল এড। এটার গায়েও নেপচুন কোম্পানির নাম লেখা এবং লোগো আঁকা।

কিশোর, মুসা আর হিরুচাচা বসলেন পেছনের সীটে। পাইলটের পাশে সামনের একমাত্র সীটটা দখল করল রবিন। এ ধরনের প্রাইভেট প্লেনে আর কখনও চড়েনি সে। দারুণ রোমাঞ্চ আর উত্তেজনা বোধ করতে লাগল।

'কিজারভিলে যেতে কতক্ষণ লাগবে?' জানতে চাইলেন হিরুচাচা।

এঞ্জিন স্টার্ট দিতে দিতে এড বলল, 'বড়জোর বিশ মিনিট।'

কয়েক মিনিট পর আকাশে উড়ল বিমান।

এডের দিকে তাকাল রবিন। জিজ্ঞেস করল, 'জেট প্লেনে অক্সিজেন মাস্ক ছিল। জরুরী অবস্থায় ব্যবহারের জন্যে। এটাতেও কি আছে?'

মাথা ঝাঁকাল এড। 'আছে। প্রতিটি সীটের পেছনে একটা করে। হাত দিলেই পাবে। তোমার মাথার ওপরে র‍্যাকে দেখো অক্সিজেন সিলিন্ডারও আছে। এ ধরনের জিনিস রাখা বাধ্যতামূলক, আইন করে দিয়েছে সরকার।'

দ্রুত উড়ে চলল বিমান। ঢুকে যাচ্ছে দেশের আরও গভীরে। তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। সামনে বসাতে রবিনের দেখার সুবিধে বেশি। জানালা দিয়ে সামনে, পাশে, ভালমত দেখতে পাচ্ছে সে। নিচে কালচে-সবুজ জলাভূমি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

'ওটাই নিশ্চয় এভারগ্লেডস,' মুসা বলল।

'হ্যা,' জবাব দিলেন হিরুচাচা। 'এভারগ্লেডস ন্যাশনাল পার্ক।'

চুপ করে তাকিয়ে দেখতে লাগল তিন গোয়েন্দা।

নীরবে প্লেন চালাচ্ছে এড। কথা খুব কম বলে। নিজে থেকে কিছু বলে না। প্রশ্ন করলে জবাব দেয়। তা-ও যতটা সম্ভব সংক্ষেপে। ওকে রহস্যময় মানুষ মনে হচ্ছে কিশোর পাশার কাছে চোখের আজব রঙ তো আছেই, কণ্ঠস্বরও কেমন নিষ্প্রাণ, যান্ত্রিক।

তবে এটা নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবার সময় পেল না সে। নিচের এভারগ্লেডস ন্যাশনাল পার্ক রবিন আর মুসার মত স্তব্ধ করে দিল ওকেও। যেদিকে চোখ যায়, শুধুই জলাভূমি। জানা আছে, হাজার হাজার বর্গমাইল জুড়ে থাকা ওই জলাভূমিতে ভয়ঙ্কর জন্তু-জানোয়ার আর মারাত্মক পোকামাকড়ের আড্ডা। কুমির প্রজাতির প্রাণী অ্যালিগেটর আর বিষাক্ত সাপের বাস। আর আছে চোরাকাদা। যেখানে সেখানে লুকিয়ে আছে। ভুলে কেউ পা দিয়ে ফেললে রক্ষা নেই। চোরাকাদায় তলিয়ে গিয়ে প্রাণটা খোয়াতে হবে নির্ঘাত। ওই জলাভূমি সম্পর্কে বইতে পড়েছে, ভিডিওতে ডকুমেন্টারি দেখেছে।

এতই তন্ময় হয়ে দেখছিল রবিন, এড যখন বলল—এসে গেছি—ওর মনে হলো মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড পার হয়েছে। 'সীট বেল্ট বেঁধে নাও। নামব আমরা।'

পেছনে তাকিয়ে হিরুচাচা এবং অন্য দুই গোয়েন্দাকেও বেল্ট বেঁধে নিতে বলল সে।

অবাক হয়ে ভাবছে রবিন—নামব তো বলল, কিন্তু কোথায়? এয়ারপোর্ট কই? রানওয়েও দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ চোখে পড়ল শহরটা। একটা নদীর কিনারে গড়ে তোলা হয়েছে। নামতে আরম্ভ করল প্লেন। সারি সারি বাড়িঘর আর অসংখ্য রাস্তা দেখা যাচ্ছে নিচে। একটা স্কুল আর শপিং মল চোখে পড়ল। শহরের ঠিক মাঝখানে অদ্ভুত চেহারার বিশাল কতগুলো বাড়ি যেন জটলা বেঁধে আছে। বহুতল ওই ভবনগুলোর কোন কোনটার গা থেকে বেরিয়েছে বিরাট বিরাট চিমনি। একটা চিমনি থেকে ভলকে ভলকে হলদে-নীল ধোঁয়া বেরোতে দেখে অবাক হয়ে গেল রবিন। ধোঁয়ার রঙ যে অমন হতে পারে, জানা ছিল না তার।

'কি ওগুলো?' জানতে চাইল সে।

'ওটাই হলো নেপচুন কেমিক্যালসের আসল কারখানা,' জবাব দিল এড। 'গবেষণা আর রাসায়নিক পদার্থ তৈরির কাজ চলে ওখানে। ওখানেই কাজ করতে হবে ডক্টর পাশাকে।'

ভাল করে তাকিয়ে দেখল রবিন, প্রতিটি বাড়ির গায়ে নেপচুন কেমিক্যালের লোগো আঁকা।

গবেষণাগার আর ফ্যাক্টরির ওপর দিয়ে পার হয়ে এসে নাক নিচু করে সোজা নদীর দিকে এগিয়ে গেল প্লেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ল পানিতে। উভচর বিমান। ডাঙায় যেমন নামতে পারে, পানিতেও পারে। এভারগ্লেডসের মত অঞ্চলে যাতায়াতের জন্যে এই বিমানই সবচেয়ে সুবিধেজনক।

চমৎকার একটা নৌ-বন্দর আছে নদীর পাড়ে। তবে তাতে বোট বা জাহাজের

সংখ্যা খুবই কম। দুটো বোট, একটা মালবাহী জাহাজ, ব্যস। একটা কাঠের জেটি লম্বা হয়ে বেরিয়ে এসেছে নদীতে। ওটাতে নিয়ে গিয়ে বিমান ঠেকাল এড। এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে সবাইকে সীট বেল্ট খুলতে বলল। নিজেও খুলতে শুরু করল।

'এসে গেলাম তাহলে,' পেছন থেকে বললেন হিরুচাচা।

'হ্যাঁ। নামুন। ওয়েলকাম টু কিজারভিল!' ওর কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন লক্ষ করল কিশোর। যান্ত্রিক ভাবটা কেটে গেছে। অনেক স্বাভাবিক লাগছে এখন। কি মনে হতে ওর চোখের দিকে তাকাল। হলদে আভাটাও আগের চেয়ে কম। আশ্চর্য এক লোক! একজন মানুষের এ ভাবে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন জীবনে দেখেনি সে।

সবার আগে নেমে গেল এড। বিমানটাকে জেটির সঙ্গে বাঁধল।

একে একে নামলেন হিরুচাচা আর তিন গোয়েন্দা।

ওদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নদীর পাড়ে জেটির মাথায় একটা ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। তাতেও নেপচুন কোম্পানির লোগো আঁকা। ওদের দেখে গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসতে শুরু করল বেঁটে একজন লোক।

আচমকা গোয়েন্দাদের দিকে ঘুরে গেল এডগার। চিৎকার করে উঠল, 'বাঁচতে চাইলে পালান এখান থেকে! আসুন আমার সঙ্গে!' বলে আবাব প্লেনের দিকে দৌড় দিতে গেল সে।

'খবরদার!' গর্জে উঠল ভ্যান থেকে নেমে আসা লোকটা। হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। এডগারের দিকে লক্ষ্য করে শাসিয়ে বলল, 'নড়লেই গুলি খাবে!'

চার

স্তব্ধ হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা। হিরুচাচাও চুপ।

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে কাকে যেন নির্দেশ দিল পিস্তলধারী লোকটা। আধ মিনিটের মধ্যে সাঁ করে ছুটে এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল একটা ছোট ভ্যান। হুডে কিজারভিল সিকিউরিটির লোগো আঁকা। লাফিয়ে সেটা থেকে নামল কয়েকজন ইউনিফর্ম পরা লোক। কিজারভিল পুলিশ, দেখেই বুঝতে পারল তিন গোয়েন্দা। ছুটে এল জেটিতে।

পিস্তল নেড়ে এডকে দেখিয়ে ওদের আদেশ দিল বেঁটে লোকটা, 'নিয়ে যাও একে। আর কোন গোলমাল যেন করতে না পারে।'

জোর করে এডের মুখে একটা মুখোশ পরিয়ে দিল ওরা। মুখোশে লাগানো নল গিয়ে যুক্ত হয়েছে একটা গ্যাস সিলিন্ডারের সঙ্গে। নব ঘুরিয়ে নলের মুখ খুলে দিল একজন। হিসহিস করে প্রথমে হলুদ, তারপর নীল রঙের গ্যাস এসে ঢুকতে লাগল কাঁচের মত স্বচ্ছ প্লাস্টিকে তৈরি মুখোশের মধ্যে। দেখা যাচ্ছে।

মাথা ঝাড়া দিয়ে মুখোশটা খুলে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করল এড। পারল না। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ছটফটানি বন্ধ হয়ে গেল তার। নিথর হয়ে গেল দেহ। একটা স্ট্রেচার বের করে এনে তাতে তুলে ওকে নিয়ে গেল পুলিশেরা।

যেন কিছুই হয়নি, এমন ভঙ্গি করে হেসে বেঁটে লোকটা হাত বাড়িয়ে দিল হিরুচাচার দিকে, 'ডক্টর হিরন পাশা? আমি থিওডোর কলিন্স। ঢুকেই একটা খারাপ ঘটনা দেখতে হলো আপনাদের, সেজন্যে আমি দুঃখিত। যাই হোক, ওয়েলকাম টু কিজারভিল।'

এই লোকটার কণ্ঠও কেমন অস্বাভাবিক আর যান্ত্রিক লাগল কিশোরের কাছে। চোখের দিকে তাকাল। আছে! হলদে আভাটা আছে এর চোখেও!

হিরুচাচার পর এক এক করে তিন গোয়েন্দার সঙ্গেও হাত মেলাল কলিন্স। ওদের কুশল জিজ্ঞেস করল। খুবই নিষ্প্রাণ কণ্ঠে।

'কিন্তু এ রকম কেন করল এড?' প্রশ্ন না করে পারলেন না হিরুচাচা। 'সারাটা পথ ঠিকঠাকমত এনে শেষে নামার পর পালাতে বলল কেন?'

তিন গোয়েন্দারও নীরব জিজ্ঞাসা এটা। জবাব শোনার জন্যে আগ্রহী হয়ে তাকিয়ে রইল কলিন্সের মুখের দিকে।

নিষ্প্রাণ হাসি মুছল না কলিন্সের মুখ থেকে। 'মগজে চাপ পড়েছে আরকি। প্লেন চালাতে গেলে বৈমানিকদের হয় ওরকম।...যাকগে, দুশ্চিন্তার কিছু নেই। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওকে। সুস্থ হয়ে যাবে। আসুন। আপনাদের কোয়ার্টার দেখিয়ে দিই।'

ওদের নিয়ে গাড়ির দিকে এগোল সে। যার যার মালপত্র গাড়ির ট্রাংকে তুলে রাখল নিজেরাই। গাড়িতে উঠল। কলিন্স বসল ড্রাইভিং সীটে।

শুরু থেকেই জায়গাটা পছন্দ হয়নি রবিনের। এডগারের ঘটনার পর আরও খারাপ লাগল। প্রখর রোদ। বাতাসও গরম। গ্রীনহিলসের চেয়ে ভাল তো নয়ই, বরং খারাপ। অথচ বইয়ে কত ভাল ভাল কথাই না পড়েছে এভারগ্লেডের আবহাওয়া সম্পর্কে। হতে পারে, মন ভাল না বলে জায়গাটাকেও ভাল লাগছে না ওর।

মুসারও মন খারাপ। দুশ্চিন্তা। বেড়াতে এসে শেষে কোন বিপদের মধ্যে ঢুকল কে জানে! প্লেন চালিয়ে বৈমানিকদের মাথা এ রকম খারাপ হয়ে যায়, কলিন্সের এ কথা বিশ্বাস করতে পারছে না।

আর কিশোর তো বিশ্বাস করছেই না। মনে মনে রোমাঞ্চ অনুভব করছে সে। যাক, রহস্য একটা বোধহয় মিলেই গেল। হিরুচাচার মনের ভাবও অনেকটা ওর মতই। ভাবছেন, সবে তো শুরু। দেখাই যাক না কি ঘটে? তাই চুপ করে রইলেন। এডগারের ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করলেন না কলিন্সকে।

'নিজস্ব একটা স্বকীয়তা গড়ে তুলেছে কিজারভিল,' যান্ত্রিক কণ্ঠে লেকচার আরম্ভ করল কলিন্স। 'এখানে সবাই কোম্পানির কাজ করে। ছোটরাও বসে থাকে না। সবার জন্যেই কাজ আছে। সব আছে আমাদের। বাড়িঘর, স্কুল, হাসপাতাল, খেলার মাঠ, শপিং মল।' পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেসব দেখাতে দেখাতে চলল সে।

'মনে হচ্ছে নিজস্ব পুলিশ ফোর্সও আছে আপনাদের,' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে কিশোর। পথের প্রতিটি মোড়ে একজন করে ইউনিফর্ম পরা লোক দাঁড়ানো, এডগারকে নেয়ার জন্যে যারা এসেছিল তাদের মত পোশাক। 'এত পুলিশ দিয়ে কি করেন আপনারা? প্রচুর খুনখারাপি হয় নাকি?'

'না না, তা কেন হবে!' শুকনো হাসি হাসল কলিন্স। 'বরং উল্টোটা বলতে পারো। খুনখারাপি তো দূরের কথা, কোন অপরাধই হয় না এখানে।'

'তাহলে এত পুলিশ কেন?'

হাসিটা মিলিয়ে গেল হঠাৎ। শক্ত হয়ে গেল কলিন্সের চোয়াল। কঠিন কণ্ঠে বলল, 'একটা কথা জানিয়ে রাখি, এখানে অতিরিক্ত কৌতূহল দেখায় না কেউ।'

এরপর সারাটা পথ আর কোন কথা বলল না সে। তিন গোয়েন্দা বা হিরুচাচাও কোন প্রশ্ন করলেন না।

একটা বাড়ির সামনে এনে গাড়ি দাঁড় করাল কলিন্স। নতুন বাড়ি। সাদা রঙ করা দেয়াল। কালো ছাত। চওড়া একটা ড্রাইভওয়ে আছে। গলির অন্য সব বাড়িগুলোও সব এক রকম, কেবল রঙ আলাদা। একেকটার একেক রঙ।

'এসে গেছি,' কলিন্স বলল, 'এটাই আপনাদের বাসা, ডক্টর পাশা। নিশ্চয় খুব ক্লান্ত হয়ে আছেন। যান, গিয়ে বিশ্রাম নিন। এই যে, চাবি। যা যা দরকার সব পাবেন ভেতরে। টেলিফোন, কেব্‌ল্ টিভি, রান্নার জিনিসপত্র—সবই আছে। গ্যারেজে নতুন গাড়িও আছে।' চাবি দেয়ার পর একটা কার্ড বের করে দিল সে। 'কোথায় কাজ করতে যাবেন, লেখা আছে এতে। নিচের নম্বরটা আমার। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে এই নম্বরে ফোন করবেন। পেয়ে যাবেন আমাকে।'

'থ্যাংক ইউ,' হিরুচাচা বললেন। 'আশা করি আমাদের পাইলটের কোন অসুবিধে হবে না।'

'আরি, আপনিও দেখছি ছেলেদের মত দুশ্চিন্তা শুরু করলেন। ওর দায়িত্ব এখন আমাদের। কোন অসুবিধে হবে না। এতটা খাতির পাবে, ও আর কোনদিন কিজারভিল ছেড়ে যেতেই চাইবে না। আপনারাও যেতে চাইবেন না।'

কিশোরের মতই রবিনেরও মনে হলো, লোকটার কথাগুলো বড় বেশি মোলায়েম, কেমন যান্ত্রিক। অস্বাভাবিক। আপনারাও যেতে চাইবেন না বলে কি বোঝাতে চাইল? রোদের মধ্যেও শীতল একটা শিহরণ খেলে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। বুকে চাপ লাগছে। দম নিতে গিয়ে একধরনের অস্বস্তিকর সুড়সুড়ি লাগছে গলার ভেতর।

ওর দিকে ঘুরে গেল হিরুচাচার চোখ। 'কি হয়েছে? শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে?'

'না, আমি ভালই আছি,' আবার তাকে করুণা দেখানো শুরু হোক, এটা চায় না রবিন মোটেও। কফ জমেছে যেন, কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কারের ভান করল।

'ঠাণ্ডা বাধিয়ে এসেছ মনে হচ্ছে,' হেসে বলল কলিন্স।

হিরুচাচা জবাব দেয়ার আগেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল রবিন, 'হাঁচি আসছে। অন্য কিছু না।'

'কিছু হলেও অসুবিধে নেই,' যান্ত্রিক হাসিটা লেগে আছে কলিন্সের ঠোঁটে। 'ফ্লোরিডায় চলে এসেছ এখন, কিজারভিলে রয়েছ। যে কোন ধরনের ঠাণ্ডা আর পালানোর পথ পাবে না।' রবিনের দিকে তাকিয়ে রসিকতা করে চোখ টিপল সে। তারপর হিরুচাচার দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকিয়ে বিদায় নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

হাতে হাতে যার যার ব্যাগ-সুটকেস নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো ওরা। হাঁটতে হাঁটতে মুসা বলল, 'হাঁপানির কথা বলতে অত লজ্জা পাচ্ছিলে কেন? রোগ

রোগই। কেউ তো আর ইচ্ছে করে বাধায় না।'

গম্ভীর হয়ে রবিন বলল, 'কিন্তু সব রোগকে লোকে ভাল চোখে দেখে না। গ্রীনহিলসে কি অত্যাচারটাই না সহ্য করেছি গত একটি বছর ধরে! হাঁপানি আছে শুনলে সবাই যেন কেমন চোখে তাকায় আমার দিকে! আমি চাই না, এখানেও অসুখের কথাটা কেউ জেনে ফেলুক আর ওরকম শুরু করুক।'

'জানাজানি বন্ধ করবে কিভাবে? কারও সামনে রোগটা বাড়লেই ধরে ফেলবে। মানুষ তো আর অত বোকা নয়।'

'যখন ফেলে তখন দেখা যাবে। আমি নিজে অন্তত জানাতে যাচ্ছি না কাউকে। তোমাদের কাছে অনুরোধ, তোমরাও জানিয়ো না।'

গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর। কি যেন ভাবছে। দুই হাতে বোঝা থাকায় নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে পারছে না।

'কি ভাবছ?' জানতে চাইল মুসা।

দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। থমকে দাঁড়াতে হলো হিরুচাচাকেও, নইলে ওর গায়ের ওপর গিয়ে পড়তেন। মুসার দিকে তাকাল। 'এডগার হঠাৎ ওরকম অসুস্থ হয়ে পড়ল কেন? কি মনে হয় তোমাদের?'

মুসা চুপ করে রইল। কি জবাব দেবে ভাবছে।

রবিন বলল, 'আমার রীতিমত অবাক লেগেছে। ওর চোখ দুটোর রঙ দেখেছ? হলুদ। কারও চোখে ওরকম আভা আমি দেখিনি কখনও!'

'ও, তুমিও লক্ষ করেছ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'ব্যাপারটা আমার কাছেও স্বাভাবিক মনে হয়নি,' হিরুচাচা বললেন। তারমানে তিনিও দেখেছেন। 'আমার ধারণা, কোন ধরনের কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের শিকার হয়েছে এডগার। ল্যাবরেটরিতে ইঁদুরের ওপর গবেষণা চালাতে গিয়ে ওরকম হয়ে যেতে দেখেছি।'

মুসা ছাড়া বাকি তিনজনই লক্ষ করেছে এডের অস্বাভাবিকতা।

নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর, 'আমাদের নিয়ে আসার পর চলে যাওয়ার কথা বলল কেন? পালাতেই যদি বলবে, আনল কেন?'

নাক কুঁচকাল মুসা। জোরে শ্বাস টানল। 'আশ্চর্য! রহস্য যেন পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায় তোমার! শহরে ঢুকতে না ঢুকতেই পেয়ে গেলে একটা।'

'ভালই তো,' হেসে বললেন হিরুচাচা, 'বোর ফিল করবে না আর কেউ। একটা কাজ পেয়ে গেলে।'

'হুঁ!' হাত থেকে সুটকেস ছেড়ে দিল মুসা। নাক চুলকাল। 'তা পেয়েছি। তবে এখানে রহস্য ভেদ করতে যাওয়াটা বড়ই বিপজ্জনক হবে, সেটাও বুঝতে পারছি। যেভাবে মুহূর্তে পিস্তল বের করে ফেলল কলিন্স!' চুলকানো শেষ করে আবার তুলে নিল সুটকেস দুটো।

সামনের দরজার তালা খুললেন হিরুচাচা। ঘরে ঢুকল সবাই। ভেতরে পা রেখে চারদিকে একনজর চোখ বুলিয়েই হতবাক। কলিন্স বলেই দিয়েছে কোন কিছুর অভাব হবে না। কিন্তু তবু অবাক হতে হলো। এতটা আশা করেনি।

ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠল। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। নিচতলার

লিভিংরুম এটা। নতুন আসবাবপত্রে সাজানো। চুয়ান্ন ইঞ্চি পর্দার টেলিভিশন, অত্যাধুনিক ভিসিআর, কম্পিউটার, অডিও সেট—কোন ইলেকট্রনিক জিনিসেরই অভাব নেই।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'এই যদি হয় লিভিংরুমের অবস্থা, বেডরুমগুলো কেমন?'

'দেখে আসি,' বলে ওপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে এগোল রবিন।

ওপরতলার লম্বা বারান্দার একপাশে অনেকগুলো দরজা। একটা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল সে। বেডরুম। লিভিংরুমের মতই সাজানো-গোছানো আর জিনিসপত্রে ভরা।

হাঁ হয়ে গেল বিছানার দিকে তাকিয়ে। ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা বিছানা। ঠিক মাঝখানে বসে আছে একটা নীল কাকাতুয়া। এগোতে এগোতে বলল রবিন, 'অ্যাই যে মিস্টার বার্ড, কে তুমি? এখানে ঢুকলে কি করে?'

জবাবও দিল না পাখিটা। নড়লও না।

এগিয়ে গেল রবিন। নড়ছে না পাখি।

ধরার জন্যে হাত বাড়াল সে।

উড়ে গেল না ওটা।

খপ করে ধরে ফেলল রবিন। তবু নড়ল না কাকাতুয়া। ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছটফট করল না। মরে শক্ত হয়ে গেছে।

পাঁচ

পাখিটাকে নিচতলায় নিয়ে এল সে। দেখে ওর মতই অবাক হয়ে গেল মুসা আর কিশোর। হিরুমামা নেই। বাথরুমে ঢুকেছেন।

'আশ্চর্য!' ভুরু কুঁচকে ফেলেছে কিশোর। 'মরা পাখি বন্ধ বেডরুমে গেল কি করে?'

'সত্যি বিছানার ওপর পেয়েছ?' মুসাও বিশ্বাস করতে পারছে না।

'মিথ্যে বলতে যাব কেন?'

'তা-ও তো কথা!'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'কিশোর, কেউ ফেলে যায়নি তো?'

'কে ফেলে যাবে?'

'গেছে হয়তো কেউ। বদ্ধ ঘরে আটকা থেকে খেতে না পেয়ে মরে গেছে পাখিটা। মরার আর তো কোন কারণ দেখি না। শরীরে কোথাও কোন জখমও নেই।'

'হুঁ, আরও একটা রহস্য!' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।

'ঘরে থাকলে গন্ধ হয়ে যাবে,' মুসা বলল। 'ফেলে দিয়ে আসা দরকার।'

'যাচ্ছি,' বলে দরজার দিকে রওনা হলো রবিন।

বাইরে বেরিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। এতই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে-তকতকে, মরা একটা পাখি ফেলতে ইচ্ছে করল না কোথাও। বেরিয়ে এল গেটের বাইরে। ঠিক করল একটা ঝোপের ধারে কবর দেবে। পথের মাথায় একটা ঝোপ দেখে রওনা হলো সেদিকে।

মাটি নরম। খালি হাতেই খুঁড়তে লাগল। এই সময় মনে হলো কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। ফিরে তাকিয়ে দেখে ওরই বয়েসী একটা মেয়ে। লাল চুল। গাল তিলে ভরা। নীল চোখ। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

রবিন তাকাতে জিজ্ঞেস করল, 'কি করছ?'

মাটিতে পড়ে থাকা কাকাতুয়াটাকে দেখে ফেলল মেয়েটা। চিৎকার করে উঠল, 'আরি! ওয়ালিদের পাখি! যাহ্, গেল বুঝি মরে! কবে যে বন্ধ হবে এ সব…আর সহ্য হয় না!' রীতিমত কাঁপছে।

মরা পাখি দেখেই এত ভয়? রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি? কি বন্ধ হবে?'

'না, কিছু না। সরি,' গাল ডলল মেয়েটা। দ্রুত সামলে নিল। 'পাখিটাকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।…আমি ডেট, ডেট কেভান। রাস্তার ওই পাড়ে থাকি।' হাত তুলে হলুদ একটা বাড়ি দেখাল সে।

'আমি রবিন মিলফোর্ড। একটু আগে এলাম। আমার চাচা এখানকার ল্যাবরেটরিতে কেমিস্টের চাকরি নিয়েছেন। আমার সঙ্গে আমার দুই বন্ধুও এসেছে।'

আতঙ্কে চোখ বড় বড় হয়ে গেল মেয়েটার। 'তোমার চাচা কেমিস্টের চাকরি নিয়েছেন? সর্বনাশ! এখনি গিয়ে বলো ওখানে না যেতে। ল্যাবরেটরিতে ঢুকলে আর রক্ষা নেই…'

মেয়েটার কথা শেষ হওয়ার আগেই হলুদ বাড়িটার সামনের দরজায় বেরিয়ে এলেন এক মহিলা। ডেটের মত একই রঙের চুল। ডাক দিলেন, 'ডেট, জলদি এসো। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'আমার আম্মা,' ডেট বলল। 'যাই।'

মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'কোন গ্রেডে পড়ো তুমি?'

'সেভেনথ।'

'আমিও সেভনথ।'

'ডেট!' গলা চড়িয়ে ডাকলেন মিসেস কেভান। 'আসছ না কেন!'

'যাও, যাও, তোমার আম্মা রেগে যাচ্ছেন।'

'দুঃখটা তো এখানেই। কত ভাল ছিল আমার আম্মা। কখনও চড়া গলায় কথাও বলত না আমার সঙ্গে, ধমক দেয়া তো দূরের কথা। আর এখন…যেই ওই শয়তান ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে গেল, ব্যস, সব শেষ…' চোখে পানি টলমল করে উঠল ডেটের। 'যাই।'

'ডেট,' রবিন বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল। আবার কখন দেখা হবে?' অনেক প্রশ্ন জমে গেছে ওর মনে। মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে।

'আজ রাতেই হতে পারে। কিজার কিড মীটিঙে।'

'কিজার কিড? সেটা আবার কি?'

'এখানকার ছেলেমেয়েরা সব কিজার কিড। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মীটিং হয় তাদের। একেকদিন একেক গ্রেডের। শহরের সমস্ত ছেলেমেয়ের তাতে যোগ দেয়া বাধ্যতামূলক। আজ রাতে হবে আমাদের বয়েসীদের। স্কুলের অ্যাসেম্বলি রুমে, সাতটার সময়। তোমরা এসেছ, এখন তোমাদেরও যেতে হবে, মাফ নেই।'

'কিন্তু আমরা তো এখানে বেড়াতে এসেছি। স্কুলে ভর্তি হব না। কিজার কিড হতে যাব কোন্ দুঃখে?'

'দুঃখ থাক বা না থাক, যেতে হবে, এটাই নিয়ম। না যেতে চাইলে সিকিউরিটি এসে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে।'

'ডেট!' চিৎকার করে উঠলেন মিসেস কেভান।

'আসছি তো,' মাকে জবাব দিয়ে মাটিতে রাখা মরা পাখিটার দিকে তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। রবিনের দিকে ফিরল আবার। 'সন্ধ্যা সাতটা, মনে রেখো।' আর দাঁড়াল না। দৌড়ে চলে গেল বাড়ির দিকে।

তাকিয়ে আছে রবিন। ডেটকে কি যেন বললেন ওর মা। কথা শোনা না গেলেও মহিলা যে অসন্তুষ্ট হয়েছেন বুঝতে পারল রবিন।

মরা পাখিটাকে কবর দিয়ে ঘরে ফিরে এল সে। এত দেরি হলো কেন জানতে চাইল কিশোর।

মেয়েটার কথা বলল রবিন।

হাত নেড়ে উড়িয়ে দিল মুসা, 'বিশ্বাস কোরো না। কিছু মেয়ে আছে অহেতুক ফড়ফড় করে। বানিয়ে গপ্পো বলার ওস্তাদ। তোমাকে নতুন দেখেছে তো, চমকে দেয়ার চেষ্টা করেছে।'

'ওর কি লাভ তাতে?'

'লাভ-লোকসান জানি না। তবে এ রকমই করে।'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'হিরুচাচাকে বলব নাকি?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, এখুনি বলার দরকার নেই। যাক না ল্যাবরেটরিতে। সত্যি যদি ডেটের মায়ের মত অন্যরকম হয়ে যায়, তাহলে তো ভালই। একটা রহস্য পেয়ে যাব। জানার চেষ্টা করব, কেন ওরকম হয় মানুষগুলো। সমাধানের ব্যবস্থা করা যাবে তখন।' এক মুহূর্ত ভাবল সে। 'তা ছাড়া এখন বললেও বিশ্বাস করতে চাইবেন না। হেসে উড়িয়ে দেবেন।'

'এডগারের ঘটনাটার পরেও?'

'সেটাই তো সমস্যা। যদি বোঝে, সত্যি রহস্যময় ঘটনা ঘটছে ল্যাবরেটিতে, তাহলে আরও বেশি করে যাবে, জানার জন্যে, কি ঘটছে ওখানে। মোটকথা, বিশ্বাস করলেও যাবেন, না করলেও যাবেন, কোনভাবেই ঠেকানো যাবে না। তারচেয়ে বরং অপেক্ষা করে দেখি, কিছু ঘটে কিনা।'

'ঠিক আছে, তাঁকে কিছু বলব না,' মুসা বলল, 'কিন্তু আমরা মীটিঙে যাব কেন? সিকিউরিটি এসে ধরে নিয়ে যাবে, বললেই হলো! আমরা এখানকার কেউ নই। সুতরাং যেতেও বাধ্য নই।'

'কিন্তু আমি যাব,' কিশোর বলল। 'ওদের এসে ধরে নিয়ে যাওয়া লাগবে না। আগ্রহ আর কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে আমার। সত্যি সত্যি রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি এখন।'

*

সেদিন সন্ধ্যায় গাড়িতে করে স্কুলে পৌঁছে দিলেন ওদেরকে হিরুচাচা। স্কুলের সামনে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'যা। মীটিং শেষ হলে এসে নিয়ে যাব।'

কিশোর বলল, 'আচ্ছা।' গম্ভীর হয়ে আছে সে।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেলেন তিনি। ভাবভঙ্গি তাঁরও খুব একটা ভাল মনে হলো না।

গেটের দিকে এগোল ওরা। ওপরে বড় বড় অক্ষরে স্কুলের নাম লেখা। আরও অনেক ছেলেমেয়েকে নামিয়ে দিয়ে গেছে ওদের বাবা-মায়েরা। গেট দিয়ে ঢুকছে সবাই। তাদের দলে তিন গোয়েন্দাও শামিল হয়ে এগিয়ে চলল গেটের দিকে।

ছেলেমেয়েরা সব ওদের বয়েসী।

একটা ব্যাপার বেশ ভালমত লক্ষ করল রবিন, সবাই খুব ভদ্র, চুপচাপ। কথা বলে না। অবাক লাগল ওর। পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া একটা ছেলেকে বলল, 'অ্যাই, শোনো, আমার নাম রবিন মিলফোর্ড। তোমার?'

ফিরে তাকাল ছেলেটা, কিন্তু জবাব দিল না। সোজা হেঁটে চলে গেল।

ঘটনাটা আরও বেশি অবাক করল ওকে। কেউ হাসছে না, কথা বলছে না। এই বয়েসী ছেলেমেয়েরা কথা বলে না, মীটিঙে এলে হই-চই করে না, অথচ একই ক্লাসের ছাত্র—এ রকম কাণ্ড দেখা তো দূরের কথা, শোনেওনি কখনও সে। পুরোপুরি অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার। সবচেয়ে বেশি অবাক লাগল, কিশোর আর মুসার আচরণ দেখে। বাড়ি থেকে বেরোনোর পর একটা ফালতু কথা বলেনি। সকালেও এমন ছিল না। এখানে আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেন 'কথা না বলার' রোগে ধরে ফেলেছে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে ডেটকে খুঁজতে লাগল রবিন। দেখল না ওকে। হলরুমে দেখা হবে হয়তো।

দলের সঙ্গে বিশাল এক হলরুমে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। সারি সারি ডেস্ক। কেউ হুল্লোড় করল না, ঠেলাঠেলি করল না, খুব শৃঙ্খলার সঙ্গে বসে গেল সবাই। সামনের দেয়ালে ঝোলানো বড় একটা ব্ল্যাকবোর্ডের ওপরে সবুজ রঙের কিজার লোগো। এই আরেকটা ব্যাপার ভাল লাগল না রবিনের। কিজার লোগোর ছড়াছড়ি এখানে। যেখানেই যাক, দেখা যাবে। যেদিকেই যাক, কয়েক গজ পর পরই কোথাও না কোথাও চোখে পড়বে এ জিনিস।

চকচকে উজ্জ্বল সাদা রঙ করা ঘরের দেয়াল। ওর মনে হতে লাগল, বাস্তবে নেই, অদ্ভুত কোন সাইন্স-ফিকশন সিনেমার চেম্বার। চঞ্চল হয়ে ডেটকে খুঁজতে লাগল ওর চোখ। দেখতে পেল এবার। ওর খুব কাছেই একটা ডেস্কে বসেছে।

'হাই,' বলে উঠতে যাচ্ছিল রবিন। সেটা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে ঠোঁটে আঙুল রেখে কথা বলতে নিষেধ করল ডেট। চুপ হয়ে গেল রবিন।

'কেমন আছ তোমরা?' কথা শোনা গেল সামনে থেকে।

'ভাল আছি, মিস্টার কলিন্স!' সমস্বরে জবাব দিল সবাই।

চমকে ফিরে তাকাল রবিন। মুখ তুলে দেখল, সকালের সেই বেঁটে লোকটা—থিওডোর কলিন্স। জ্যাকেটের বুকে কিজার লোগো।

'শোনো, প্রথমেই একটা জরুরী কথা বলে রাখি,' সেই একই রকম নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক গলায় বলল লোকটা, 'তোমাদের একটা নতুন কাজ করতে হবে। লক্ষ রাখবে কিজারভিলের নিয়ম-নীতি মানছে না এ রকম কেউ আছে কিনা। সেটা জানাতে হবে আমাকে। যেই হোক—কোন ছাত্র, শিক্ষক, এমনকি নিজের মা-বাবা হলেও গোপন করা যাবে না। বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ, মিস্টার কলিন্স!' আবার সমস্বরে জবাব দিল সবাই।

সাংঘাতিক অবাক হলো রবিন। এ সব কি চলছে এখানে?

'এই ছেলেটা হ্যাঁ বলেনি, মিস্টার কলিন্স!' রবিনের পেছন থেকে বলল একটা মেয়ে।

মুহূর্তে সমস্ত ক্লাসের সব কটা চোখ ঘুরে গেল ওর দিকে। এমন দৃষ্টিতে দেখছে যেন কোন মহাঅপরাধ করে ফেলেছে সে।

ছয়

ভয় পেয়ে গেল রবিন। সবগুলো চোখে ঘৃণা দেখতে পাচ্ছে। কিশোর আর মুসার দিকে তাকাল। আশা করল, ওরা ওর পক্ষ নেবে। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে নির্বিকার রইল ওরা। কেমন যেন বদলে গেছে ওই দুজনও।

বুকে সামান্য চাপ অনুভব করল রবিন। আতঙ্কিত হয়ে গেল। আবার না হাঁপানির টান পড়ে এখন।

নিষ্প্রাণ পাতলা হাসি হেসে তিন গোয়েন্দাকে উদ্দেশ্য করে থিওডোর কলিন্স বলল, 'ওরা নতুন এসেছে কিজারভিলে। আজকে। এখানকার নিয়ম-কানুন এখনও শিখে উঠতে পারেনি। চিন্তার কিছু নেই। খুব তাড়াতাড়িই শিখে ফেলবে।'

হাঁপানি এখন বাড়তে দেয়া যাবে না। পকেট থেকে ইনহেলেটরটা টেনে বের করল রবিন। হাতের তালুতে লুকিয়ে কেউ যাতে দেখতে না পায় এমন করে তুলে আনল মুখের কাছে। টিপে দিল বোতাম। কমে গেল বুকের চাপ। স্বাভাবিক হয়ে এল নিঃশ্বাস। আবার পকেটে রেখে দিল যন্ত্রটা।

'আজই ওদের শেখার সুযোগ,' থিওডোর কলিন্স বলল, 'তাই না ছেলেমেয়েরা? প্রথম শিক্ষাটা আজকেই দিয়ে দেয়া যাক।'

'হ্যাঁ, মিস্টার কলিন্স!' সমস্বরে একঘেয়ে সেই চিৎকার।

আড়চোখে ডেটের দিকে তাকাল রবিন। অন্যদের সঙ্গে সুর মেলাল না মেয়েটা। সে-ই কেবল ব্যতিক্রম এখানে। বাকি সব যেন রোবট।

মুসা আর কিশোরও মিশে গেছে অন্য ছেলেমেয়েদের দলে। কোন ভাবান্তর নেই।

বুঝে গেছে সেটা কলিন্স। শুধু ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'রবিন, কাজটা খুব

সহজ ইচ্ছে করলেই তুমিও অন্য সবার মত হয়ে যেতে পারো। জীবনটাকে অত জটিল করে লাভ কি? সীটে হেলান দিয়ে আরাম করে, সহজ হয়ে বসো। ভাবতে থাকো, কিজারভিলে তুমি সুখী। আর কোনদিন তোমার জীবন আগের মত জটিল হবে না। কোনদিন কিজারভিল ছেড়ে যেতে চাইবে না।...করে দেখো...হ্যাঁ, হয়েছে। কি, আগের চেয়ে ভাল লাগছে না?'

কি জবাব দেবে বুঝতে পারল না রবিন। তাকাতে লাগল চারপাশে। ঘরের সবকটা ছেলেমেয়ে, মুসা আর কিশোর সহ চোখ আধবোজা করে হেলান দিয়ে আছে চেয়ারে। ডেটকেও এখন আর অন্যরকম লাগছে না। সে-ও যেন আর সবারই মত হয়ে গেছে। রবিনের মনে হলো, অভিনয় করছে না তো?

এই সময় গ্যাস চোখে পড়ল ওর। নিঃশব্দে ঢুকছে ঘরের পাশের ভেন্টিলেটরগুলো দিয়ে। হালকা নীল রঙ। তার সঙ্গে হলুদ মেশানো। কারখানার চিমনি দিয়ে যে রঙের ধোঁয়া উঠতে দেখেছিল, অনেকটা সেরকম। ফুরফুর করে ঢুকছে ভেতরে। বদ্ধ ঘরে সিগারেটের ধোঁয়া বেশি হয়ে গেলে যেমন হালকা কুয়াশার মত উড়ে বেড়ায়, তেমন করে উড়ছে ওই আজব গ্যাস।

জোরে জোরে দম টানল সে। গন্ধ পেল না। একেবারে গন্ধহীন গ্যাস। ওর ওপর কোনরকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া করল বলেও মনে হলো না। কোন রকম কষ্ট বা অসুবিধে হলো না ওর।

'রবিন!' ডাক দিল কলিন্স।

ঝট করে ফিরে তাকাল রবিন।

'আমি তোমাকে একটা কথা প্রশ্ন করেছিলাম। জবাব দাওনি। তোমার কি আরাম লাগছে না? মনে হচ্ছে না কিজারভিল হলো দুনিয়ার সবচেয়ে আরামের জায়গা? সবচেয়ে দামী? মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও দামী?'

পাগল নাকি লোকটা? বোকার মত প্রশ্ন করছে! কিজারভিল তার কাছে সবচেয়ে ভাল জায়গা হতে যাবে কেন? 'না' বলে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু সাবধান করে দিল মন—চেপে যাও। সত্যি কথা বলতে গেলে ভয়ানক বিপদে পড়বে। একটু দ্বিধা করে মিথ্যেই বলল, 'হ্যাঁ, মিস্টার কলিন্স, কিজারভিল সত্যি ভাল লাগছে আমার।'

তাকিয়ে আছে কলিন্স। অনিশ্চিত ভঙ্গি। রবিন সত্যি বলছে কিনা, বুঝে উঠতে পারছে না যেন।

ভেন্টিলেটরের দিকে তাকাল রবিন। গ্যাস ঢোকা বন্ধ হয়ে গেছে। আশপাশের সীটের ছেলেমেয়েরা যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠতে শুরু করল একে একে। কিন্তু স্বাভাবিক হলো না আচরণ।

'হয়েছে, আজকের মত মীটিং এখানেই শেষ,' কলিন্স বলল। 'এ হপ্তায় কি কাজ করতে হবে জানিয়ে দেয়া হলো। আগামী হপ্তায় আবার দেখা হবে। যাও এখন।'

একসঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল সব কটা ছেলেমেয়ে। যে পথে ঢুকেছিল, সারি দিয়ে বেরিয়ে যেতে শুরু করল সেদিক দিয়ে। শান্ত, নিঃশব্দ, শৃঙ্খলাবদ্ধ। খুদে সেনাবাহিনীর একটা দল যেন। মগজধোলাই করে দেয়া সেনাবাহিনী।

সবার সঙ্গে বেরোতে গিয়ে কি ভেবে ফিরে তাকাল রবিন। দেখল, ওর দিকেই তাকিয়ে আছে কলিন্স। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে ওকে। সন্দেহ করল নাকি কিছু?

বাইরে এসে মুসা আর কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'কি বুঝলে?'

হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল দুজনে। যেন প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি।

'কি হলো? ওরকম করে কি দেখছ?'

এবারও কোন জবাব দিল না ওরা। চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণা ফুটল।

দুরুদুরু করে উঠল রবিনের বুক। ভয়ঙ্কর একটা প্রশ্ন মাথাচাড়া দিল মনে—তবে কি ওদের দুজনেরও মগজ ধোলাই হয়ে গেছে? তাড়াতাড়ি বলল, 'গেটের দিকে এগোও। হিরুচাচা গাড়ি নিয়ে এলে দাঁড়াতে বোলো। আমি আসছি।'

কোথায় যাবে ও, কোন প্রশ্ন করল না ওরা। নীরবে এগিয়ে গেল গেটের দিকে।

মেইন লবিতে দাঁড়িয়ে ডেটকে খুঁজতে শুরু করল সে।

বেরিয়ে আসতে দেখল ওকে। ছেলেমেয়ের দলকে ঠেলে, কনুইয়ের গুঁতো মেরে সরিয়ে তার দিকে এগোল সে। বিমূঢ় দৃষ্টিতে ওকে দেখতে লাগল ছেলেমেয়েরা। তার আচরণ পছন্দ হচ্ছে না ওদের।

কেয়ারই করল না রবিন। ডেটের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কি? কি ঘটছে এখানে?'

'চুপ!' ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল ডেট। ফিসফিস করে বলল, 'কোন কথা নয়। এখানে কথা বলা নিষেধ। আর ওভাবে লাইনের বাইরে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি কোরো না। এটাও নিষিদ্ধ।'

'মানে কি এ সবের?' রেগে উঠল রবিন। 'এটা কি স্কুল, না জেলখানা?'

বাইরে বেরোনোর আগে কোন জবাব দিল না ডেট। স্কুলের আঙিনা থেকে বেরিয়ে, পাশের একটা গলি দিয়ে রবিনকে দূরে সরিয়ে নিয়ে এল সে। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। 'যা বলার বলো এখন।'

'কি ঘটছে এখানে জানো তুমি কিছু?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ভেন্টিলেটার দিয়ে যে গ্যাস ঢোকে, দেখেছ?'

'দেখেছি। সবই জানি। প্রতি হপ্তায়ই এ কাজ করে ওরা। এ ভাবেই সবাইকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।'

'তোমাকে মনে হচ্ছে অন্যরকম। তোমাকে তো নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না ওরা।'

'তা-ও জানি। তোমারও যে কিছু করতে পারেনি, সেটাও বুঝতে পারছি। গ্যাস তোমার ওপর কাজ করছে না কেন?'

'কি করে বলব? সেই প্রশ্ন তো তোমাকেও করা যেতে পারে। মনে হচ্ছে এখানে আমরা দুজন বাদে বাকি সবাইকে রোবট বানিয়ে দিয়েছে। কিশোর আর মুসাকেও। ওরাও আর স্বাভাবিক আচরণ করছে না এখন।'

'এ শহরে থাকলে করবেও না,' ডেট বলল। 'তুমি যে কিভাবে করতে পারছ, সেটাই অবাক লাগছে। অবশ্য আমার ব্যাপারটাও আমার কাছে অবাক লাগে। দুমাস আগে এসেছি আমরা। এলাম শনিবারে, পরদিন রোববার সকালে উঠেই অদ্ভুত আচরণ শুরু করল আমার আব্বা-আম্মা। বদলে গেল। হাসি নেই, জোরে কথা বলা

বন্ধ, এমনকি আমার ব্যাপারেও উদাসীন। ভঙ্গি দেখে মনে হলো, আমার যা খুশি ঘটে ঘটুক, ওদের কিছু না। আম্মা ধরতে গেলে প্রায় সমস্ত সময়টাই রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে কাটায়। আমার আব্বা আর্কিটেক্ট। খাওয়া আর ঘুম বাদে তারও যেন কেবল একটাই কাজ—আরও বড়, আরও ক্ষমতাশালী ল্যাবরেটরি আর কারখানা তৈরির নকশা আঁকা, যেগুলোতে অনেক বেশি রাসায়নিক পদার্থ রাখা যাবে, অনেক বেশি গ্যাস তৈরি হবে।'

'ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে আমার!' এডগার কি করেছিল, মনে পড়ল রবিনের। সেসব জানাল ডেটকে। সংক্ষেপে মুসা, কিশোর আর হিরুচাচার ব্যাপারেও যতটা সম্ভব বলল ওকে।

'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই,' জবাব দিল ডেট। 'এডগার কেন খেপে গেল হঠাৎ বুঝতে পারলাম না। তবে অন্য রকম ব্যাপার ঘটতে দেখেছি। হঠাৎ করে যেন শক্তি শেষ হয়ে যায় কারও কারও, নেতিয়ে পড়ে। গাড়ি এসে ওদের তুলে নিয়ে যায়। তারপর আর ওদের দেখা পাওয়া যায় না। কি যে ঘটে ওদের ভাগ্যে, কে জানে! মরেটরেই যায় হয়তো। ফেলে দেয়। জলাভূমিতে অ্যালিগেটরের অভাব নেই। লাশ খেয়ে ফেলে। তোমরা যে বাড়িটাতে উঠেছ, তোমাদের আগে ওখানে থাকতে দেয়া হয়েছিল ভারম্যানদের। এডগারের মতই অবস্থা হয়েছে ওদেরও।'

'ওয়ালির কথা বললে তখন? সে কে?'

'ভারম্যানদের ছেলে। কাকাতুয়াটা ওরই ছিল।'

'পাখিটা কিভাবে মরল বলে মনে হয় তোমার?'

'তা জানি না। তবে যে কারণে ভারম্যানরা ঢলে পড়েছিল, ওই একই কারণে নিশ্চয় মারা পড়েছে পাখিটাও।' এক মুহূর্ত দ্বিধা করে ডেট বলল, 'ভারম্যানরা খুব ভাল লোক ছিল। কাকাতুয়াটাও ছিল চমৎকার।'

হিরুচাচা গাড়ি নিয়ে এসে বসে থাকতে পারেন। ফুটপাথ ধরে ডেটকে সঙ্গে নিয়ে সেদিকে এগোল রবিন। পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেছে। সামনে তাকাল সে। নাক বরাবর সামনে, শহরের ঠিক মাঝখানে নেপচুন রিসার্চ সেন্টার। রাতের বেলা এখন ভয়াবহ লাগছে দেখতে। আলো জ্বলে উঠেছে। হলুদ আর নীলচে আভায় ঝলমল করছে।

'এখানে যা কিছু ঘটছে,' হাত তুলে সেন্টারটা দেখিয়ে বলল ডেট, 'সব কিছুর জবাব পাওয়া যাবে ওখানে।'

'কোন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বললে কেমন হয়?' ডেটের পরামর্শ চাইল রবিন। 'ওদের তো অভাব নেই এখানে। যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখা যায়। যাব নাকি?'

হেসে উঠল ডেট। 'তোমার মাথায় এখনও সব ঢোকেনি। এখানকার সবাই আজব। এতদিন কেবল আমি একা স্বাভাবিক ছিলাম, আজ আরেকজনকে পাওয়া গেল—তুমি। তোমার বন্ধুরাও বিকল হয়ে গেছে, কোন সন্দেহ নেই আমার। ওদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবে না আর এখন। বরং শত্রুতা করবে। আর পুলিশের কাছে কিছু বলতে যাওয়াই বৃথা। অন্য সকলের মতই ওরাও অদ্ভুত আচরণ করে।'

'তুমি বলতে চাইছ, সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় এখানে আসে সবাই। আসার পর

অস্বাভাবিক হয়ে যায়? এবং এ সবের মূল কারণ ওই গ্যাস?'

'এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই,' জোর দিয়ে বলল ডেট। 'গত দুই মাস খুব ভালমত লক্ষ করেছি আমি সবকিছু। আমরা দুজন কেন এখনও স্বাভাবিক রয়েছি, বুঝতে পারছি না। তোমার দুই বন্ধুর কথাই ধরো। ভাল ছিল, এখানে আসার পর অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। আমি শিওর, বাড়ি গিয়ে তোমার হিরুচাচাকেও আর স্বাভাবিক পাবে না, যত বড় বিজ্ঞানী আর অ্যাডভেঞ্চারারই তিনি হোন না কেন। মগজ ঠিক না থাকলে কোন কিছুই ঠিক থাকে না।'

মেরুদণ্ডে আবার সেই শীতল শিহরণ খেলে গেল রবিনের। 'পাগলের মত কথা বোলো না! হিরুচাচার কিছু হবে না!'

'মুসা আর কিশোরের তো হলো…'

'ওদের বয়স কম। অভিজ্ঞতা, শরীরের শক্তি, সবই কম। হিরুচাচা জোয়ান মানুষ…'

'আমার বাবাও কম জোয়ান নয়। ওই পুলিশগুলো, এখানকার আরও অনেক মানুষ, তোমার হিরুচাচার চেয়েও জোয়ান, তারা রোবট বনে গেল কেন? কেন ওরকম বদলে গেল?'

জবাব দিতে পারল না রবিন।

হাঁটতে হাঁটতে গেটের কাছে চলে এসেছে ওরা। এই সময় একটা গাড়ির হেডলাইট জ্বলে উঠল। চোখ ধাঁধিয়ে দিল রবিনের।

'রবিন!' চিৎকার করে ডাকল একটা কণ্ঠ। চেনা চেনা মনে হলেও চিনতে পারল না রবিন। ভয়ানক শীতল।

'রবিন মিলফোর্ড!' আবার বলল কণ্ঠটা। গাড়ির ভেতর থেকে আসছে ডাক। ড্রাইভারের সীট থেকে। পুরুষের গলা। কে ডাকে বুঝতে পারল না সে।

অবাক হলো রবিন। এ ভাবে ওর নাম ধরে কে ডাকে? দুহাতে চোখ ঢেকে আলো আড়াল করে জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনি?'

'এদিকে এসো,' ডাকল আবার কণ্ঠটা।

এগিয়ে গিয়ে গাড়ির ড্রাইভারের পাশে দাঁড়াল রবিন।

'তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার,' বলল স্টিয়ারিং হুইলের ওপাশে বসা লোকটা।

কে কথা বলে দেখার জন্যে ভেতরে উঁকি দিল রবিন। প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক খেয়ে যেন পিছিয়ে গেল। হুইলে বসে আছেন হিরুচাচা।

'জরুরী কথা আছে তোমার সঙ্গে,' আবার বললেন তিনি। সেই অচেনা কণ্ঠস্বর। চোখে অদ্ভুত হলদে দ্যুতি, যেমন দেখেছিল এডের চোখে, যেমন দেখেছিল কলিন্সের চোখে।

সাত

'আংকেল! আপনার কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কেন, ভালই তো আছি আমি,' হাসলেন হিরুচাচা। ড্যাশবোর্ডের আলোয় পাতলা, নিষ্প্রাণ দেখাল হাসিটা; থিওডোর কলিন্সের হাসির মত।

'একটু ওদিকে গিয়েছিলাম হাঁটতে,' কৈফিয়ত দেয়ার সুরে বলল রবিন। পেছনের সীটের দিকে তাকাল। মুসা আর কিশোর নেই। 'ওরা কোথায়?'

'কারা?'

'মুসা আর কিশোর?'

'বাড়ি যেতে বলেছি। চলে গেছে।'

'ও, আমার অপেক্ষা করছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন নিশ্চয়? সরি!'

'না। এই এলাম।'

গাড়িতে ওঠার জন্যে পেছনের দরজা খুলতে গেল রবিন। বাধা দিলেন হিরুচাচা, 'না, উঠো না। আমাকে কাজে যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'ল্যাবরেটরিতে। জরুরী কাজ আছে। অফিস থেকে ফোন করেছে ওরা।'

'সে-কি! আজই তো এলেন! আজই চাকরিতে জয়েন?'

'চাকরি করতে এসেছি, করব; সেটা আজই কি আর কালই কি!' শীতল কণ্ঠে, কিছুটা রুক্ষ স্বরেই জবাব দিলেন হিরুচাচা। 'কিজারভিলের ভালর জন্যে সবকিছু করতে হবে আমাদের। কোন বাধাকেই বাধা ভাবা যাবে না। কোন কিছুর তোয়াক্কা করা যাবে না। নিজের কিংবা অন্য কারও ভালমন্দ, কিচ্ছু ভাবা যাবে না।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রবিন। এ রকম করে তো কথা বলেন না হিরুচাচা তোতাপাখিকে-শেখানো বুলির মত অন্যের কথা বলছেন যেন। এতটাই অসহায় বোধ করল রবিন, চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল ওর। কোন জিনিস পিটিয়ে ভাঙতে ইচ্ছে করল। দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তার অবস্থা বুঝতে পেরে বাহুতে হাত রেখে শান্ত করতে চাইল ডেট।

'বাড়ি যাব কি করে?' হিরুচাচাকে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'হেঁটে?'

'আমি কি জানি! মুসা আর কিশোর যেভাবে গেছে তুমিও সেভাবে যাও। ওদেরকে বললাম, আর ওরা তো সোজা রওনা হয়ে গেল। তুমি এত তর্ক করছ কেন? আমার জরুরী কাজ আছে। আমি যাই।'

গ্যাস পেডালে চাপ দিলেন হিরুচাচা। গর্জে উঠল শক্তিশালী এঞ্জিন। কারখানাটার দিকে চলে গেল গাড়িটা।

'এসো,' রবিনের হাত ধরে টানল ডেট, 'বাসে করে চলে যেতে পারব।'

নীরবে ওকে অনুসরণ করল রবিন। কোন কথা বলল না আর ডেট। তবে কড়া

নজর রাখল ওর দিকে।

বাস এল। উঠে বসল ওরা। বাড়ি রওনা হলো।

বাসের একেবারে পেছনের সীটে বসেছে দুজনে। অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর অবশেষে ডেট বলল, 'আপনজনরা এ ভাবে দূরে সরে গেল বলে খুব কষ্ট হচ্ছে, না? আমি জানি। প্রথম প্রথম যখন আব্বা-আম্মা এ রকম অস্বাভাবিক আচরণ করত, সহ্য করতে পারতাম না। কিছু করতেও পারতাম না। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতাম শুধু। তাতে ওদের কিছুই হত না। কোন একটা শক্তি নিয়ন্ত্রণ করছে ওদের। ওটার কথামত চলে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে এখন। চুপ করে হাত গুটিয়ে থাকার কোন মানে হয় না। কিছু একটা করতে হবে। এ ভাবে চলতে দেয়া যায় না।'

রবিনকে জোরে কথা বলতে দেখে ঘুরে তাকাল কয়েকজন যাত্রী। তাড়াতাড়ি ওর হাতে চাপ দিয়ে সাবধান করল ডেট, 'চুপ! আস্তে! মনে রেখো এখানকার সবাই সেই শক্তিটার নিয়ন্ত্রণে। সবাই ওর কথা বলবে। আমাদের পক্ষে নয়। খুব সাবধানে থাকতে হবে আমাদের। কেউ যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেয়ে যায় আমরা আলাদা, মারাত্মক বিপদে ফেলে দেবে। নিজেদেরই বাঁচাতে পারব না আর তখন, অন্যদের সাহায্য করা তো দূরের কথা।'

একমত হলো রবিন। ঠিকই বলেছে ডেট।

বাস ওদের বাড়ির কাছে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। ফুটপাথে উঠে দাঁড়াল দুজনে।

ডেট বলল, 'এমন ভান করবে, যেন তুমিও ওদেরই একজন। তাতে কারও সন্দেহ জাগবে না। কিছু একটা করার কথা ভাবতে পারব আমরা।'

'কিছু একটা বলতে আমি একটা উপায়ই দেখতে পাচ্ছি,' রবিন বলল, 'ওই রাসায়নিক কারখানায় ঢোকা। আমাদের জানতে হবে, কি কারণে ওরকম হয়ে যাচ্ছে মানুষগুলো? কিসে নিয়ন্ত্রণ করছে ওদের? তাহলেই কেবল এটা বন্ধ করা সম্ভব।'

'হয়তো। কিন্তু ঢুকব কিভাবে? ঢোকার জন্যে আইডি কার্ড লাগে।'

'কি ধরনের কার্ড?'

'প্লাস্টিকের। অফিস থেকে ইস্যু করে। কারখানায় যারা কাজ করে, শুধু তাদেরই দেয়া হয়। ওই জিনিস ছাড়া ঢোকা সম্ভব না।'

এক মুহূর্ত ভাবল রবিন। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আম্মা কাল কোন সময় অফিসে যাবেন?'

'কাল যাবে না। ছুটি। মাসে একবার ছুটি পায়। সেই দিনটি কাল।'

'দারুণ! তাহলে তো ভাগ্য ভালই বলতে হবে আমাদের। কাকতালীয়ভাবে মিলে গেল। কার্ডটা কোথায় রাখেন, জানো তুমি?'

রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল ডেট। কি বলতে চাইছে ও, বুঝে ফেলেছে। 'আম্মার কার্ড দিয়ে কারখানায় ঢুকলে ধরা পড়ে যাব। জ্যান্ত বেরোতে পারব না আর ওখান থেকে।'

'সে তো জানিই!' গলা কেঁপে উঠল রবিনের। ভয় উঠে এসেছে গলার কাছে। 'কিন্তু ভয় পেয়ে থেমে গেলে কাজটা আর কোনদিনই করা হবে না। ভয়ের কথা

ভাববই না আমরা। যা করার করে ফেলব।'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল ডেট। 'বড় আত্মবিশ্বাস তোমার। এমন আর দেখিনি। এতদিনে এখানে স্বাভাবিক একজন মানুষের দেখা পাওয়া গেল। কি যে আনন্দ লাগছে আমার বলে বোঝাতে পারব না!'

'আমারও ভাগ্য ভাল, তুমি স্বাভাবিক রয়েছ। নইলে কথা বলতাম কার সঙ্গে?'

'তাহলেই বোঝো, কি কষ্টটাই না গেছে আমার এতদিন।' আগের প্রসঙ্গে ফেরত গেল ডেট, 'আজ রাতেই আম্মার ব্যাগ থেকে কার্ডটা চুরি করব। কাল সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে যাব। স্কুলের পর বাইরে দেখা করব আমরা। সেখান থেকে সোজা চলে যাব কারখানায়।'

'ঠিক আছে।' বিড়বিড় করে বলল রবিন, 'সবাইকে দেখিয়ে দেব, অসুস্থ হয়েও সুস্থ মানুষের চেয়ে বেশি ক্ষমতা আছে আমার।'

কথাটা ধরল ডেট। 'তুমি অসুস্থ?'

'না, তেমন কিছু না। ঠাণ্ডা লেগেছিল। তাতে একটু হাঁপানিমত হয়েছে। তারপর থেকে সবাই আমার দিকে এমন চোখে তাকায়, যেন আমি একটা ঠুনকো কাঁচের পুতুল, টোকা লাগলেই ভেঙে যাব। ওদের এই ভঙ্গি একেবারে সহ্য হয় না আমার।'

'সেই দুঃখ তো আমারও ছিল। আগে যে শহরে ছিলাম, স্কুলের ছেলেমেয়েরা আমাকে খালি দয়া দেখাতে চাইত।'

'কেন তোমারও কি হাঁপানি?'

'না, ডায়াবেটিস। রোজ সকালে ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নিতে হয়। না নিলেই শরীর খারাপ। অসুস্থ হয়ে পড়ি। ডাক্তার বলেছে বাকি জীবনটা এ ভাবে ইঞ্জেকশন নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে আমাকে। না নিলে মরে যাব। এ জন্যেই আমাকে করুণা করত সবাই।'

'বাহ্, চমৎকার! দুটো অসুস্থ ছেলেমেয়ে এতবড় একটা শহরের বড় বড়, বুদ্ধিমান, সুস্থ সব মানুষকে সাহায্য করার দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে। খবরের কাগজওয়ালারা কিভাবে দেখবে, কিভাবে ফেনিয়ে লিখবে ব্যাপারটাকে ভেবে দেখেছ? যা-ও বা একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল আমার, তোমার কথা শুনে একেবারে দূর হয়ে গেছে। এ কাজ আমি করবই। দেখিয়ে দেব, করুণার পাত্র নই আমরা মোটেও। কম নই কারও চেয়ে।' ডেটের দিকে তাকিয়ে হাসল রবিন। 'তুমি আর আমি একই পরিস্থিতির শিকার।' হাত বাড়িয়ে দিল, 'হাত মেলাও।'

সাগ্রহে রবিনের হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল ডেট। 'কথা অনেক হলো। চলো এখন বাড়ি যাই।' ঘুরে নিজেদের বাড়ির দিকে রওনা হলো সে।

রবিন ফিরে চলল ওদের বাড়িতে। ঘরে ঢুকে দেখে ওর দিকে পেছন করে ফোনে কথা বলছে কিশোর, '...হ্যাঁ, মিস্টার কলিন্স, রবিনের হাঁপানি হয়েছে। মাঝে মাঝে এত বেড়ে যায়, ইনহেলেটর লাগে।'

চুপ করে ওপাশের কথা শুনল কিশোর। তারপর বলল, 'মুসা বাথরুমে।...না না, কাউকে কিছু বলব না।...ঠিক আছে, যাচ্ছি, এখনই নষ্ট করে ফেলব ইনহেলেটরগুলো।...না, কোন চিন্তা করবেন না। আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে

পালন করব আমি। একটাও রাখব না। মুসা বাথরুম থেকে বেরোলে তাকেও বলে দেব আপনার আদেশের কথা।'

আট

কিশোর ফোন রেখে ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই চট করে দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল রবিন।

কোনদিকে তাকাল না কিশোর। সোজা ওপরতলার সিঁড়ির দিকে ছুটল। হিরুচাচার মতই পুরোপুরি সেই রহস্যময় শক্তিটার নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে সে-ও।

কিশোর গেছে। মুসা গেছে। এ শহরে ওদের মত যত ছেলেমেয়ে আছে, সবাই গেছে। কিজারভিলের সবাই এখন রোবট। কেবল আমি আর ডেট বাদে—ভাবল রবিন।

ঘরের মধ্যে হালকা হলুদ-নীল একটা আভা চোখ এড়াল না ওর। খুব হালকা কুয়াশার মত।

ওপর দিকে তাকাল। চোখ পড়ল ছাতের ঠিক নিচে দেয়ালের গায়ের ভেন্টিলেটরের দিকে। পাখা ঘুরছে। দেখে মনে হয়, বাইরের বাতাস ঘরে টেনে আনার জন্যে লাগানো হয়েছে। কিন্তু সে এখন জানে, বাতাসের জন্যে নয়, বিশেষ ওই ভেন্টিলেটর লাগানো হয়েছে গ্যাস ঢোকানোর জন্যে। ও পথেই আসে গ্যাস। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে হালকা রঙের গ্যাস ঢুকছে ভেন্টিলেটর দিয়ে।

এই তাহলে ব্যাপার! এ ভাবেই গ্যাস পাচার করে স্বাভাবিক মানুষগুলোকে রোবট বানিয়ে ফেলা হয়। স্কুলে, অফিসে, ল্যাবরেটরিতে, বাড়িতে, সবখানে পাইপ লাইনের সাহায্যে গ্যাস পাচারের ব্যবস্থা করেছে। কোনও বিশেষ জায়গা থেকে। সেই বিশেষ জায়গাটা কোথায়, অনুমান করতে পারছে সে। নিশ্চয় কেমিক্যাল বানানোর কারখানা। কিন্তু কেন করছে? কারা আছে এই অপকর্মের পেছনে? মানুষগুলোকে রোবট বানিয়ে কার কি লাভ? কে কে আছে এর পেছনে? থিওডোর কলিন্স? সে যে এতে জড়িত তাতে কোন রকম সন্দেহ নেই। তবে নাটের গুরু মনে হয় সে নয়। কারণ তার চোখেও হলুদ আভা দেখেছে রবিন।

দ্রুত ভাবনা চলেছে ওর মাথায়। তার যে হাঁপানি আছে, গ্যাস কোন প্রভাবে ফেলতে পারে না, জেনে গেছে কলিন্স। কিভাবে জানল? রাতের বেলা হঠাৎ করে জরুরী তলব করে হিরুচাচাকেই বা ডেকে নিয়ে গেল কেন ল্যাবরেটরিতে?

ওপরতলা থেকে নানা রকম খুটুর-খাটুর ঠাসঠুস শোনা যাচ্ছে। কোন কিছু ভাঙার শব্দ। বহুদূরে কোথাও যেন পানি পড়ছে। নিশ্চয় বাথরুমে ঢুকে গোসল করছে মুসা। নিস্তব্ধতার মাঝে সে শব্দই কানে আসছে। বদ্ধ জায়গা থেকে ক্ষীণভাবে আসছে বলে মনে হচ্ছে বহুদূরের শব্দ। আর ওপরতলার ভাঙাভাঙি মানে ওর ইনহেলেটরগুলো ভেঙে শেষ করছে কিশোর। একটাও রাখবে না। সঙ্গে যেটা আছে এখন, সেটাই শেষ সম্বল। তাতে কয়েকবার দম নিতে পারবে। এটা শেষ

হয়ে যাওয়ার পর যদি রোগের আক্রমণ আসে, মরতে হবে।

আধখালি একটা ইনহেলেটরের ওপর ভরসা করে আগামী দিনের অপেক্ষায় আর বসে থাকা যায় না। তার আগেই রাসায়নিক কারখানায় ঢুকে দেখতে হবে। এবং সেটা আজ রাতেই! সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রবিন।

ঘরে আর ঢুকল না সে। নিঃশব্দে সরে এল দরজার কাছ থেকে। আলোকিত রাস্তা ধরে না গিয়ে কোনাকুনি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দৌড় দিল। নজর ডেটদের বাড়ির দিকে। জানালায় আলো জ্বলছে।

কাছাকাছি এসে গাড়িটা গ্যারেজে দেখতে পেল। তারমানে ডেটের বাবা-মা দুজনেই বাড়িতে আছেন। ডেটের মায়ের আইডি কার্ডটা জোগাড় করতে হবে এখনই। পারবে ডেট? বলে দেখা দরকার। তার জন্যে ডেকে বের করে আনতে হবে ওকে। এত রাতে রবিনকে দেখলে সন্দেহ জাগবে না তো ডেটের বাবা-মায়ের?

জাগলেও করার কিছু নেই। ঝুঁকি নিতেই হবে। সোজা এসে সামনের দরজার বেল বাজাল রবিন।

দরজা খুলে দিলেন মিস্টার কেভান। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি চাই?' শূন্য চাহনি। চোখে হলুদ আভা। হিরুচাচার মত।

'আমার নাম রবিন মিলফোর্ড। আজই এসেছি আমরা। রাস্তার ওপারের বাড়িটাতে,' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক আর শান্ত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে রবিন যাতে কোন সন্দেহ না জাগে মিস্টার কেভানের।

'তা তো বুঝলাম। তোমার কি চাই?' একঘেয়ে কণ্ঠে আবার জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার কেভান।

'আমার চাচা আপনাকে আর মিসেস কেভানকে চায়ের দাওয়াত করেছেন। আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হতে চান।'

ডেটের আম্মাও এসে দাঁড়ালেন স্বামীর পাশে। ভোঁতা দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি চায় ছেলেটা?'

রবিন কেন এসেছে, মিসেসকে জানালেন কেভান।

'ও,' মিসেস বললেন, 'ভালই তো। যাওয়া যায়।'

সুযোগ পেয়ে তাড়াতাড়ি বলল রবিন, 'তিনি এক্ষুণি যেতে বলেছেন। চা রেডি করে বসে আছেন। আপনাদের কোন অসুবিধে আছে?'

'না, অসুবিধে কি? কোন্ বাড়িটা তোমাদের?'

'ওই যে রাস্তার ওপারের সাদা বাড়িটা,' হাত তুলে দেখাল রবিন।

ঘরের ভেতর ফিরে তাকালেন মিসেস কেভান। গলা চড়িয়ে বললেন, 'ডেট, আমরা একটু বেরোচ্ছি। তোমার হোমওয়ার্ক সেরে ফেলো। ঘর থেকে বেরোবে না।'

'আচ্ছা, আম্মা,' ওপরতলা থেকে জবাব দিল ডেট।

বেরিয়ে গেলেন ওর বাবা-মা। রবিনদের বাড়িতে রওনা হলেন। তাঁদের পেছনে হাঁটতে হাঁটতে ইচ্ছে করে পিছিয়ে পড়ল রবিন। যেই দুজনে পথের একটা বাঁক ঘুরেছেন, অমনি পেছন ফিরে দৌড় দিল সে। একদৌড়ে ফিরে এসে দাঁড়াল আবার

দরজার সামনে। লাগিয়ে দেয়া হয়েছে পাল্লাটা। বেলপুশ টিপে ধরে রাখল।

দরজা খুলে দিল ডেট। ভীষণ চমকে গেল। 'তুমি?'

'জলদি তোমার আম্মার আইডি কার্ডটা নিয়ে এসো। আমি রাস্তায় দাঁড়াচ্ছি। যেতে যেতে বলব সব। একটা সেকেন্ডও নষ্ট করা যাবে না। আমি জানি এখনই ফিরে আসবেন তোমার আব্বা-আম্মা।'

কোন প্রশ্ন করল না আর ডেট। ঘুরে দৌড় দিল সিঁড়ির দিকে।

রবিনও দাঁড়াল না আর ওখানে। দৌড়ে চলে এল রাস্তায়। ওদের বাড়িটা দেখা যায় এখান থেকে। গেটের কাছে চলে গেছেন ডেটের বাবা-মা। এ সময় দরজায় বেরিয়ে এল কিশোর। তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মারছে মুসা। দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন মিস্টার কেভান। পেছনে মিসেস কেভান। কি যেন বলল কিশোর। ঘুরে হাত তুলে নিজেদের বাড়িটা দেখালেন মিস্টার কেভান। কয়েক সেকেন্ড কথা হলো। উত্তেজিত ভঙ্গিতে কি যেন বলল কিশোর।

ডেটের বাবা-মাকে মনে হলো দ্বিধায় পড়ে গেছেন। তারপর ঘুরে রওনা হলেন আবার নিজেদের বাড়ির দিকে। জোরে জোরে হাঁটছেন। কোন কিছু সন্দেহ করে ফেলেছেন মনে হলো।

আবার ফিরে গিয়ে চিৎকার করে বলল রবিন, 'ডেট, তাড়াতাড়ি করো! তোমার আব্বা-আম্মা চলে আসছেন!'

দেরি করে ফেলল ডেট। ওর বাবা-মা তখন গেটের কাছে পৌঁছে গেছেন। এখনও বেরোচ্ছে না ও। বুকের ভেতর কাঁপছে রবিনের। সরে গেল অন্ধকার ছায়ায়।

সদর দরজার কাছে পৌঁছে গেলেন দুজনে। ঘরে ঢুকতে যাচ্ছেন।

দমে গেল রবিন। ওদের প্ল্যানমত আর কাজ হলো না। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বরং খারাপ হলো আরও। ডেটের সঙ্গে এখন আর তাকে মিশতেও দেয়া হবে না। মেয়ের হাতে আইডি কার্ড দেখলে তো অবস্থা আরও খারাপ করে ছাড়বেন ওর বাবা-মা। বলা যায় না, পুলিশকে খবর দিয়ে নিজের মেয়েকেই গ্রেপ্তার করাতে পারেন। রোবটের পক্ষে সবই সম্ভব। ওদিকে কিশোরও হয়তো পুলিশকে ফোন করে রবিনের চালাকির কথা জানিয়ে দিচ্ছে। তাকে ধরার জন্যে লোক বেরিয়ে পড়বে এখনই।

'পেয়েছি!' পেছন থেকে বলে উঠল ডেট।

চমকে গেল রবিন। মনে হলো কানের কাছে বোমা ফেটেছে। ফিরে তাকাল। ডেটের হাতে একটা চকচকে কার্ড।

নয়

'বেরোলে কোনদিক দিয়ে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রবিন। 'তোমার আব্বা-আম্মাকে দেখলাম সামনের দরজা দিয়ে ঢুকছেন।'

'জানতাম, চলে আসবে,' জবাব দিল ডেট। 'তাই কার্ডটা বের করে নিয়ে সোজা পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে এসেছি।'

'বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। সামনে দিয়ে গেলেই ধরা পড়তে।'

দেরি করা উচিত হবে না মোটেও। কার্ডটা যখন বের করে আনা গেছে, ঘরে ফেরারও আর মানে হয় না। দৌড়ে বেরিয়ে এল দুজনে রাস্তায়। বাস ধরে রওনা হলো কারখানার দিকে। প্রায় খালি বাস। বাড়িতে কি ঘটেছে, পেছনের সীটে বসে ফিসফিস করে ডেটকে সব জানাল রবিন। কেন তাড়াহুড়া করে এই রাতেই কারখানায় ঢোকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বুঝিয়ে বলল।

'তোমার হাঁপানি নিয়ে কলিন্সের অত মাথাব্যথা কেন?' অবাক লাগছে ডেটের।

'আমার হাঁপানি নিয়ে সবারই বড় বেশি মাথাব্যথা, বাড়িতে থাকতেও দেখেছি। সেজন্যেই তো বেড়াতে এসেছিলাম হিরুচাচার সঙ্গে। ভেবেছিলাম দূরে গেলে কেউ জানবে না, মাথাও ঘামাবে না···কিন্তু বুঝতে পারছি না, কলিন্স এত তাড়াতাড়ি এ খবর জানল কিভাবে? স্কুলে মীটিঙের সময় ইনহেলেটর ব্যবহার করেছি অবশ্য। তখনই কি কোনভাবে দেখে ফেলল?'

'জানাটা কোন ব্যাপারই না এখন আর ওদের কাছে। তোমার হিরুচাচাকে বশ করে ফেলেছে। মুসা আর কিশোরকে বশ করেছে। যে কোন প্রশ্নের জবাব জেনে নিতে পারবে। কলিন্স হয়তো জিজ্ঞেস করেছে তোমার চাচাকে, তোমার কোন রোগ আছে কিনা, ইনহেলেটর ব্যবহার করো কিনা। বলে দিয়েছেন তিনি।' এক মুহূর্ত চিন্তা করল ডেট। 'তবে একটা সন্দেহ হচ্ছে আমার, তোমার হাঁপানি কোনও কারণে অস্থির করে তুলেছে ওদের। নইলে ইনহেলেটর ভাঙতে যাবে কেন?'

'আমিও সেই কথাই ভাবছি। আমার ইনহেলেটর ওদের কাছে এত দামী হয়ে উঠল কেন?'

চুপ করে ভাবতে লাগল দুজনে। জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে রবিন। বড় বড় কয়েকটা মল, শপিং সেন্টার আর সিনেমা হল পার হয়ে এল বাস। সবখানেই প্রচুর ভিড়। বাজার করতে কিংবা সিনেমা দেখতে বেরিয়েছে লোকে। বাবা-মায়ের সঙ্গে তাদের ছেলেমেয়েরা আছে, একা কিশোর বয়েসীরা ঘুরছে, বুড়োরাও এসেছে কেনাকাটা করতে।

'সবই তো খুব স্বাভাবিক লাগছে,' রবিন বলল। 'সন্দেহ করার কোন উপায়ই নেই যে লোকগুলো সব রোবট।'

'সুস্থ থাকতে আম্মা বলতো—চোখে দেখে যা মনে হয় অনেক সময়ই সেটা ঠিক নয়,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল ডেট। 'এসে গেছি।'

রাসায়নিক কারখানায় ঢোকার মুখে থামল বাস। ওরা দুজন নেমে যেতেই ছেড়ে দিল।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'আর কখনও এখানে এসেছ?'

'না,' কালচে, বিশাল, বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ডেট। ভয়াল-দর্শন এক দৈত্যের মত মনে হচ্ছে ওটাকে এখন ওর কাছে। ওদের মাথার ওপর নিওন আলোয় অনেক বড় বড় করে লেখা: নেপচুন কেমিক্যালস। ডেটের চোখের ভয়

দেখেই নিজের চোখের অবস্থা কল্পনা করতে পারল রবিন।

'ভেতরে ঢুকলে সবার মত আচরণ করতে হবে আমাদেরও, মনে রেখো কিন্তু,' ডেট বলল। 'কিছুতেই কাউকে বুঝতে দেয়া যাবে না যে আমরা ওদের মত রোবট হয়ে যাইনি। সন্দেহ করে বসলে আর রক্ষা থাকবে না।'

'মনে থাকবে। আমি আগে দেখতে চাই হিরুচাচা কি করছেন? তাঁকে দেখলেই বুঝতে পারব এরপর কি করা উচিত আমাদের।'

ভেতরে ঢোকার প্রধান প্রবেশ পথটার দিকে তাকাল সে। গেটের কাছে পাহারা দিচ্ছে একজন সশস্ত্র প্রহরী। ওদিক দিয়েই ঢুকছে লোকে।

ওরা কি করে, কিভাবে ঢোকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল দুজনে।

একজন লোক গিয়ে গেটের পাশে একটা স্লটে আইডি কার্ড ঢুকিয়ে দিল। মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। খুলে গেল গেট। লোকটা ভেতরে ঢুকে যেতেই আবার বন্ধ হয়ে গেল আপনাআপনি।

'এবার আমাদের পালা,' ফিসফিস করে বলল রবিন। 'এসো।'

গেটের দিকে পা বাড়াল দুজনে। শান্ত, স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল যতটা সম্ভব। কঠোর দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল প্রহরী। নির্বিকার ভঙ্গিতে আগের লোকটার মত স্লটে কার্ড ঢুকিয়ে দিল ডেট।

কিছুই ঘটল না।

'কি হলো?' ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'বুঝতে পারছি না!' আতঙ্কে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসতে চাইল ডেটের। 'কাজ করছে না। খুলছে না গেট!'

ওদের পাশে চলে এল দারোয়ান। হাত বাড়াল, 'কার্ডটা দাও তো দেখি।' বরফের মত ঠাণ্ডা ওর কণ্ঠস্বর। রুক্ষ চেহারা।

শুরুতেই গণ্ডগোল! ডেটকে দৌড় দিতে বলে নিজেও দৌড় মারতে যাচ্ছিল রবিন। কিন্তু বেঁচে গেল। ও মুখ খোলার আগেই স্লটে কার্ড ঢুকিয়ে দিল দারোয়ান। সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন তুলে খুলে গেল দরজা।

'উল্টো করে ধরে ঢুকিয়েছিলে, সেজন্যেই খোলেনি,' লোকটা বলল। 'এ ভাবে ঢোকাতে হয়,' দুই আঙুলে ধরে দেখিয়ে দিল। নামটা পড়ল। 'তোমাকে তো আগে কখনও দেখিনি এখানে এলিজা কেভান?'

'দেখার কথাও নয়,' শান্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে ডেট। 'ছোটদের নতুন একটা প্রোজেক্ট হয়েছে নাকি, সেটার জন্যে নির্বাচিত করা হয়েছে আমাদের। আজই মীটিঙে সিদ্ধান্ত হলো।'

দ্বিধায় পড়ে গেল দারোয়ান। আরেকবার কার্ডটার দিকে তাকিয়ে মুখ তুলল। মাথা কাত করে ইঙ্গিতে রবিনকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওর কার্ড নেই কেন?'

'আমাদের দেরি করিয়ে দিচ্ছেন আপনি!' আচমকা রেগে যাওয়ার ভান করল ডেট। দারোয়ানের হাত থেকে কেড়ে নিল কার্ডটা। 'বিপদে পড়তে চান? মরার ইচ্ছে?'

'না না, তা চাইব কেন?' যান্ত্রিক গলায় বলল দারোয়ান। কিন্তু ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো না। দ্বিধাটা বেড়েছে কেবল। তাকে আর কথা বাড়ানোর সুযোগ না দিয়ে

রবিনের হাত ধরে টেনে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল ডেট।

মেইন লবিতে ঢোকার পর রবিন বলল, 'দেখালে তো ভালই! আমি তো ভেবেছিলাম গেল সব!'

'গত দুমাস ধরে দেখছি এই রোবটগুলোকে। বেশ ভালমত লক্ষ করেছি। গ্যাসে আক্রান্ত হলে মগজটা আর ঠিকমত কাজ করে না ওদের। বুদ্ধি-বিবেচনা, খতিয়ে দেখার ক্ষমতা, সব কমে যায়। অনেকটা নেশা করা মাতাল মানুষের মত।'

'এত কিছু খেয়াল করেছ! সত্যি, বুদ্ধি আছে তোমার! এ রকম খেয়াল করার, বিপদের সময় দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আরও একজনের দেখেছি—আমাদের কিশোর পাশা। কিন্তু সে ক্ষমতা এখন আর তার নেই। অন্য সবার মতই এখন নির্বোধ রোবট।'

'অত প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নই আমি। আরেকটু হলেই তো ডোবাচ্ছিলাম। কার্ডটা পর্যন্ত ঠিকমত ঢোকাতে পারিনি স্লটে, উল্টো করে ভরেছিলাম। দারোয়ানটার সামান্য বোধ অবশিষ্ট থাকলেই তো আমাদের চালাকি ধরে ফেলত।'

'ভাগ্যিস নেই! যাকগে, একটা বড় বাধা পেরিয়ে এলাম।'

চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগল রবিন। লবিটা বিরাট। চতুর্দিকে ব্যস্ত হয়ে চলাফেরা করছে লোকে। পুরুষ এবং মহিলা দুইই আছে। কিছু মানুষের পরনে ল্যাবরেটরি কোট; বেশির ভাগেরই বিজনেস সুট।

স্কুলে যেমন দেখা গেছে, এখানেও সেরকমই কেউ কথা বলছে না কারও সঙ্গে। মানুষের সঙ্গে মানুষ চলাফেরা করলে, একসঙ্গে কাজ করলে সাধারণত যে আচরণ করে থাকে, তার কোন কিছুই নেই। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রবিন। যদিও এখানে স্বাভাবিক কিছু আশা করেনি সে। ভয় ভয় করতে লাগল। মনে হতে লাগল, পৃথিবীতে নয়, অন্য কোন জগতে ভুল করে ঢুকে পড়েছে।

পেছনের দেয়ালের দিকে হাত তুলে ডেট বলল, 'ওই যে, একটা ডিরেক্টরি। চলো, পড়ে দেখা যাক, তোমার হিরুচাচা কোথায় আছেন কোন হদিস পাওয়া যায় কিনা?'

সেদিকে হাঁটতে হাঁটতে রবিন বলল, 'হিরুচাচার কাজ প্রোজেক্ট রিসার্চ সেকশনে। বলেছিলেন, মনে আছে।'

ডিরেক্টরির সামনে এসে দাঁড়াল দুজনে। একনজর তাকিয়েই বলে উঠল রবিন, 'হ্যাঁ, ওই তো আছে। প্রোজেক্ট রিসার্চ। পাঁচতলা।'

ঠিক এই সময় শোনা গেল বিপদ সঙ্কেত। একটা সাইরেন বেজে উঠল। দেয়ালে লাগানো গোপন স্পীকারে গমগম করে উঠল যান্ত্রিক কণ্ঠ, 'সাবধান! হুঁশিয়ার! রবিন মিলফোর্ড আর ডেট কেভান নামে দুটো ছেলেমেয়ে ঢুকে পড়েছে কারখানার ভেতর। দুজনেরই বয়স বারোর বেশি না। নেপচুন কেমিক্যালের শত্রু ওরা। খুঁজে বের করো ওদের। নেপচুন কমান্ড কন্ট্রোলে ধরে নিয়ে এসো। কুইক!'

দশ

'জলদি! এই দরজাটা দিয়ে!' চিৎকার করে বলল রবিন। কেউ দেখে ফেলার আগেই ডেটের হাত ধরে টেনে নিয়ে ঢুকে পড়ল পাশের একটা দরজা দিয়ে। সিঁড়ির দিকে গেছে ওটা, চৌকাঠের ওপরের বোর্ডে লেখা আছে সেকথা।

ঢুকেই দরজাটা লাগিয়ে দিল সে। একটা সিঁড়ি দেখতে পেল। কারখানার লোকদের সাবধান করে দিয়ে থেমে গেছে সাইরেন।

'এত তাড়াতাড়ি আমাদের খোঁজ পেল কিভাবে ওরা?' অবাক হয়ে বলল রবিন। টের পেল, হাঁপানি বেড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ইনহেলেটর বের করে মুখে চেপে ধরল।

'আর কিভাবে?' তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল ডেট। 'আমার এককালের স্নেহময়ী আম্মাজান। নিশ্চয় দেখে ফেলেছে আইডি কার্ডটা নেই। যেই দেখেছে, অমনি ফোন করেছে কলিন্সকে। কলিন্স সন্দেহ করেছে আমরা কার্ড চুরি করেছি। দারোয়ানের কাছে ফোন করেছে। জেনে গেছে আমরা কোনখানে আছি।···চামচার দল! পা-চাটা কুকুর হয়ে গেছে একেবারে!'

'আমাদের নিজের আত্মীয়-স্বজনরাই আমাদের শত্রু হয়ে গেল!' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'কি আর করা। ইচ্ছে করে তো আর হয়নি। গ্যাস ওদের বাধ্য করেছে।' হাঁপানো আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ওর।

'মরুকগে ওরা,' বিরক্ত হয়ে হাত নাড়ল ডেট। 'আমরা এখন কি করব? বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব, না আরও এগোব?'

'বেরিয়ে কোন লাভ নেই। সারা শহরে খুঁজে হলেও আমাদের বের করবে ওরা। আমরা এখন কিজারভিলের শত্রু। যতক্ষণ এ শহরে থাকব, লড়াই করে বাঁচতে হবে। কারখানার ভেতরে থাকা আর শহরের ভেতরে থাকা এখন আমাদের জন্যে এক সমান।'

'তা ঠিক। তাহলে আর কি,' সিঁড়ির দিকে তাকাল ডেট, 'চলো, পাঁচতলাতেই উঠে পড়ি। তোমার অ্যাডভেঞ্চারার চাচাজানের বশ্যতার নমুনা দেখি।'

নিরাপদেই পাঁচতলায় উঠে এল দুজনে। কেউ সামনে পড়ল না। এদিকে লোকজন খুব কম। ওদের দুজনকে খোঁজাখুঁজি করা হচ্ছে নিশ্চয় লবির ওদিকটায়। এখানে যে ঢুকে পড়তে পারে, মাথায় আসেনি বোধহয় রোবটগুলোর।

পাঁচতলার বারান্দা দিয়ে সাবধানে সামনে এগোল ওরা। শেষ মাথায় একটা দরজা। সেটার সামনে এসে দাঁড়াল।

কারও কোন সাড়াশব্দ নেই। আস্তে দরজাটা ঠেলে খুলল রবিন। অন্যপাশে উঁকি দিল। আরেকটা বড় লম্বা বারান্দা। কাউকে দেখা গেল না। সে আগে ঢুকল। পেছনে ডেট।

এটা রিসার্চ এরিয়া। কিন্তু কোন লোকজন নেই। বারান্দার দুই ধারে সারি সারি দরজা। প্রতিটি দরজার মাথায় একটা করে নাম। নামগুলো বিচিত্র:

প্রোজেক্ট ড্রিম কন্ট্রোল
প্রোজেক্ট বিহেভিয়ার কন্ট্রোল
প্রোজেক্ট থট কন্ট্রোল
প্রোজেক্ট মাইন্ড কন্ট্রোল

'আহাহা, নামের কি বাহার!' মুখ বাঁকাল ডেট। 'মানে কি এ সবের?'

'স্বপ্ন নিয়ন্ত্রণ, আচরণ নিয়ন্ত্রণ, চিন্তা নিয়ন্ত্রণ, মনোনিয়ন্ত্রণ...' বলতে গেল রবিন।

'আরে সে তো বুঝলাম। ডিকশনারির শব্দ। কিন্তু এ রকম উদ্ভট নাম কেন? আসলে কি করছে ওরা এখানে?'

'কি করে বলব? জানতাম রাসায়নিক পদার্থ তৈরির কারখানা এটা। কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে পাগলা গারদ। মানুষকে কৌশলে কন্ট্রোল করে পুরো মানবজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পরিকল্পনা করেছে যেন কেউ।'

'এ সব দেখে কিন্তু সেরকমই লাগছে। সাইন্স ফিকশন সিনেমার মত।'

এই সময় খুলে গেল একটা দরজা। বেরিয়ে আসতে লাগল কয়েকজন নারী-পুরুষ। ঝট করে দেয়ালের আড়ালে সরে গেল ওরা।

'আজ রাতেই সমস্যাটার সমাধান করে ফেলতে হবে,' একজন বলল। 'যতক্ষণ ওই ছেলেমেয়ে দুটো ছাড়া থাকবে, বিপদের মধ্যে থাকব আমরা। ওরা আমাদের গোপন কথাটা জেনে গেলে ধ্বংস করে দিতে পারে সব।'

'সেটা ঘটতে দিতে পারি না আমরা,' বলল একজন মহিলা। 'কিছুতেই না। আমাদের প্রভু সেটা সহ্য করবেন না।'

প্রভু! এ কেমন শব্দ ব্যবহার? কার কথা বলছে লোকগুলো? ঈশ্বর?

'অত চিন্তার কিছু নেই,' আরেকজন বলল। 'ধরা ওদের পড়তেই হবে। ওদের ওপর গবেষণা চালিয়ে তখন জেনে নেব কেন বিগড়ে গেল ওরা। জানা শেষ হয়ে গেলে নষ্ট করে ফেলব। বিগড়ানো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখাটা বিপজ্জনক।'

এমন ভঙ্গিতে বলল লোকটা, যেন রবিন আর ডেট দুটো যন্ত্র। যেহেতু বিগড়ে অকেজো হয়ে গেছে, তাই নষ্ট করে ফেলবে।

দেয়ালের কোণ থেকে মুখ বের করে উঁকি দিল রবিন। শেষ কণ্ঠটা পরিচিত লেগেছে ওর। তাকিয়ে দেখে হিরুচাচা। তিনিই ওদের নষ্ট করে ফেলার কথা বলেছেন।

দলটা গিয়ে দাঁড়াল 'প্রোজেক্ট মাইন্ড কন্ট্রোল' লেখা দরজার সামনে। আইডি কার্ড স্লটে ঢুকিয়ে দরজা খুলে এক এক করে চলে যেতে লাগল দরজার ওপাশে।

দরজাটার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। নাড়ির গতি বেড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ঘোষণা করল, 'আমরাও ঢুকব ওখানে।'

পা বাড়াতে গেল সে। ধরে ফেলল ডেট। 'দাঁড়াও। ঢোকার আগে জানা দরকার একটু আগে যে ঘরটা থেকে বেরোল ওরা, ওখানে কি করছিল।'

মন্দ বলেনি ডেট। রাজি হয়ে গেল রবিন। 'ঠিক আছে, চলো। কিন্তু

তাড়াতাড়ি করতে হবে। যে কোন সময় আমাদের দেখে ফেলতে পারে কেউ।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল দুজনে। পাল্লা ঠেলে দেখল। খুলল না। একপাশে স্লট। তাতে কার্ড ঢুকিয়ে দিল ডেট। এবার আর ভুল করেনি. ঠিকমতই ঢুকিয়েছে।

কিন্তু খুলল না দরজা। স্লটের পাশে একটা ছোট মনিটর। তাতে লেখা ফুটল:

পার্সোনাল কোড নম্বরটা দিন, প্লীজ!

ডেটের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল রবিন, 'তোমার আম্মার কোড নম্বর কত?'

'জানি না!' মুখ কালো করে জবাব দিল ডেট। 'কোড নম্বর যে থাকে, তা-ই জানতাম না। তারমানে কোনও ঘরেই আর ঢুকতে পারছি না আমরা!'

এক মুহূর্ত ভাবল রবিন। 'শোনো, অত ভেঙে পড়ার কিছু নেই। একটা গোয়েন্দা কাহিনীতে পড়েছি, ব্যাংকের লকারে জিনিস লুকিয়ে রাখার পর কোড যেটা ব্যবহার করেছিল চোর, সেটা তার জন্মদিনের তারিখ। কারণ ভুলো মনের মানুষ ছিল সে। শুনেছি, অনেকেই নিজের জন্মদিনকে কোড হিসেবে ব্যবহার করে, মনে রাখার সুবিধের জন্যে। তোমার আম্মার জন্ম তারিখ কত?'

'সাতাশে নভেম্বর!'

'ভেরি গুড! নভেম্বর হলো এগারো নম্বর মাস। এগারো আর সাতাশ। পর পর সাজালে হবে এক-এক-দুই-সাত। টিপে দেখো তো ওরকম করে? কাজ না হলে অন্যভাবে সাজাব।'

মনিটরের নিচে তিনসারি নম্বর-কী। দ্রুত টিপে দিল ডেট। শেষ নম্বরটা টিপে দিয়ে দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটা মুহূর্ত কিছুই ঘটল না। তারপর কট করে একটা শব্দ হলো। গুঞ্জন তুলে খুলে গেল দরজা।

'দারুণ!' আনন্দে চিৎকার করে উঠতে গিয়েও থেমে গেল ডেট। 'সাংঘাতিক বুদ্ধি তোমার!'

'চলো চলো, প্রশংসা পরে করলেও চলবে, আগে কাজ সারি। এত তাড়াতাড়ি কোথায় লুকিয়ে পড়লাম আমরা ভেবে নিশ্চয় অবাক হচ্ছে ওরা। নিচে খোঁজা শেষ করে ওপরে চলে আসতে পারে।'

ঘরটায় ঢুকল দুজনে। অন্ধকার। দেয়াল হাতড়ে সুইচ বোর্ড বের করে আলো জেলে দিল রবিন।

অস্ফুট শব্দ করে উঠল ডেট।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল রবিন। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে এডগার।

এগারো

সোজা হয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ পাইলট। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে বিস্ময়ে।

খানিক পরেই ভুলটা ভাঙল ওদের। চোখের কোন পরিবর্তন নেই এডের। তাকিয়ে আছে একভাবে। তারমানে বিস্ময়ে বড় হয়নি। হয়ে আছে অন্য কারণে। হালকা নীলচে-হলুদ গ্যাসের কুণ্ডলী ঘুরছে ওর মাথার ওপর। এর মধ্যে দম নিচ্ছে ও।

'ও-ই তো আমাদের পাইলট!' ডেটকে বলল রবিন। 'আমাদেরকে কিজারভিলে নিয়ে এসেছে।'

এডগারের চোখ খোলা। বন্ধ হচ্ছে না একবারও। মনে হচ্ছে চোখ খোলা রেখেই যেন ঘুমাচ্ছে কিংবা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

'ওর এই অবস্থা কেন?' ডেটের প্রশ্ন।

'মনে হয় গবেষণা চালানো হচ্ছে ওর ওপর,' চিন্তিত ভঙ্গিতে এডের দিকে তাকিয়ে বলল রবিন। 'গ্যাসের চাপ কতখানি সইতে পারে, সেই গবেষণা। কিংবা এ ভাবে রেখে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। ওর জ্ঞান ফেরানোর ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখি।'

'কি করবে?' শঙ্কিত হলো ডেট। 'রবিন, যা করার বুঝেশুনে কোরো!'

একটা চেয়ার এনে তাতে উঠে দাঁড়িয়ে, ভেন্টিলেটারে লাগানো সরু যে পাইপের মুখ দিয়ে গ্যাস ঢুকছে, হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরে সেটা বন্ধ করে দিল রবিন।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই চোখ মিটমিট শুরু করল এডগার। যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠছে। কেশে উঠল। তারপর টলতে শুরু করল। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না আর। এতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে ছিল, অদ্ভুত কোন ঘোরের মধ্যে। রবিন আর ডেট দুদিক থেকে ধরে না ফেললে পড়েই যেত।

'ডেট, ওকে ধরে রাখো,' রবিন বলল। 'আমি ওই পাইপের মুখটা বন্ধ করে দিচ্ছি।'

একটা ডেস্কের ড্রয়ার থেকে এক রোল টেপ খুঁজে বের করল সে। চড়চড় করে টেনে খুলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ল। সেগুলো লাগিয়ে আটকে দিল মুখটা। বন্ধ হয়ে গেল গ্যাস আসা। চেয়ার থেকে নেমে এল সে।

ক্রমাগত কাশছে এডগার। গলার মধ্যে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। জ্ঞান ফিরছে ওর। মুখ তুলে তাকাল। ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে বলল, 'থ্যাংক ইউ। আমার প্রাণ বাঁচালে নাকি তোমরা?'

'কেন, তা-ও বুঝতে পারছেন না?' জিজ্ঞেস করল রবিন, 'এ ভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল কেন ওরা আপনাকে?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল এড। যেন প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি। তারপর হঠাৎ উঁচু হয়ে গেল দুই ভুরু। 'তুমি সেই ছেলেটা না, আজ সকালে যাকে নিয়ে এসেছিলাম? রবিন! হ্যাঁ, নামটাও মনে আছে। মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা, কিন্তু মনে হচ্ছে কত শত বছর পার হয়ে গেছে!'

'ল্যান্ড করার একটু পরই কি যেন হয়েছিল আপনার,' রবিন বলল। 'চিৎকার করে বলতে আরম্ভ করলেন আমাদের, সময় থাকতে কিজারভিল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। তার পর পরই একটা পুলিশ ভ্যান এসে হাজির হলো ওখানে। আপনাকে গ্যাস দিয়ে অজ্ঞান করে তুলে নিয়ে গেল।'

'তারমানে এখানেই নিয়ে এসেছিল আমাকে,' ঘরের চারপাশে তাকাতে তাকাতে এড বলল। 'নিশ্চয় আমার ওপর পরীক্ষা চালানো হয়েছে।'

'কিসের পরীক্ষা?' জিজ্ঞেস করল ডেট। 'আপনি কিছু জানেন না, না?'

'জানব কি করে? মনে রাখার জন্যে আমার মগজটাকে কি আর সুস্থ রেখেছিল নাকি? কিজারভিলে কি ঘটছে জানো তোমরা? এখানকার মানুষগুলোকে কি করে ফেলা হচ্ছে? কেন পথঘাটশূন্য এ রকম একটা এলাকায় শহর তৈরি করেছে, যেখানে প্লেন ছাড়া পৌঁছানোর আর কোন উপায়ই নেই? জানো ওরা কি করার পরিকল্পনা করেছে ভবিষ্যতে?' একনাগাড়ে অনেকগুলো প্রশ্ন করে ফেলল এডগার।

'আমরা শুধু জানি,' ডেট জবাব দিল, 'এই কারখানার মধ্যে গ্যাস তৈরি হচ্ছে। সেই গ্যাসের মধ্যে দম নিতে বাধ্য করা হচ্ছে সবাইকে।'

'ঠিকই জেনেছ, ইয়াং লেডি। ভয়ঙ্কর এই গ্যাস। এর মধ্যে শ্বাস নিলেই মগজ গড়বড় হয়ে যায় মানুষের। তাদের মনের সঠিক চিন্তা-ভাবনা বা ইচ্ছাশক্তি বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। নিয়ন্ত্রণ চলে যায় অন্যের কাছে।'

'কার কাছে?'

'গ্যাসের কাছে।'

হাঁ করে এডের দিকে তাকিয়ে রইল ডেট আর রবিন দুজনেই। ওর কথা কিছুই বুঝতে পারল না।

'বুঝলে না? শোনো, বলছি। এখানে একটা গবেষণা চলছিল যেটা হঠাৎ করে গবেষকদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কয়েক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে একটা নতুন ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল এমন কোন ধরনের তরল কিংবা গ্যাস জাতীয় ওষুধ বানানো, যেটা মানুষের নানা রকম জটিল মানসিক রোগ দূর করে তাকে আরাম দেবে, শান্তি দেবে।'

'কিন্তু আরাম হারাম করে দিয়ে শান্তির বদলে দিল অশান্তি,' বলে উঠল রবিন, 'তাই না?'

'হ্যাঁ,' তিক্ত হাসি হাসল এড। 'ওষুধের বদলে ওরা বানিয়ে বসল ভয়াল এক গ্যাসের দানব। ভয়ঙ্কর ওই গ্যাসে শ্বাস টানলে আরাম তো হয়ই না, বরং নিজের মনের নিয়ন্ত্রণ আর ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ওই মানুষগুলো হয়ে যায় তখন গ্যাসের গোলাম।'

'গ্যাসের গোলাম?' অবাক হয়ে গেল ডেট। 'সেটা আবার কি? এমন করে বলছেন, যেন গ্যাসটা একটা জীবন্ত কিছু, কোন প্রাণী।'

'হ্যাঁ, ঠিক তা-ই,' মোলায়েম স্বরে বলে দুজনের দিকে তাকাতে লাগল এড। ওটা জীবন্ত কিছুই—জীবন্ত এক দানব। প্রতি মুহূর্তে শক্তি সঞ্চয় করে করে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে।'

গ্যাস কি করে জীবন্ত প্রাণী হয়, মাথায় ঢুকল না ডেটের। কল্পনা করে নিল, মহাক্ষমতাশালী কোন ধরনের একটা দানব-টানব হবে। মহাকাশ থেকে কত ধরনের জীব নেমে আসে, সিনেমায় দেখেছে, ওরকম কিছু।

এ ধরনের কল্পনার মধ্যে গেল না রবিন। একটা বাস্তব প্রশ্ন করল, 'সবারই ক্ষতি হলে আমাদের হচ্ছে না কেন? আমার আর ডেটের? আমরাও তো এই গ্যাসের মধ্যে শ্বাস নিয়েছি।'

'আপনার ব্যাপারটাই বা কি?' সুর মেলাল ডেট। 'আপনিও তো এই গ্যাসে শ্বাস টেনেছেন। দানবের নিয়ন্ত্রণে তো চলে যাননি?'

'গেছি, তবে পুরোপুরি নই। আমাকে অন্যদের মত কাবু করতে পারে না। গ্যাস-দানবের দুর্বল পয়েন্ট আমি,' জবাব দিল এড। 'কিন্তু তোমরা তো দেখছি আমার চেয়ে ক্ষমতাশালী! আমার ওপর গ্যাস কিছুটা অন্তত ক্রিয়া করে, তোমাদের ওপর একেবারেই করে না। বাইরে পাঠানোর আগে আমাকে এই চেম্বারে নিয়ে এসে ভালমত গ্যাস শোঁকানো হয়, যাতে অন্তত চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে রোবট হয়ে থাকি। জাহাজে করে যাদের বাইরে পাঠানো হয়, প্রয়োজনীয় খাবার কিংবা অন্যান্য জিনিস আনতে, তাদের বেলায়ও একই কাজ করা হয়। ওই রোবট অবস্থায় যেসব নির্দেশ ঢুকিয়ে দেয়া হয় আমাদের মগজে, অক্ষরে অক্ষরে পালন করি আমরা। তবে এখানকার আর সবার মত গ্যাস পুরোপুরি ক্রিয়া করে না আমার ওপর। খুব তাড়াতাড়ি ওটার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাই আমি। যেমন, এবার তোমাদের নিয়ে আসার বেলায় গেলাম।...কপাল খারাপ! নইলে আর কয়েক মিনিট আগে সুস্থ হলেই... যাকগে, এখন ভেবে আর লাভ নেই...।' রবিনের দিকে তাকাল সে, 'গ্যাসের প্রভাবমুক্ত হলে যেই চিন্তাশক্তি স্বাভাবিক হয়ে যায়, বিদ্রোহ করে বসি। বন্দরে নেমে চিৎকার করে উঠেছিলাম সেজন্যেই। আগেও এ রকম করেছি। এখানকার পুলিশ তখন আমাকে ধরে নিয়ে আসে এই ঘরে। গ্যাস শুঁকিয়ে আবার মগজধোলাই করে দেয়। আমিই এখানকার একমাত্র পাইলট না হলে হয়তো বাইরে পাঠাত না আমাকে।

'আমার ওপর গ্যাস ঠিকমত কাজ না করার একটা কারণ হতে পারে, রক্তে প্রবাহিত অক্সিজেনের তারতম্য। গভীর সাগরে ডুব দিতে ভাল লাগে আমার। সময় পেলেই ডুবুরির পোশাক পরে পানির নিচে নেমে যাই। ট্যাংক থেকে তখন যে বিশুদ্ধ অক্সিজেন টেনে নিই, তাতেই বোধহয় সাধারণ মানুষের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে গেছে আমার ফুসফুস। রক্তপ্রবাহে কোন একটা পরিবর্তন ঘটেছে। আমার ধারণা, এই গ্যাসের একটা প্রতিষেধক বিশুদ্ধ অক্সিজেন। গ্যাসে আক্রান্ত মানুষের ফুসফুসে সরাসরি অক্সিজেন চালান করে দিতে পারলে গ্যাসের প্রভাব কেটে যায়।'

আবার ডেট আর রবিন, দুজনের মুখের ওপর চোখ বোলাতে লাগল এড। 'কিন্তু তোমাদের ঘটনাটা কি? তোমাদের ওপর তো কোন ক্রিয়াই করে না গ্যাস।'

'জানি না, কেন করে না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'কোন রকম স্পেশালিটি নেই

আমার।'

'নেই মানে!' জোরে মাথা ঝাঁকাল ডেট, 'নিশ্চয় আছে! হাঁপানি আছে না তোমার!'

'তাতে কি?' এডগারের সামনে হাঁপানির কথা বলায় অস্বস্তি বোধ করল রবিন।

'তাতেই তো সব। ইনহেলেটর নেয়ার প্রয়োজন হয় তোমার। রক্তস্রোতে…'

ডেটকে কথা শেষ করতে দিল না রবিন, চিৎকার করে উঠল, 'ঠিক বলেছ! ঠিক! তোমারও রক্তস্রোতেই গোলমাল! ডায়াবেটিসের জন্যে ইনসুলিন নেয়া লাগে নিয়মিত!'

'হ্যাঁ, এইটাই হলো জবাব!' মাথা সোজা করে দাঁড়াল এড। 'হাঁপানির স্প্রে আর ডায়াবেটিসের ইনসুলিন রক্ত আর ফুসফুসে গিয়ে গ্যাসের বিরুদ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কাজ করতে দেয় না গ্যাসকে। এ কারণেই গ্যাস তোমাদের কিছু করতে পারেনি। তোমাদের এই অসুবিধের কথা এখানে আর কেউ জানে?'

'জানে, থিওডোর কলিন্স,' ডেট বলল। 'এখানকার ল্যাবরেটরিতে রিসার্চ কেমিস্টের কাজ করে আমার আম্মা। সে-ই জানিয়ে দিয়েছে কলিন্সকে।'

'আমি যে ইনহেলেটর নিই, এটাও জেনে গেছে কলিন্স,' রবিন বলল। 'আমার সমস্ত ইনহেলেটরগুলো নষ্ট করতে বলে দিয়েছে কিশোরকে। আমার বন্ধু কিশোর আর মুসাকে তো চেনেন? প্লেনে দেখেছেন। ওরা, আর হিরুচাচা, মানে মিস্টার হিরন পাশাও গ্যাসের কন্ট্রোলে চলে গেছে। ওরাও এখন রোবট।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল এডগার। 'পুরোপুরি সুস্থ মানুষদেরই দেখা যাচ্ছে এখানে বিপদ। শোনো, বাঁচার একটাই উপায় আছে, এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে এখন আমাদের। বাইরের পৃথিবীতে গিয়ে পুলিশকে জানিয়ে দিতে হবে এখানে কি ঘটছে। এবং সেটা করতে হবে আজ রাতের মধ্যেই।'

'কিন্তু হিরুচাচা আর কিশোর এবং মুসাকে ফেলে যাই কি করে?' রবিন বলল। 'ওদের নিয়ে যেতে হবে। হিরুচাচা এই কয়েক গজের মধ্যেই আছেন। এ ঘরের ওপাশে আরেকটা ঘরে।'

'ওখানে কি করছে ওরা জানো? গ্যাস-দানবের ইচ্ছেয় কাজ করছে। গবেষণা করে গ্যাসের শক্তি এমনভাবে বাড়ানোর চেষ্টা করছে যাতে ইনহেলেটর কিংবা ইনসুলিন নেয়া মানুষের ওপরও সেটা প্রভাব খাটাতে পারে। বিশুদ্ধ অক্সিজেনে শ্বাস টেনেও যাতে আর দানবের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে না পারে মানুষ। একবার যদি সেটা করে ফেলতে পারে, তাহলে গোটা পৃথিবীর অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে দেবে মারাত্মক ভয়াবহ নীলচে-হলুদ গ্যাস। সমস্ত মানবকূলের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলবে ওই দানব। সবাইকে গোলাম বানিয়ে রাখবে। তার ইচ্ছে মাফিক কাজ করতে বাধ্য করবে।'

'হিরুচাচা আর কিশোর-মুসাকে ছাড়া এখান থেকে বেরোব না আমি,' জেদ ধরল রবিন।

'কি করে বোঝাবে ওদের, রবিন?' প্রশ্ন করল ডেট। 'বললেই সুড়সুড় করে তোমার সঙ্গে রওনা হয়ে যাবে না ওরা। বরং দানবের ইচ্ছেমত আটকে দেবে আমাদের। তখন আর বেরোনোরও উপায় থাকবে না। কিছুই করার থাকবে

না।...এডগারভাই যা বলছে, সেটাই আমাদের করা উচিত। একবার বাইরে গিয়ে পৌঁছতে পারলে সাহায্য নিয়ে ফিরে এসে ভয়ানক দানবের কবল থেকে সবাইকে উদ্ধার করতে পারব।'

'কিন্তু এ ভাবে লেজ গুটিয়ে চোরের মত পালাতে আমি পারব না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রবিন। 'ফাইট একটা দিতেই হবে।'

'কিভাবে দেবে সেটা শুনি?'

পকেট থেকে ইনহেলেটরটা টেনে বের করল রবিন, 'এটার সাহায্যে।'

বারো

'কি বলছ তুমি, রবিন?' অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ডেট।

অতি সাধারণ একটা প্লাস্টিকের ইনহেলেটর দিয়ে এতবড় দানবের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করতে চায় রবিন, এডগারও বুঝতে পারল না।

'এটার ওষুধ যদি আমাকে সুস্থ রাখতে পারে, হিরুচাচাকেও পারবে,' বুঝিয়ে বলল রবিন। 'তাঁর নাকের সামনে ধরে স্প্রে করে দেব। সরাসরি ফুসফুসে অক্সিজেন ঢুকলেই গ্যাসের বিষক্রিয়া থেকে মুক্তি পাবেন তিনি। তখন তাঁকে বোঝানো আর কঠিন ব্যাপার হবে না।'

'আহ্, দারুণ বুদ্ধি বের করেছ তো, সত্যি, রবিন!' এড বলল। 'কিন্তু ডেঞ্জারাস। কতটা ঝুঁকি নিতে চলেছ বুঝতে পারছ?'

'যতবড় ঝুঁকিই হোক, একটা শেষ চেষ্টা না করে আমি এখান থেকে নড়ছি না।'

'ও-কে,' ঠোঁট গোল করে শিস দিল এড। 'একটা কিছু না করে তুমি যাবে না বুঝতে পারছি। যা বলি এখন, মন দিয়ে শোনো। কারখানার ঠিক পেছনে একটা রাস্তা আছে, সোজা চলে গেছে জলাভূমির দিকে। শর্টকাটে জলাভূমি পেরিয়ে গেলেই পাওয়া যাবে নদী, যেখানে আছে প্লেনটা। আমি আর ডেট গিয়ে প্লেনে উঠে বসে থাকব। পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করব তোমার জন্যে। এর মধ্যে যদি না আসো, তোমাকে না নিয়েই চলে যাব। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।'

'রবিন, দোহাই তোমার, এ পাগলামি করতে যেয়ো না!' অনুরোধ করল ডেট, 'পারবে না কিছু করতে!'

'পাগলামি বলো আর যাই বলো, আমি এ ভাবে যাচ্ছি না। পাশের ঘরেই রয়েছেন হিরুচাচা। বাড়িতে রোবট হয়ে বসে আছে আমার সবচেয়ে প্রিয় দুই বন্ধু। সবাইকে এ ভাবে ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে আমি যেতে পারব না। হিরুচাচাকে সুস্থ করতে পারলেই শক্তি অনেক বেড়ে যাবে আমাদের। একই কায়দায় তখন কিশোর আর মুসাকেও সুস্থ করব। ওদের নিয়ে ছুটে যাব প্লেনের কাছে। আর যেতে যদি না-ই পারি, তোমরাই গিয়ে সাহায্য নিয়ে আসতে পারবে।'

'বেশ, তাহলে আমিও যাচ্ছি না। এডগারভাই একাই যাক।'

'পাগলামি কোরো না!'

'তুমি করছ, আমি করলে দোষ কি? তুমি যদি তোমার চাচাকে ফেলে যেতে না পারো, আমিই বা আমার বাবা-মাকে ফেলে যাব কেন? তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ। আমরা যেতে না পারলেও এডগারভাই যেতে পারবে। সাহায্য আসবে। বেঁচে যাব আমরা।'

'যদি ততক্ষণ বাঁচিয়ে রাখে দানবটা আমাদের।'

'না রাখলে আর কি করব? সারা পৃথিবীকে বাঁচাতে গিয়ে আমাদের দুটো জীবন যদি যায়ই, যাক না।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওদের দিকে তাকিয়ে রইল এড। চোখে নতুন দৃষ্টি। মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। পঁয়তাল্লিশ মিনিট, মনে থাকে যেন। গুড লাক।'

'গুড লাক,' হেসে বলল ডেট। 'আমরা যদি আসতে না-ও পারি, দয়া করে প্লেনটা নিয়ে নিরাপদে মিয়ামি এয়ারপোর্টে পৌঁছাবেন, এডগারভাই। তাহলেই বেঁচে যাব আমরা।'

'অবশ্যই পৌঁছব,' কথা দিল এডগার। রবিন আর ডেটের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। 'কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবে না।'

'সময় নেই হাতে,' রবিনকে বলল ডেট। 'দেরি করা যায় না আর।'

'চলো।'

ওঘর থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। হলওয়েতে দাঁড়িয়ে সাবধানে এ পাশ ওপাশ দেখল। শূন্য, নির্জন। নিঃশব্দে এগোল 'প্রোজেক্ট মাইন্ড কন্ট্রোল' লেখা দরজাটার দিকে।

কাছে এসে স্লট দেখিয়ে রবিন বলল, 'কার্ড ঢোকাও।'

ঢোকাল ডেট। কোড নম্বর জানতে চাইল মনিটর। জানিয়ে দিল ডেট। আগের বারের মতই মায়ের জন্ম তারিখটা নম্বর বানিয়ে টিপে দিল।

কাজ হলো না। মনিটর জানাল:

ভুল কোড। নতুন করে নম্বর দিন, প্লীজ!

'ঠিকই আছে,' অবাক হলো না রবিন। 'এটুকু সাবধান তো হবেই এতবড় একটা প্রতিষ্ঠান। যদি কেউ কারও কার্ড চুরি করে আনে—আমরা যেমন আনলাম, যাতে সহজে সব ঘরে ঢুকে পড়তে না পারে তার জন্যে এই ব্যবস্থা। একেক জায়গার জন্যে একেক নম্বর চাইছে সেজন্যে।' ডেটের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। 'কিন্তু তোমার আম্মা নম্বর দেয়ার আগে কি কল্পনাও করতে পেরেছিলেন তাঁর নিজের মেয়েরই দরকার হবে কোডগুলো? যাই হোক, ভালই হয়েছে নিজের মেয়ে হওয়াতে।'

'মানে?' ভুরু কোঁচকাল ডেট। বুঝতে পারেনি।

'তোমার জন্ম কত তারিখে?'

'আমার? জুনের সতেরো তারিখ। কেন?'

'লোকে সব সময় কোড নম্বর ব্যবহার করে সহজে যেটা মনে করতে পারে,

তাই না? নিজের জন্মদিন, ছেলেমেয়ের জন্মদিন, এগুলোই বেশি মনে থাকে। ভুল হওয়ার কোন অবকাশ নেই'। অতএব...'

রবিনের কথা শেষ হওয়ার আগেই নম্বর টিপতে শুরু করেছে ডেট।

এবারেও সঠিক হলো রবিনের অনুমান। খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা।

বড় একটা হলঘর। অনেকটা সিনেমা হলের মত। তবে ওরকম লম্বাটে নয়, গোল। সারি সারি চেয়ার চক্রাকারে সাজানো, সিনেমা হলের সীটের মতই ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে। ব্যতিক্রম শুধু এখানে কোন পর্দা নেই, আর সীটগুলো চতুর্দিক থেকেই নিচে নেমেছে। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে শাঙ্কব বা চোঙা আকারের একটা মেঝে। চোঙার কেন্দ্রে অর্থাৎ ঠিক মাঝখানে গর্তমত জায়গাটায় বিশাল এক মঞ্চ।

'কি সাংঘাতিক!' নিজের অজান্তেই যেন কথাটা বেরিয়ে গেল ডেটের মুখ দিয়ে।

ওপর থেকে নেমে আসা আলোয় আলোকিত মঞ্চ। সেটাকে ঘিরে চেয়ারে বসেছে প্রায় বিশজন নারী-পুরুষ। হিরুচাচা আছেন তাঁদের মধ্যে। থিওডোর কলিন্সকেও দেখা গেল। অন্যদের চিনতে পারল না রবিন, তবে পোশাক-আশাকে বোঝা গেল তারাও সবাই বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ, গবেষক।

মঞ্চের ঠিক মাঝখানে অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য। প্রায় দম বন্ধ করে তাকিয়ে আছে দুজনে। মস্ত এক কাঁচের তৈরি গম্বুজ বসানো ওখানে। যেন রূপকথার সিনেমায় দেখা ক্রিস্টাল বল, যেটাতে জাদুকর অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সমস্ত জিনিস দেখতে পায়। গম্বুজটা নীল আর হলুদ রঙের সেই বিচিত্র গ্যাসে ভরা। ক্রমাগত নড়ে বেড়াচ্ছে গম্বুজের মধ্যে। সবচেয়ে অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা হলো, মানুষের ভাষায় কথা বলছে সেই গ্যাস।

'শুধু ছোট্ট একটা মেয়ে ইনসুলিন নিয়ে অস্বাভাবিক থাকছে, এতে ভয় পাওয়ার তেমন কিছু ছিল না। ধৈর্য ধরতে পারতাম। প্রতিষেধক পাওয়া যেতেই,' মানুষের ভাষা, কিন্তু যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর—কিংবা বায়বীয় বা গ্যাসীয় কণ্ঠস্বর গম্বুজের ভেতরের অদ্ভুত জিনিসটার। 'কিন্তু এখন ইনহেলেটরওয়ালা নতুন ছেলেটো নতুনভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করেছে আমাকে। ব্যাপারটার আশু সমাধান জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা অ্যান্টিডোট তৈরি করতেই হবে। আমি আদেশ করছি আজকেই বানিয়ে দেয়ার জন্যে। যতক্ষণ না আমি নিশ্চিত হতে পারছি সব ধরনের মানুষকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হব, ততক্ষণ সমস্ত মানবজাতির ওপর, দুনিয়ার ওপর আক্রমণ চালিয়ে ওদের গোলাম বানানোর ঝুঁকি নিতে পারব না আমি। বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ, প্রভু!' সমস্বরে জবাব দিল সবাই।

'ওখানে যাওয়া দরকার,' হাত তুলে লোকগুলোকে দেখাল রবিন।

'আমি তোমার পেছনেই আছি,' রবিনের মতই ফিসফিস করে জবাব দিল ডেট।

সীটের সারির মাঝখান দিয়ে নিঃশব্দে এগোল দুজনে।

ওদের উপস্থিতি টের পায়নি গ্যাসের দানব। নির্দেশ দিয়েই চলেছে। রাগত

কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ডক্টর পাশা, তোমার হিসেব কি বলে? কি বুঝতে পারলে?'

'এখানকার হিসেবমত, প্রভু, আটানব্বই দশমিক তিয়াত্তর পার্সেন্ট আপনার গোলাম হওয়ার উপযুক্ত।' খাঁটি গোলামের ভঙ্গিতে জড়সড় হয়ে জবাব দিলেন হিরুচাচা।

মঞ্চের কাছাকাছি প্রায় অর্ধেকটা নেমে গেছে রবিন আর ডেট।

'তারমানে এক পার্সেন্টের বেশি এখনও অবশিষ্ট আছে যারা আপনার বিরুদ্ধে কথা বলবে,' বলে চলেছেন হিরুচাচা। 'আপনার ক্ষমতা ওদের ওপর কাজ না করার কারণ হলো এমন কোন জিনিস ঢুকছে ওদের শরীরে, যেটা গোলমাল করে দিচ্ছে ওদের মগজ, স্বাভাবিক হতে দিচ্ছে না। এখন পর্যন্ত প্রমাণিত জিনিসগুলোর মধ্যে রয়েছে হাঁপানির ইনহেলেটর, ডায়াবেটিসের ইনসুলিন, যন্ত্রের সাহায্যে সরাসরি ফুসফুসে টেনে নেয়া বিশুদ্ধ অক্সিজেন, এ সব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখানে আপনার যত মেধাবী গোলাম আছি আমরা, সবাই মিলে চেষ্টা করলে এর একটা সমাধান বের করে ফেলতে পারব। সেটা একবার করতে পারলে আর কোন বাধা থাকবে না। দুনিয়ার যত মানুষ সব গোলাম হয়ে আপনার পায়ের তলে লুটোপুটি খাবে।'

সবাই হাততালি দিয়ে সমর্থন জানাল হিরুচাচার কথায়।

তার কয়েক ফুটের মধ্যে চলে এসেছে রবিন আর ডেট। ওদের উপস্থিতি এখনও কেউ টের পায়নি। হাততালি আর হিরুচাচার প্রশংসা চলছে এখনও।

'এটাই সুযোগ!' বলে উঠল রবিন। 'এসো!'

লাফ দিয়ে গিয়ে সবার সামনে দাঁড়াল দুজনে।

চিৎকার করে বলল রবিন, 'বোকার মত এর গোলামি করছেন আপনারা! বাধা দেয়ার এটাই সময়!'

স্তব্ধ হয়ে গেল সব কোলাহল। বোবা হয়ে রবিনের দিকে তাকিয়ে আছেন হিরুচাচা। যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না এ রকম বেঈমানী করতে পারে প্রভুর সঙ্গে ওই পুঁচকে ছেলেটা। মরা মাছের মত হাঁ হয়ে গেছে তাঁর মুখ।

সোজা সেই মুখের সামনে এসে ইনহেলেটরের বোতাম টিপে দিল রবিন।

কিছু বেরোল না।

আরও জোরে টিপল সে। এবারও বেরোল না। যত টেপাটেপিই করল, কোন কিছুই আর বেরোল না। খালি! বোকা হয়ে গেল সে।

'বিদ্রোহী সেই ছেলেমেয়ে দুটো!' চিৎকার করে বলল থিওডোর কলিন্স।

'বসে আছ কেন গর্দভের মত!' রাগে গর্জন করে উঠল গ্যাসের দানব। 'জলদি ধরো!'

'বেরোও!' রবিনও চিৎকার করে বলল ডেটকে। 'এক্ষুণি বেরোও এখান থেকে!' সীটের সারির ফাঁক দিয়ে দৌড় দিল সে।

রবিন আর ডেটকে ধরার জন্যে সব কজন লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে তাদের সীট থেকে।

'কোনদিক দিয়ে বেরোব!' ককিয়ে উঠল ডেট। 'সবাই আসছে আমাদের ধরতে! পালানোর কোন পথ নেই!'

রবিনও বুঝতে পারল সেটা। দরজা আটকানোর জন্যে দৌড় দিয়েছে কয়েকজন। এতগুলো বড় মানুষের সঙ্গে পারবে না বুঝতে পেরে ঘুরে দাঁড়াল সে। মঞ্চের দিকে ছুটল। এমনিতেও মরেছে, ওমনিতেও, দানবটার একটা কিছু না করে ছাড়বে না। ভেঙে দেবে শয়তানের বাসা। একটা চেয়ার হাতে নিয়ে সোজা লাফ দিয়ে গিয়ে মঞ্চে উঠে পড়ল। দুহাতে মাথার ওপর তুলে ধরে গায়ের জোরে বাড়ি মারল কাঁচের গম্বুজটাতে।

তেরো

হই-চই, চিৎকার করছে সবাই। কাঁচের খোঁয়াড় ভেঙে যাওয়ায় মুহূর্তে নীল আর হলুদ গ্যাসে ভরে গেল সারা ঘর।

'এদিকে এসো!' চেঁচিয়ে ডেটকে ডাকল রবিন। 'ওদিকে গিয়ে লাভ নেই!'

মঞ্চ থেকে নেমে ঢাল বেয়ে ওপর দিকে ছুটল সে। এ ভাবে ওপর দিকে ওঠা খুব কষ্টকর, বিশেষ করে তার মত হাঁপানির রোগীর জন্যে। ডেটের শরীরও দুর্বল। রোজ যাকে ইনসুলিন নিতে হয়, তার অবস্থা ভাল হওয়ার কথাও নয়। কিন্তু এখন ওদের ছোটাছুটি দেখলে কেউ সেকথা ভাববে না। প্রাণের ভয় গায়ের জোর অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

সবাই ওদের পিছু নিয়েছে। দরজার কাছ থেকে সরে এসেছে। ঘুরে সেদিকে দৌড় দিল রবিন।

পেছনে ছুটতে ছুটতে ডেট জিজ্ঞেস করল, 'তোমার হিরুচাচার কি হবে?'

'ওসব ভেবে লাভ নেই আর!' চিৎকার করে জবাব দিল রবিন। 'তাকে নেয়া যাবে না। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এখন এডগারভাইয়ের প্লেনের কাছে পৌঁছতে হবে।'

বড়রা দৌড়ের বাজিতে হেরে গেল ওদের সঙ্গে। একছুটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে, যে বারান্দা দিয়ে ঢুকেছিল সেটাতে। দরজা লাগিয়ে দিল রবিন। কোড-এনট্রি ডিভাইসটা ভেঙে দিল।

'এ কাজ করলে কেন?' জানতে চাইল ডেট।

'দরজাও খুলতে পারবে না ওরা, আমাদের পেছনে ছুটেও আসতে পারবে না আর। বেরোতে হলে অন্য কোন দরজা ব্যবহার করতে হবে। ততক্ষণে হাওয়া হয়ে যাব আমরা।'

'মানুষ বেরোতে পারবে না বটে, কিন্তু ওই দেখো,' হাত তুলে দেখাল ডেট, দরজার একটা ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে নীল-হলুদ গ্যাস।

'ওটা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমাদের এখন একমাত্র কাজ প্লেনের কাছে যাওয়া,' দেয়ালের একটা ঘড়ির দিকে তাকাল রবিন। 'আর মাত্র পঁচিশ মিনিট আছে। এ সময়ের মধ্যে পৌঁছতে না পারলে আমাদের রেখেই চলে যাবে এডগারভাই।'

দুড়দাড় করে লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি বেয়ে নিচতলায় নেমে এল ওরা। একপাশে একটা দরজার ওপর EXIT লেখা আছে। নিশ্চয় বাইরে যাওয়ার পথ। ছুটল সেদিকে। কোড ছাড়া না খুললেই এখন বিপদ।

কিন্তু সেরকম কোন বিপদে পড়তে হলো না এখানে। ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল রবিন। বিশেষ বিশেষ দরজা বাদে বাকিগুলোতে কোড সিসটেম লাগানোর প্রয়োজন বোধ করেনি কর্তৃপক্ষ।

বাইরে বেরিয়ে এল দুজনে। থমকে দাঁড়াল। ইউনিফর্ম পরা আট-দশজন পুলিশ দৌড়ে আসছে এদিকে।

'মরেছি!' বলে উঠল রবিন। 'এখন কি করা?'

জবাব দিল না ডেট। চুপ করে তাকিয়ে আছে।

কোমরের খাপ থেকে পিস্তল খুলে নিয়ে ওদের দিকে তাক করল পুলিশেরা। দৌড়ে ওদের কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল ডেট, 'আপনারা নিশ্চয় দুটো ছেলেমেয়েকে খুঁজছেন? এইমাত্র দেখে এলাম ওরা ভেতরে আছে। সাততলায়।'

'থ্যাংক ইউ, ইয়াং গার্ল,' ভোঁতা স্বরে বলে উঠল সামনের পুলিশ অফিসার। ঢুকে পড়ল খোলা দরজা দিয়ে। ভেড়ার পালের মত তার পেছনে ঢুকে গেল বাকি দলটা।

'বাহ্, দারুণ দেখালে তো!' খুশি হয়ে বলল রবিন।

'কিজারভিলে আসার আগে একজন টিচার ছিলেন আমার। তিনি বলতেন–বিপদের সময় মনকে স্বাভাবিক রাখবে, কখনও ভয় ঢুকতে দেবে না। সহজভাবে চিন্তা করতে পারবে তাহলে। উপস্থিত বুদ্ধিগুলো চট করে মাথায় চলে আসবে তখন।'

রাস্তা এখন পরিষ্কার। কারখানার পেছন দিয়েই বেরিয়েছে ওরা। ছুটল জলাভূমির উদ্দেশে।

একটা কাঁচা রাস্তায় এসে পড়ল। এদিকটায় এখনও উন্নয়ন শুরু হয়নি। একেবারে আদিমই রয়ে গেছে। লাইট পোস্ট বসানো হয়নি। আলো নেই। তবে আকাশে চাঁদ আছে। জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল। সেই আলোয় পথ দেখে ছুটতে লাগল ওরা।

'ক'মিনিট বাকি আছে আর?' জিজ্ঞেস করল ডেট।

'জানি না,' হাঁপানো শুরু হয়ে গেছে রবিনের। 'ছুটতে থাকো। যতটা বাজে বাজুক।'

'হাঁপানি তো শুরু হয়ে গেছে আবার তোমার!' শঙ্কিত হলো ডেট।

'আমার কিছুই হয়নি!'

'ইনহেলেটরও তো নেই তোমার!'

'দৌড়াও তো! অহেতুক কথা বোলো না!'

হাঁপানির আক্রমণের কথা ভাবতেও ভয় লাগছে এখন রবিনের। অনেক উত্তেজনা গেছে, অনেক ছুটাছুটি করে ফেলেছে, আক্রমণ আসাটা এখন স্বাভাবিক। ওসব দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে মনকে অন্যদিকে সরানোর চেষ্টা করছে সে। একটাই চিন্তা

যে কোনভাবেই হোক প্লেনের কাছে পৌঁছতে হবে।

পায়ের নিচে ভেজা মনে হলো মাটি।

'জলাভূমিতে চলে এসেছি,' ডেট বলল।

'মনে হচ্ছে।'

'ভাগ্যিস চাঁদ আছে। তাই এত আলো। আমার তো ভয়ই লাগছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার বনের মধ্যে গিয়ে না পড়ি।'

'অ্যালিগেটর নেই তো?'

'থাকতেও পারে। নদীর ওপারে তো শুনেছি কিলবিল করে ওরা। ভয়ঙ্কর জায়গা।'

'তা ঠিক। তবে কিজারভিলের চেয়ে খারাপ নয়। ওখানে তো শয়তানের বাসা।'

'শয়তান নয়, দানব!'

পচাৎ পচাৎ করছে কাদা। পানি ছিটকে উঠছে। কষ্টকর হয়ে পড়েছে চলা। তার ওপর গায়ে এসে বসছে নানা রকম পোকামাকড়। কোনটা কামড়ে দিচ্ছে, কোনটা দিচ্ছে সুড়সুড়ি, কোনটা গায়ে বসলেই জ্বালা করে উঠছে চামড়া। ভয়াবহ পরিস্থিতি। ছোটার গতি কমে গেল ওদের।

রবিনের চেয়ে বেশি দৌড়াতে পারে ডেট। আগে আগে চলেছে। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল রবিন কতটা দূরে আছে দেখার জন্যে। তাকিয়েই কেঁপে উঠল। চিৎকার করে বলল, 'রবিন!'

'কি?'

'ওই দেখো!'

ফিরে তাকাল রবিন। জায়গাটা এত আলোকিত হওয়ার কারণ এতক্ষণে পরিষ্কার হলো। শুধু চাঁদের আলো নয়, ওদের পেছনে ছুটে আসছে সেই ভয়ঙ্কর হলুদ-নীল গ্যাসের মেঘ। ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাচ্ছে ওটা, জীবন্ত প্রাণীর মত। উজ্জ্বল আলোর ছটা বেরোচ্ছে ওই রঙিন মেঘের গা থেকেই।

'আসুক। আমাদের আটকাতে পারবে না। ওর গ্যাসে কোন ক্ষতি হয় না আমাদের। থামলে কেন? দৌড়াও।'

ছুটতে থাকল ওরা। রবিনের মনে হচ্ছে ওর ফুসফুসে আগুন ধরে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে দমল না সে। থামলও না। পা চালিয়ে চলেছে। মাথার মধ্যে একটা চিন্তাই কাজ করছে, প্লেনের কাছে পৌঁছতে হবে।

'ওই যে, আছে!' আবার চিৎকার করে উঠল ডেট।

পাঁকে ভরা জায়গাটার পরে নদী। প্লেনটা চোখে পড়ল। ডানার আলো জ্বলছে-নিভছে। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ফেলেছে এডগার।

এদিকেই তাকিয়ে আছে সে। দেখে ফেলল ওদের। এঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে ডেকে বলল, 'তাড়াতাড়ি! জলদি করো!'

জলাভূমি পেরিয়ে নদীর পাড়ে পৌঁছে গেল দুজনে। দরজা খুলে দিল এডগার। উঠে পড়ল ওরা। পেছনের সীটে নেতিয়ে পড়ল ডেট। রবিন বসল সামনের সীটে এডগারের পাশে। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক।

'বেল্ট বাঁধো। এখুনি উড়াল দেব,' তাড়া দিল এডগার।
পানির ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করল বিমান। গতি বাড়ল। কোণাকুণি উঁচু করে ফেলল নাক। শূন্যে উড়াল দিল।
এডগার চলে আসার পর যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে তাকে জানাল রবিন।
মন দিয়ে সব কথা শুনল এডগার। 'যাক, যা হবার হয়েছে। নিরাপদে বেরিয়ে যে আসতে পেরেছি এটাই ভাগ্য। এখন যত তাড়াতাড়ি পারি গিয়ে সাহায্য নিয়ে আসতে হবে। আমার মনে হয় ওই দানবের হাত থেকে কিজারভিল দখল করার জন্যে মিলিটারি দরকার হবে। ডাক্তার তো লাগবেই।' এক মুহূর্ত চিন্তা করল, 'ভাল কথা, দানবটার কি হলো? তোমাদের পেছনে ছুটে আসতে নাকি দেখেছ?'
সীটে বসে বিশ্রাম নেয়াতে হাঁপানো কমেছে রবিনের। গলা বাড়িয়ে নিচে তাকাল। কোথাও দেখতে পেল না আলোকিত গ্যাসের মেঘটাকে।
'গ্যাসের হয়তো গ্যাস ফুরিয়ে গেছে,' পেছন থেকে রসিকতা করল ডেট।
হেসে উঠল তিনজনেই।
পরমুহূর্তেই থেমে গেল হাসি। ডেটের পেছন থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল গ্যাস। দেখতে দেখতে ভরে ফেলল প্লেনের ভেতরটা। এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল লেজের পেছনে কোনখানে। সময় মত বেরিয়ে এসেছে আক্রমণ করার জন্যে।
'অন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করছে আমাদের!' চিৎকার করে উঠল ডেট। 'এডগারভাই, আপনি চোখে কিছু না দেখলে অ্যাক্সিডেন্ট করে মরব!'
'মরব না,' দৃঢ়কণ্ঠে যেন নিজেকেই অভয় দিল এডগার, আত্মবিশ্বাস জোগাল মনে। 'যত নষ্টামিই করুক না কেন গ্যাসের দানব, মিয়ামিতে আমরা পৌঁছাবই।'
'জিততে আমাদের হবেই!' হাত মুঠো করে ওপর দিকে তুলে শ্লোগান দেয়ার ভঙ্গিতে ঝাঁকাল ডেট।
ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে রবিনও একই ভঙ্গিতে বলল, 'হ্যাঁ, জিততে আমাদের হবেই। গ্যাসের কাছে আত্মসমর্পণ করা চলবে না।' এডের দিকে তাকাল সে। 'কি বলেন, এডগারভাই?'
জবাব দিল না এড। সামনের দিকে দৃষ্টি স্থির।
'এডগারভাই!' গলা চড়াল রবিন। 'সব ঠিক আছে তো?'
'রবিন!' চেঁচিয়ে উঠল ডেট। 'গ্যাসের মধ্যে শ্বাস নিয়েছেন এডগারভাই! আবার গোলমাল হয়ে যায়নি তো মগজে?'
ডেটের কথায় হুঁশ হলো রবিনের। ভাল করে তাকাল এডের দিকে। ওর চোখে দেখতে পেল সেই হলুদ আলোর আভা।
আচমকা চিৎকার করে উঠল এড, 'ঠিক আছে, প্রভু, আপনি যা বলবেন তাই হবে! এখনই ধ্বংস করে দিচ্ছি প্লেনটাকে! ক্র্যাশ ল্যান্ড করাচ্ছি!'
নিচের দিকে নাক নিচু করে ফেলল সে বিমানের। দ্রুত ধেয়ে চলল মাটিতে গুঁতো মেরে নিজেকে চুরমার করে দেয়ার জন্যে।

চোদ্দ

'রবিন! কিছু একটা করো!' চিৎকার করে বলল ডেট। 'মেরে ফেলছে তো!'

কিন্তু কি করবে রবিন? এডগারের সঙ্গে গায়ের জোরে পারার প্রশ্নই ওঠে না। যে ভাবে শক্ত হয়ে হুইলে চেপে বসেছে ওর আঙুলগুলো, ছোটানোর সাধ্য নেই তার। আর পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে মাটিতে গুঁতো খাবে বিমানের নাক। বাঁচাতে হলে এ মুহূর্তে কিছু করা দরকার। এক সাংঘাতিক জরুরী অবস্থা!

জরুরী! মগজে টুং করে ভাবনাটা টোকা দিয়ে গেল যেন রবিনের। প্লেনের মধ্যে জরুরী অবস্থার জন্যে রাখা হয় যে সব জিনিস, তারমধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হলো একটা বিশেষ গ্যাস।

অক্সিজেন!

ঝট করে ওপরে তাকাল সে। আছে! ওই তো, ওর ঠিক মাথার ওপরেই! হাত বাড়িয়ে একটানে খুলে এনে ওটার মুখটা প্রায় চেপে ধরল এডগারের নাকেমুখে। টিপে দিল বোতাম।

শব্দ করে বেরিয়ে এল তাজা অক্সিজেন। ঢুকে গেল এডগারের মুখে। গলা দিয়ে নেমে গেল ফুসফুসে।

ভয়ানকভাবে কেঁপে উঠল ওর দেহ। ঝটকা দিয়ে মুখ সরিয়ে নিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'আর লাগবে না, আর লাগবে না, ঠিক হয়ে গেছি আমি!' হুইলের ওপর আরও শক্ত হয়ে চেপে বসল আঙুলগুলো।

নিচের দিকে তাকাল রবিন। মাত্র আর একশো ফুট দূর আছে মাটি। ঠিক এই সময় সোজা হতে শুরু করল প্লেনের নাক। সাঁ সাঁ করে প্রায় ঝোপঝাড় ছুঁয়ে উড়ে চলল। মাটিতে গোত্তা খেয়ে পড়ল না। আস্তে আস্তে আবার ওপরে উঠতে শুরু করেছে। তারমানে সত্যিই ঠিক হয়ে গেছে এডগার।

'উফ্, বাঁচালে রবিন!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'আরেকটু হলেই গেছিলাম আমরা!'

বিমানের ভেতর গ্যাসটাকে আর দেখা গেল না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ডেট। নিচে, আশেপাশে, সবখানে খুঁজল। অবশেষে ঘোষণা করল, 'কোথাও নেই দানবটা।'

'তারমানে গেছে ওটা। অক্সিজেনের ভয়ে আর কাছে আসবে না আমাদের,' আরামে হেলান দিল রবিন। 'আমার হাঁপানি বাড়লেও আর ভয় নেই। অক্সিজেন তো আছেই।'

*

কিছুক্ষণ পর নিরাপদে মিয়ামিতে অবতরণ করল বিমান।

মাটিতে নেমে আর দেরি করল না এডগার। খুঁজে বের করল কর্তৃপক্ষের এমন একজন বড়কর্তাকে, যিনি বিশ্বাস করলেন তার উদ্ভট গল্প। যদিও করাতে অনেক

কষ্ট হলো।

তারপর অবিশ্বাস্য দ্রুত ঘটতে লাগল সব ঘটনা। যুদ্ধের জন্যে তৈরি হলো স্টেট ট্রুপার, মিলিটারি, হাসপাতালের ইমারজেন্সি টীম। নিজের চোখে দেখছে সব রবিন, বিশ্বাস করতে পারছে না। মনে হচ্ছে ঘরের আলো সব নিভিয়ে দিয়ে টেলিভিশনে হরর ছবি দেখছে।

অনেকগুলো হেলিকপ্টার একযোগে রওনা দিল কিজারভিলে। তাদের সঙ্গে অবশ্যই রবিন, ডেট আর এডগারও চলল। সবার মুখেই বিশেষ ধরনের মুখোশ। যাতে নাক দিয়ে গ্যাস ঢুকে ওদেরকেও রোবট বানিয়ে দিতে না পারে।

নিজেদের খুব কেউকেটা লাগছে রবিন আর ডেটের। মনে হচ্ছে একটা বিশ্বযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে ভয়ঙ্কর শত্রুর হাত হতে বিজয় ছিনিয়ে আনল।

কিজারভিলে. নামল হেলিকপ্টারের বহর। গ্যাস-দানবের রোবট-পুলিশদের আটকে ফেলে কারখানার দখল নিতে দেরি হলো না সেনাবাহিনীর। স্প্রে-গান হাতে কাজে লেগে গেলেন ডাক্তারের দল। কিজারভিলের যাকেই সামনে পেলেন নাকেমুখে স্প্রে করে দিতে লাগলেন অক্সিজেন।

রাত শেষ হওয়ার আগেই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল কিজারভিল। গ্যাসের দানব তৈরি হয়েছিল যে সব রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে, যে মেশিন ওটার উৎস, সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন স্বাভাবিক হয়ে যাওয়া বিজ্ঞানীরা নিজের হাতে। ধ্বংস হয়ে গেল ওটা চিরতরে।

*

পরদিন সকালে কারখানায় যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছেন হিরুচাচা। রবিন জিজ্ঞেস করল, 'চাকরিটা কি এখনও করবেন আপনি?'

'এসেছি যখন কিছুদিন করেই দেখি না। ভাল না লাগলে চলে যাব। তা ছাড়া তোমার শরীর ঠিক না হওয়া পর্যন্তও থাকা দরকার। গ্রীনহিলসে এখন তো শুধু বরফ।'

নতুন গাড়িতে করে কারখানায় চলে গেলেন হিরুচাচা।

নাস্তা খেয়ে দল বেঁধে ডেটদের বাড়িতে চলল কিশোর, মুসা আর রবিন। সেখানে যা খাতির-যত্ন করলেন ওদের ডেটের আম্মা, বহুদিন ভুলতে পারবে না, বিশেষ করে মুসা। কয়েক ধরনের ফ্রুটকেক আর আইসক্রীম খেয়ে ঢেকুর তুলতে লাগল সে।

ওখান থেকে ডেটকে নিয়ে আবার বেরোল। উজ্জ্বল রোদের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে চলল স্কুলের দিকে। সেখানে জটলা করছে ছেলেমেয়েরা। হই-চই, কলরবে মুখর। যা হওয়া স্বাভাবিক।

বারান্দায় নোটিশ বোর্ডের সামনে জটলা করতে দেখল কয়েকজনকে।

ডেট বলল, 'কি ব্যাপার? নতুন কোন নোটিশ আছে নাকি?'

এগিয়ে গেল সে। পেছনে তিন গোয়েন্দা।

উঁকি দিয়ে দেখল ডেট, সত্যি একটা নতুন নোটিশ টানানো হয়েছে বোর্ডে। তাতে লেখা:

এখন থেকে প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে স্কুল চলবে।

সন্ধ্যার পরের বিশেষ মিটিং বন্ধ।

নিচের সইটা দেখে না হেসে পারল না সে। হাত নেড়ে ডাকল তিন গোয়েন্দাকে। ওরা কাছে গেলে নোটিশটা দেখিয়ে বলল, 'দেখো, সইটা কার।'

রবিনও হেসে ফেলল। সই করেছে স্বয়ং থিওডোর কলিন্স।

❀ ❀ ❀

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

'এই, কিশোর, স্কটল্যান্ড যাবি নাকি?' নাস্তার টেবিলে বোম ফাটালেন কিশোরের চাচা রাশেদ পাশা। 'একটা রহস্যের সমাধান করতে? খুব দামী একটা জিনিস তোর চাচীকে পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই ওটা হারিয়ে গেছে।'

কৌতূহলী হয়ে উঠল কিশোর। 'চাচীকে? কি জিনিস? কে পাঠাত?'

'তোর চাচীর এক দূর সম্পর্কের মামী। লর্ডের স্ত্রী। লেডি ওয়াগনার। তোর চাচীকে খুব স্নেহ করেন।'

'কই, কখনও শুনিনি তো তাঁর নাম?'

'শুনবি কি করে?' জবাব দিলেন মেরিচাচী। 'ছোটবেলায় তাঁর কাছে গিয়ে বেড়াতাম। তোর চাচার সঙ্গে বিয়ের পর আর যাইনি।'

কিশোর জানল, লেডি ওয়াগনার ইনভারনেস-শায়ারে থাকেন। কয়েক দিন আগে রাশেদ পাশা আর মেরিচাচীকে চিঠি লিখেছেন। তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ি আর সহায় সম্পত্তি ন্যাশনাল ট্রাস্ট অভ স্কটল্যান্ডকে দান করে দিতে চাইছেন। ন্যাশনাল ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠানটার কাজ পুরানো প্রাসাদ, ধ্বংসাবশেষ বা ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে এমন জায়গা-জমি রক্ষণাবেক্ষণ করা।

'কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনের লিখিত অনুমতি ছাড়া মিসেস ডগলাসের সম্পত্তি হস্তান্তর করা সম্ভব নয়,' জানালেন রাশেদ পাশা। 'লেডি ওয়াগনার আমেরিকায় তাঁর রক্তের সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে লিখিত অনুমতি নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন আমাকে। কেসটার ব্যাপারে আরও খোলাসা করে জানার জন্যে আমাকে একবার স্কটল্যান্ডে যেতে হবে।'

'দামী জিনিস যেটা চাচীকে দিতে চেয়েছিলেন তিনি...' কথা শেষ করতে পারল না কিশোর। বাধা দিল টেলিফোন। ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকাল সে। 'কে?'

'দেখে আয়,' চাচা বললেন।

ফোন করেছে টম, টমাস মার্টিন। তিন গোয়েন্দার বন্ধু। অনেক কেসে ওদেরকে সহায়তা করেছে। দক্ষিণ আমেরিকা সবে সফর করে এসেছে সে। সে-খবরটা জানানোর জন্যেই ফোন করেছে।

'তা চলে এসো না,' খুশি হলো কিশোর। 'রাতে আমাদের এখানেই খেও। খেতে খেতে গল্প করা যাবে। আমার কাছেও কিন্তু একটা চমকে দেয়ার মত খবর আছে। আমি স্কটল্যান্ডে যাচ্ছি।'

'তাই নাকি! হঠাৎ স্কটল্যান্ডে কেন?'

'এসো, সব বলব,' কিশোর বলল।
'আসছি। সাতটার মধ্যে,' ফোন ছেড়ে দিল টম।
ড্রইংরুমে ঢুকল কিশোর। জানাল টম ফোন করেছিল। চাচার দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ, তারপর? জিনিসটা কি যেটা হারিয়ে গেছে?'
হাসলেন রাশেদ পাশা। 'এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু লেখেননি। হয়তো জানানোর প্রয়োজন মনে করেননি। শুধু জানিয়েছেন হারিয়ে গেছে জিনিসটা।'
'বাড়ি থেকে হারিয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।
'জানি না।'
'চুরি হয়ে গেছে?'
'তা-ও জানি না। হতে পারে।'
'এত কথা না বলে চলে যা না, স্কুল তো ছুটিই,' মেরিচাচী বললেন। 'স্কটল্যান্ডও দেখা হবে, মামীর সঙ্গেও দেখা হবে, রহস্যটারও সমাধান করতে পারবি।'
'যাব তো বটেই।' চাচার দিকে তাকাল কিশোর। 'স্কটল্যান্ডের কোনখানে যাবে তুমি?'
'এডিনবার্গ সহ বেশ কয়েক জায়গায়। তবে প্রথমে নিউ ইয়র্ক যাব। লেডি ওয়াগনারের আত্মীয়-স্বজনরা সব ওখানেই থাকেন। সবশেষে যাব লেডি ডগলাসের বাড়িতে।'
'গেলে মজাই হবে বুঝতে পারছি,' উত্তেজনা চাপা দিতে পারল না কিশোর। 'ওখানে আর কখনও গেছ?'
'একবার গিয়েছিলাম,' জানালেন রাশেদ পাশা। 'খুব সুন্দর বাড়ি। ওরকম একটা বাড়ি পেলে ন্যাশনাল ট্রাস্ট খুশিই হবে। কারণ ওয়াগনার হাউসে দেখার মত অনেক কিছু আছে।'
হাতে কাজ আছে। যাবার আগে সেরে রেখে যেতে হবে। সোজা অফিসে গিয়ে ঢুকলেন রাশেদ পাশা। মেরিচাচী চলে গেলেন চুলার কাছে।
মুসা আর রবিনকে ফোন করার কথা ভাবছে কিশোর, এ সময় কলিং বেল বাজল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল সে। 'ও, এসে পড়েছ। এসো।'
হাসিমুখে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে টম। 'হাই,' কিশোরকে দেখে হাসিটা চওড়া হলো তার। 'আমার গাড়িটা গেটের বাইরে। তোমাদেরটার জন্যে ঢোকাতে পারলাম না। গেট আটকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে কেন?'
'চাকা লিক,' কিশোর বলল। 'রোভার বোধহয় ওঅর্কশপে বসে সারাচ্ছে। চাকা লাগিয়ে তারপর ভেতরে ঢোকাবে। থাক তোমার গাড়ি ওটার পেছনে। কিছু হবে না।'
ঘরে ঢুকল টম। লিভিংরুমে বসে গল্প শুরু করল দু'জনে। দক্ষিণ আমেরিকা সফরের গল্প বলতে লাগল টম। শেষে স্কটল্যান্ডের কথা উঠল। টম বলল, 'স্কটল্যান্ডে যখন যাচ্ছই, আরেকটা রহস্যের খবর জানাতে পারি।'
'কি রহস্য? কার কাছে শুনলে?'
'পত্রিকায় পড়লাম। স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ড থেকে নাকি বিপুল পরিমাণে ভেড়া

চুরি হচ্ছে। প্রশাসন শত চেষ্টা করেও চোর ধরতে পারছে না।'

'অ, ওটা। আমিও পড়েছি। যাক, মনে করিয়ে দিয়ে ভালই করেছ। হাতের কাছে রহস্য পেলে ছাড়ে কে।'

'কদ্দিন থাকবে ওখানে?'

'জানি না। চাচা বলেনি আমাকে। চাচা নিজেও হয়তো জানে না ক'দিন থাকা লাগবে।'

'কিন্তু আমার জন্মদিনটা। তোমাদের ছাড়া তো পার্টিই জমবে না।'

'দেখা যাক। দেরি আছে তো। ততদিনে হয়তো ফিরে চলে আসব। রহস্যটার সমাধান করে ফেলতে পারলে আমরা তিনজন অন্তত থাকব না, আমি, রবিন আর মুসা। কথা দিলাম, যাও। চাচা থাকে থাকুকগে।'

খুশি হলো টম। পকেট থেকে ছোট একটা প্যাকেট বের করে বাড়িয়ে দিল। 'তোমার জন্যে। দক্ষিণ আমেরিকার স্যুভনির।'

প্যাকেটটা খুলল কিশোর। কাঠের তৈরি চমৎকার একটা জাগুয়ারের মূর্তি। চোখে পাথর বসানো। এত নিখুঁত রঙ করা, জীবন্ত মনে হয়।

'দারুণ তো!' প্রশংসা না করে পারল না কিশোর। 'থ্যাংক ইউ।'

'যেখান থেকে কিনেছি, দোকানদার বলল জাগুয়ারের এই মূর্তি নাকি সৌভাগ্যের প্রতীক। যার কাছে থাকবে তার ভাল ছাড়া খারাপ হবে না।'

'কেমন সৌভাগ্য বয়ে আনে, স্কটল্যান্ড গেলেই বুঝতে পারব,' হাসল কিশোর। 'দু'দুটো রহস্য সামাধানের জন্যে সত্যিই ভাগ্যের সহায়তার প্রয়োজন হবে আমার।'

খাবার টেবিলে দিয়ে ডাক দিলেন মেরিচাচী। খাওয়া প্রায় শেষ, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। ফোন ধরল কিশোর। ওধার থেকে মুসার উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল, 'কিশোর? কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ দেব! তোমার জন্যে একটা পুরস্কার জিতলাম।'

'আমার জন্যে মানে? কিছুই তো বুঝতে পারছি না,' কিশোর বলল।

'ফটোগ্রাফি ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকার ফটো প্রতিযোগিতায় তোমার একটা ছবি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম,' মুসা বলল। 'তোমাকে জানাইনি। ভেবেছিলাম জিতলে চমকে দেব।'

'সত্যিই চমকে দিলে! করেছ কি।'

'খারাপটা কি করলাম? সেদিন তুমি মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পায়ের ছাপ পরীক্ষা করার সময় যে একটা ছবি তুলেছিলাম মনে আছে? সেটাই পাঠিয়েছিলাম পত্রিকায়। সাংঘাতিক জিতা জিতেছি। একেবারে প্রথম পুরস্কার। ভ্রমণ পুরস্কার, পৃথিবীর যে কোন দেশে যাবার খরচ জোগাবে আমাকে ওরা। সঙ্গী হিসেবে একজনকে নেয়া যাবে। তোমার জন্যেই পুরস্কার জিতেছি। ঠিক করেছি যেখানেই যাই তোমাকে নিয়ে যাব,' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলল মুসা।

কিন্তু প্রিয় বন্ধুর পুরস্কার জেতার খবরে খুশি হতে পারল না কিশোর। ধপ করে ফোনের পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। পাবলিসিটি মোটেও পছন্দ করে না

সে। আর মুসার পুরস্কার জেতার কারণে এখন পাবলিসিটির হাঙ্গামা পোহাতে হবে তাকে। মহা উৎসাহে আবার শুরু করল মুসা। 'সারা পৃথিবীতে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়বে, কিশোর। খবরের কাগজে আর পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হবে তোমার নাম।'

হতাশ বোধ করছে কিশোর। স্কটল্যান্ডে গিয়ে গোপনে রহস্য ভেদ করা আর বুঝি হলো না। 'আমাকে হয়তো ছদ্মবেশ নিয়েই যেতে হবে,' মনে মনে ভাবল ও।

অনেকক্ষণ কিশোরের সাড়া না পেয়ে প্রশ্ন করল মুসা, 'কি হয়েছে কিশোর? তুমি আছো তো লাইনে...,'

হঠাৎ রাস্তায় তীব্র একটা সংঘর্ষের শব্দ হলো। বাড়ির ঠিক বাইরে থেকে আওয়াজটা এসেছে।

'মুসা, একটু ধরো,' বলে টেবিলে ফোন রেখে হলঘরের দিকে ছুটল কিশোর।

দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল কিশোর আর টম। ভয়ানক একটা দৃশ্য দেখতে পেল। পুরানো, পাঁচটনি একটা ট্রাক গুঁতো মেরে দুমড়ে দিয়েছে ইয়ার্ডের গাড়িটাকে, যেটার চাকা লিক হয়েছিল। ওটার পেছনে ছিল টমের গাড়ি। ওটাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ট্রাকটার ড্রাইভারের জন্যে চারপাশে তাকাতে শুরু করল কিশোর।

দুই

ইয়ার্ডের ভর্তা হয়ে যাওয়া গাড়িটার সামনে এসে এক সেকেন্ডের জন্যে চোখ বুজে ফেলল কিশোর। ভীষণ কষ্ট লাগছে তার। গাড়িটা ভাল ছিল। সে নিজেও চালিয়েছে বহুবার। ভয় পাচ্ছে নিদারুণ আরও কি দৃশ্য দেখতে হয় ভেবে। ট্রাক ড্রাইভারের জখম হওয়ার কথাই ভাবছে সে।

টম উঁকি দিল ট্রাকের মধ্যে। অবাক গলায় বলল, 'আরে কেউ তো নেই ভেতরে।'

কিশোর লক্ষ করল ট্রাকের দরজা খোলা। ড্রাইভার ঝাঁকির চোটে দরজা দিয়ে ছিটকে পড়ে যেতে পারে। দ্রুত একবার রাস্তায় চক্কর মেরে এল কিশোর। কিন্তু কাউকে চোখে পড়ল না।

'টম, কাউকে পালিয়ে যেতে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল টম। দেখেনি।

ভাঙাচোরা গাড়ি আর ট্রাক আবার পরীক্ষা করে দেখল ওরা। নাহ্। দোমড়ানো ধাতবখণ্ডের মাঝে কেউ চাপা পড়ে নেই।

'আমার ধারণা, কিশোর বলল, 'গুঁতো মেরেই দরজা খুলে পালিয়েছে ড্রাইভার। ট্রাকের তেমন কিছুই হয়নি দেখছ না।'

দাঁতে দাঁত ঘষল টম। 'ইচ্ছে করেই অ্যাক্সিডেন্টটা করেছে।'

'কিন্তু কেন করল?' কিশোরের প্রশ্ন।

'তা কে জানে!' ট্রাকের পিছন দিকটা দেখে এল টম। 'লাইসেন্স প্লেট নেই। তারমানে চুরি করে এনেছিল ট্রাকটা। প্লেট খুলে ফেলে দিয়েছে।'

'ইঞ্জিন নম্বরটা দেখবে?' অনুরোধ করল কিশোর। 'নম্বর দেখে হয়তো ধরতে পারব ওকে। তুমি দাঁড়াও। আমি টর্চ নিয়ে আসি।'

একটু পরে প্রতিবেশীরা ভিড় জমাতে শুরু করল। ইয়ার্ডের গাড়ির ওপর ট্রাক চড়াও হতে দেখে তারা সবাই স্তম্ভিত। রাশেদ পাশাও বেরিয়ে এলেন।

কিশোর আর টম ইঞ্জিন নম্বর খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে। নম্বরটার সন্ধান মিললেও সংখ্যাগুলো চেনা গেল না। সুকৌশলে কেউ আঁচড়ে তুলে ফেলেছে, পড়া যায় না।

'এখন পরিষ্কার, অ্যাক্সিডেন্টটা কেউ ইচ্ছে করেই করেছে,' কিশোর বলল ওর চাচাকে। 'কিন্তু এ কাজ কে এবং কেন করবে মাথায় ঢুকছে না আমার।'

কপালে ভাঁজ পড়ল রাশেদ পাশার, 'ঘটনা যেই ঘটাক তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার নয় আমার কাছেও। তবে তোকে বা টমকে আহত করতে চায়নি সে। তাই খালি গাড়িটাকে চাপা দিয়ে পালিয়েছে।'

মেরিচাচী পুলিশে খবর দিলেন। প্রতিবেশীরা টমের গাড়িটা পরীক্ষা করে দেখল। খুব বেশি ক্ষতি হয়নি টমের গাড়ির। হেড লাইট দুটো ভেঙেছে আর ফেন্ডার বেঁকে গেছে।

ট্রাক ড্রাইভার এবং তার মালিকের পরিচয়ের খোঁজে বৃথাই অনুসন্ধান চালানো হলো। ট্রাকের কোথাও তার নাম লেখা নেই, কোন কাগজপত্রও চোখে পড়ল না।

'ট্রাকের ভেতরটা দেখেছিস?' জিজ্ঞেস করলেন রাশেদ পাশা।

'না। দেখিনি,' জবাব দিল কিশোর।

টর্চ নিয়ে ট্রাকের পেছনে উঠে এল সে। মেঝেতে বা সাইডগুলোতে কিছু নেই। যে বা যারাই কাণ্ডটা ঘটিয়ে থাকুক, সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলেছে আগেভাগে।

একটু পরেই এল পুলিশের গাড়ি, সেই সঙ্গে দুটো রেকার। কিশোরের ভাঙা গাড়ি আর ট্রাকের ছবি তুলল পুলিশ, একজন ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্ট হুইল এবং দরজার হাতল পরীক্ষা করে দেখল। ওগুলোতে অনেকের আঙুলের ছাপ রয়েছে।

একজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে কিশোরদের কাছে দাঁড়াল। জানতে চাইল অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করে কিনা ওরা।

'কে কাজটা করতে পারে সে-ব্যাপারে কোন ধারণা নেই আমাদের,' জবাব দিলেন রাশেদ পাশা।

রেকার দুটো কিশোরের গাড়ি আর ট্রাক টেনে নিয়ে চলে গেল। টম টর্চ জ্বেলে ওর গাড়ির দশা দেখল। বলল, 'গ্যারেজে নিতে হবে গাড়িটাকে। হেড লাইট লাগাতে হবে,' গাড়িতে চড়ে বসল ও। 'কিশোর, পুলিশ এই অ্যাক্সিডেন্ট রহস্যের সমাধান করতে না পারলে আমি চেষ্টা করে দেখব একবার?'

'দেখতে পারো,' কিশোর বলল।

'পুলিশ কোনও খোঁজ পেল কিনা জানাতে কাল ফোন করব তোমাকে,' গাড়িতে স্টার্ট দিল টম। চলে গেল। পড়শীরাও একে একে ফিরে গেল যে যার বাড়িতে।

কিশোরকে নিয়ে তার চাচা ঘরে ঢুকলেন। ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করছেন, হঠাৎ লাফিয়ে উঠল কিশোর, 'মুসা! আরে ওতো ফোন ধরে আছে।'

কিশোর ভেবেছিল দেরি দেখে হয়তো ফোন ছেড়ে দিয়েছে মুসা। ছাড়েনি। অভিযোগের সুরে বলল, 'কি ব্যাপার? অনন্তকাল ধরে ফোন ধরে আছি! হাত ব্যথা হয়ে গেছে।'

'সরি, ভুলেই গিয়েছিলাম তোমার কথা। কেন ভুলেছি, বললেই বুঝতে পারবে।'

সমস্ত ঘটনা মুসাকে খুলে বলল কিশোর।

শুনে আঁতকে উঠল মুসা। 'কি ভয়ঙ্কর লোক! ধরতে পারবে তো পুলিশ?'

'জানি না,' কিশোর বলল। 'থাকগে, বাদ দাও ওদের কথা। তোমার কথা বলো। কোথায় যেন যাবার কথা বলছিলে?'

মুসা আবার বলল পুরস্কার জেতার কথা। যে কোন একজন সঙ্গী নিয়ে ইউরোপের যে কোনও দেশে বেড়াতে যাওয়ার খরচ পাবে সে।

'রবিনকে নিয়ে যাও না,' পরামর্শ দিল কিশোর। 'আমি চাচার সঙ্গে স্কটল্যান্ডে যাচ্ছি। জোড়া রহস্যের সমাধান করতে। কিংবা আরেক কাজ করতে পারো। দু'জনের খরচ যখন পাবেই, তোমরাও চলো আমাদের সঙ্গে। তাহলে খুব মজা হবে।'

'বলছ যেতে?'

'বলছি।'

'ঠিক আছে,' খুশি হলো মুসা। 'আমি এখুনি ফোন করছি রবিনকে। দেখি ও যেতে রাজি হয় কিনা।'

দশ মিনিট পরে আবার কিশোরকে ফোন করল মুসা। 'রবিন যেতে রাজি হয়েছে। বলল একসঙ্গে তিনজনে গেলে মজাই হবে। কবে যাবে তোমরা? রাশেদ আঙ্কেল কি রিজার্ভেশন করতে পারবেন আমাদের জন্যে?'

চাচাকে জিজ্ঞেস করতে গেল কিশোর।

'তিন দিন পরে রওনা হব আমরা,' জানালেন রাশেদ পাশা। 'ওদের বলো রিজার্ভেশনের কোন সমস্যা হবে না।'

কিশোর খবরটা দিল মুসাকে।

মুসা মহাখুশি। বলল, 'তিন দিন পরে? খুব তাড়াহুড়ো হয়ে যায় অবশ্য। তবে পাসপোর্ট রেডি আছে। যেতে পারব।'

পরদিন সকাল। রাশেদ পাশা বেরিয়ে গেছেন তাঁর কাজে। নাস্তা সেরে সবে উঠেছে কিশোর, এমন সময় পোস্টম্যান এল চিঠি নিয়ে। একটা প্যাকেট দিয়ে চলে গেল সে।

খামের ওপর প্রেরকের নাম-ঠিকানা লেখা নেই। কৌতূহলী হয়ে খামটা খুলল কিশোর। ভেতরে একটা চিরকুট। পড়তে পড়তে মুখ গম্ভীর হয়ে গেল তার। মেরিচাচী পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। 'কি রে, খারাপ কিছু নাকি?'

'হ্যাঁ। হুমকি দিয়েছে আমাকে।'

'মানে!' ভুরু কুঁচকে গেল চাচীর। কিশোরের কাছ থেকে কাগজের টুকরোটা.

নিয়ে জোরে জোরে পড়লেন, 'তোমাদের গাড়িটা ভর্তা করে দেয়ার মত অ্যাক্সিডেন্ট আরও ঘটাব। এটা কেবল শুরু।'

চিঠির নিচে কোন দস্তখত নেই।

টিপেটুপে দেখল কিশোর। খামের মধ্যে আরও কিছু আছে। হাত ঢুকিয়ে চৌকোনা, পশমী এক টুকরো কাপড় বের করে আনল। 'এটা ওয়াগনারদের কাপড়,' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

'মানে!' অবাক হলেন মেরিচাচী।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে কিছু ভাবল কিশোর। তারপর বলল, 'আমার ধারণা, যে এই চিঠিটা লিখেছে সে চাইছে না আমি স্কটল্যান্ডে যাই। গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের সাথে আমার আসন্ন স্কটল্যান্ড যাত্রার একটা সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। হারানো জিনিসটার ব্যাপারটা এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। যে এ চিঠি লিখেছে সে-ই বোধহয় জিনিসটাও চুরি করেছে। এবং সে চায় না আমি ওটা খুঁজে বের করি।'

'কিন্তু খামে তো রকি বীচের ডাকঘরের চিহ্ন,' মেরিচাচী বললেন।

কপালে ভাঁজ পড়ল কিশোরের। চিন্তিত গলায় বলল, 'হয়তো মূল্যবান জিনিসটা এখানেই পাচার করে দেয়া হয়েছে। যাকগে আমি চিঠিটা পুলিশকে দেব।'

কিশোর বেনামী চিঠিটা পুলিশকে দিয়ে এল। পুলিশ এখনও ট্রাক ড্রাইভারের হদিস বের করতে পারেনি।

বাজারে গিয়ে কিছু কেনাকাটা করল কিশোর। বাজার থেকে এসে গাড়ি মেকানিকের সঙ্গে কথা বলল। অটোমোবাইল ইনস্যুরেন্স কোম্পানির এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করল। মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও গাড়িটা মেরামত করা যাবে শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সময় লাগবে মেরামত করতে। তা লাগুক। আপাতত কোন তাড়াহুড়া নেই ওর।

সেদিন সন্ধ্যায় কিশোর আর মেরিচাচী বেরোলেন খানিক হাঁটাহাঁটি করে আসতে, সঙ্গে একটা কুকুর। ওটাকে জোগাড় করে এনেছেন রাশেদ পাশা। পুরানো বাড়িতে পুরানো মাল কিনতে গিয়ে বেওয়ারিশ একটা খুদে টেরিয়ার কুকুরকে অসহায় হয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখে বাড়ি নিয়ে এসেছেন। কুকুরটার নাম রেখেছেন ডোরা। ডোরাকে নিয়ে সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছে কিশোর আর মেরিচাচী, রাশেদ পাশা তাঁর অফিসে হিসেব দেখছেন।

ঘণ্টাখানেক ডোরাকে নিয়ে দৌড়াল কিশোর আর মেরিচাচী। হাঁপিয়ে গেছে দু'জনই। ডোরাকে নিয়ে বাড়ির পথ ধরল। ড্রাইভওয়ের কাছাকাছি এসেছে, দেখল একটা লোক ওদের বাড়ির সামনে থেকে চোরের মত বেরিয়ে আসছে। মোড় ঘুরে পিছন দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিশোর ডোরাকে নিয়ে ছুটল লোকটাকে ধরতে। কিন্তু বাড়ির পেছনের উঠোনে এসে দেখল নেই লোকটা। চলে গেছে।

মেরিচাচী মন্তব্য করলেন, 'ব্যাটার ভাবগতিক কিন্তু সুবিধের মনে হয়নি আমার।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল কিশোর। 'লোকটা কি উদ্দেশে এসেছিল জানা দরকার।'

ডোরাকে বাসায় রেখে হলঘরের টেবিল থেকে টর্চ নিয়ে এল কিশোর। আলো জ্বেলে দেখল সিঁড়ি থেকে সামনের বারান্দা পর্যন্ত হালকা, কাদামাখা পায়ের ছাপ চলে গেছে। ছাপগুলো লক্ষ্য করে পা বাড়িয়েছে কিশোর, চেঁচিয়ে উঠলেন মেরিচাচী। 'আমাদের চিঠির বাক্সে কি যেন টিকটিক শব্দ করছে!'

চট করে ঘুরল কিশোর, তাকাল সদর দরজার হুকের সঙ্গে আটকানো লোহার ডাকবাক্সের দিকে। মুখ থেকে রক্ত সরে গেল তার।

'বোমা!' আঁতকে উঠল কিশোর।

তিন

হুক থেকে ডাকবাক্সটা খুলে আনতে পা বাড়িয়েছে কিশোর, বাধা দিলেন মেরিচাচী। 'ছুঁসনে, ছুঁসনে, খবরদার!'

'টিকটিক শব্দ সবে শুরু হয়েছে,' কিশোর বলল। 'এখুনি ফাটবে না নিশ্চয়।' একটানে হুক থেকে ডাকবাক্সটা ছুটিয়ে আনল সে। তারপর ছুঁড়ে মারল বাগানের দিকে। দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল দু'জনে। বোমাটা বিস্ফোরিত হবার অপেক্ষা করছে। পাঁচ বার টিকটিক শব্দ হয়েছে। ছয়-সাত-আট-নয়...

বুম!

বিস্ফোরণের চোটে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বাক্সটা, মাটিতে তৈরি করল গভীর গর্ত। মাটি আর পাথর ছিটকে গেল চতুর্দিকে।

বিস্ফোরণের শব্দে দৌড়ে এলেন রাশেদ পাশা। 'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

কাঁপতে কাঁপতে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন মেরিচাচী। ভীষণ ভয় পেয়েছেন। কিশোরই ব্যাখ্যা করল ঘটনাটা।

সব শুনে অদৃশ্য হামলাকারীর ওপর খুব রাগ হলো রাশেদ পাশার। 'তোরা আরেকটু হলে মারা যেতে পারতিস। নাহ্ আর সহ্য করা যায় না। এ সবের হোতাটাকে খুঁজে বের করতেই হবে।'

পুলিশে ফোন করার জন্যে ঘরে ঢুকলেন রাশেদ পাশা। কিশোর বাগানে গেল। তার অনুসন্ধানী চোখ আটকে গেল কতগুলো টুকরো কাগজের ওপর। ডাকবাক্সে চিঠি থাকার কথা নয়। কারণ বিকেলেই ওগুলো বের করে নেয়া হয়েছে। তাহলে এ কাগজগুলো এল কোত্থেকে? টুকরোগুলো একত্র করল কিশোর। মেরিচাচীকে দেখিয়ে বলল, 'এটা চিঠি হতে পারে। কিন্তু চিঠিটা রেখে গেল কে? তোমার কি মনে হয়, চাচী?

ভুরু কুঁচকে গেল মেরিচাচীর। 'আজ ডিনারের ঠিক আগে আগে কলিংবেল বেজে উঠেছিল। আমি দরজা খুলে দেখি কেউ নেই। তোর কি মনে হয় এ চিঠিটা

ওই লোকই আমাদের ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে কেটে পড়েছে?'

'হতে পারে,' কিশোর বলল। ছেঁড়া কাগজগুলো নিয়ে ঘরে ঢুকল ও, ডাইনিং রুমের টেবিলের ওপর সাজাল টুকরোগুলো। কয়েকটা শব্দ নেই, তবু মোটামুটি একটা অর্থ দাঁড় করাতে পারল কিশোর। লেখাটা বোধহয় ছিল: সাবধান হও কিশোর পাশা। নইলে পেইশা তোমাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে।

চোখ বড় বড় করে লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকল কিশোর। কে পাঠিয়েছে এটা? আর পেইশাটাই বা কে? মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল সে।

রাশেদ পাশা মেরিচাচীকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। জানালেন দু'জন পুলিশ এসেছে। হামলাকারীর ফুটপ্রিন্ট সংগ্রহ করছে। তাদেরকে ছেঁড়া মেসেজটা দেখাল কিশোর।

মেরিচাচী দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, 'তোরা স্কটল্যান্ড যাচ্ছিস ভালই হচ্ছে। এ জায়গা আপাতত তোদের জন্যে নিরাপদ নয়।'

কিশোর বলল, 'আমার অজানা একজন শত্রু যেমন আছে তেমনি একজন অচেনা বন্ধুও আছে। এ চিঠিটা সেই বন্ধুই লিখেছে। আমাকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিল। হাতের লেখাটা লক্ষ করো। মেয়েদের হাতের লেখার মত লাগছে না?'

'তা লাগছে,' সায় দিলেন রাশেদ পাশা। 'তবে তোর অজানা শত্রু আড়ালে থেকে চোরাগোপ্তা হামলা চালাতেই ভালবাসে। আবার কখন আক্রমণ করে বসে কে জানে।'

ওরা কথা বলছে, বেজে উঠল সদর দরজার কলিংবেল। রকি বীচ পুলিশ ফোর্সের চীফ ক্যাপ্টেন ইয়াং ফ্লেচার এসেছেন।

ডাইনিং রুমে চলে এলেন ক্যাপ্টেন। কুশল বিনিময়ের পরে বললেন, 'পুরো ঘটনাটা প্রথম থেকে শুনতে চাই আমি। শুরু করো, কিশোর।'

ঘটনাটা ওকে খুলে কিশোর বলল, চিঠিটাও দেখাল।

শিস দিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন, 'কিশোর, দেখো তো আঠা দিয়ে জোড়া দিতে পারো নাকি।'

কিশোর কার্ডবোর্ডের ওপর আঠা দিয়ে ছেঁড়া কাগজগুলো লাগাল। কাজটা কঠিন এবং ক্লান্তিকর। এদিকে পুলিশের লোকজন বাড়ির বাইরে অনুসন্ধানের কাজ শেষ করে রিপোর্ট দিল চীফকে। তারপর চলে গেল তারা।

কিশোর অদ্ভুত চিঠির রহস্য খুঁজে বের করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সে লেখাটা একটা ট্রেসিং পেপারে তুলল।

ক্যাপ্টেন বললেন, 'শুনলাম তুমি স্কটল্যান্ডে বেড়াতে যাচ্ছ। এ চিঠির লেখকের পরিচয় বের করতে চাইলে আরও তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে।

মুচকি হাসল কিশোর। 'দেখা যাক পারি কি না। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

পরদিন সকালে কিশোর তার চাচাকে বলল সে কয়েকজন দোকানীর সঙ্গে কথা বলবে। কোন স্কটিশ খদ্দেরকে তারা দেখেছে কিনা জানা দরকার। 'স্কটিশ কেউ এ ধরনের পশমী কাপড় পাঠিয়ে দিতে পারে,' বলল সে।

'দেখ চেষ্টা করে,' রাশেদ পাশা বললেন।

বেশ কয়েকটা দোকানে খোঁজ নিল কিশোর। ইতিবাচক জবাব পেল না কোনখান থেকে। মেইন স্ট্রীট ধরে হাঁটছে কিশোর, চোখ আটকে গেল একটা ফটো তোলার দোকানের ওপর। দোকানের কাঁচের গায়ে সাঁটা একটা ছবি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ছবিটা ওর নিজের।

দোকানের সামনে চলে এল কিশোর। দোকানের ডিসপ্লেতে ঝুলছে ফটোগ্রাফি ইন্টারন্যাশনাল-এর একটা কপি। প্রচ্ছদে কিশোরকে দেখা যাচ্ছে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে কিছু পরীক্ষা করছে। কখন যে ওকে ঘিরে ভিড় জমে উঠেছে খেয়াল করেনি কিশোর। ছবিটা থেকে মুখ ফেরাল সে। যাবার জন্যে ঘুরল। এমন সময় ভিড় থেকে হর্ষধ্বনি উঠল, তালি বাজাতে শুরু করেছে জনতা। তালির শব্দ শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠল পথচারীরা। ঘটনা কি দেখার জন্যে তারাও ভিড় জমাল দোকানের সামনে।

'তুমি...তুমি সত্যি কিশোর পাশা!' ভিড় থেকে রিনরিনে কণ্ঠে জানতে চাইল একটা বাচ্চা মেয়ে। 'আমি তোমার ভীষণ ভক্ত!'

'তুমিই সেই দুর্দান্ত কিশোর গোয়েন্দা, তাই না!' চেঁচিয়ে উঠল আরেক কিশোরী। 'জটিল জটিল রহস্যের সমাধান করে ফেলেছ, পুলিশ যেগুলোর কিনারা করতে পারেনি। তুমি একটা জিনিয়াস!'

হঠাৎ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল একটা ছেলে। অনুরোধ করল, 'আমাকে একটা অটোগ্রাফ দেবে, প্লীজ!' ছেলেটার পরনে শতছিন্ন পোশাক। বোঝাই যায় খুব গরীব। বড় বড় নীল চোখে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে, খুব মায়া হলো কিশোরের। ছেলেটার বাড়িয়ে দেয়া কাগজে নিজের নাম সই করে দিল সে।

'অনেক ধন্যবাদ,' হাসল ছেলেটা, পরক্ষণে মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে।

দৌড়ে এল সেই বাচ্চা মেয়েটা। 'ইস্, কেন যে আজ কাগজ-কলম নিয়ে বেরোলাম না!'

হাসল কিশোর। হাতব্যাগ খুলে ছোট একটা নোট বই বের করল। একটা পৃষ্ঠায় নিজের নাম সই করে কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে দিল।

বাচ্চাটাকে অটোগ্রাফ দেয়ার পরে মুশকিলেই পড়ে গেল কিশোর। সবাই এখন অটোগ্রাফ চাইছে। বাচ্চাদের অটোগ্রাফ দিল ও হাসিমুখে, কিন্তু বড়দের এগিয়ে আসতে দেখে বাধা দিল হাত তুলে।

'দুঃখিত,' বিনীত স্বরে কিশোর বলল। 'আমি শুধু বাচ্চাদের অটোগ্রাফ দেব।'

কথা বলতে বলতে লক্ষ করল কিশোর ছেঁড়া পোশাক পরা ছেলেটা এখনও যায়নি। দাঁড়িয়ে আছে ভিড়ের পেছনে। বিরক্ত হয়ে দেখল ওর অটোগ্রাফটা একটা লোককে দিয়ে দিচ্ছে ছেলেটা। বিনিময়ে লোকটা তাকে টাকা দিল।

'কি বুদ্ধি!' মনে মনে ভাবল কিশোর। জোর গলায় লোকটাকে ডাকল 'এই যে, মিস্টার। আগেই বলেছি আমি শুধু বাচ্চাদের অটোগ্রাফ দেব। ওই কাগজটা আমাকে দিয়ে দিন।'

জবাবে মুখ বাঁকিয়ে হাসল লোকটা। 'ধন্যবাদ, খোকা। তোমার অটোগ্রাফ আমার খুব কাজে লাগবে,' বলে হনহন করে রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করে দিল সে।

খুব রাগ হলো কিশোরের। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিল ওকে। মনে হচ্ছে

লোকটার মতলব ভাল নয়। অটোগ্রাফটা তাকে ফেরত পেতেই হবে।

লোকজনকে ধাক্কা মেরে, ভিড় ঠেলে এগোল কিশোর। দৌড় দিল। লোকটা ওকে পিছু নিতে দেখে চট করে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিশোর গলি মুখে এসে দেখল নেই লোকটা। হতাশ হয়ে ফিরে চলল ও।

মেইন স্ট্রীটে এসে হাঁপ ছাড়ল কিশোর। চলে গেছে অটোগ্রাফ শিকারীরা। শুধু ছেঁড়া পোশাক পরা ছেলেটা আছে যে একটু আগে পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে তার অটোগ্রাফ।

কিশোরকে দেখে ছেলেটা আবার দৌড়ে এল। 'আরেকটা অটোগ্রাফ দেবে, প্লীজ?'

গরীব বলে ছেলেটার জন্যে মায়া হয়েছিল কিশোরের, এখন মুণ্ডু চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে করছে। কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল, 'বিক্রি করার জন্যে?'

থতমত খেয়ে গেল ছেলেটা। আমতা-আমতা করে বলল, 'ন্-না। এবার সত্যিই আমার জন্যে।'

'যার কাছে আমার অটোগ্রাফ বিক্রি করেছ কে লোকটা?'

কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল ছেলেটার চেহারা। 'আ-আমি জানি না। বিশ্বাস করো। তুমি যখন বললে বড়দেরকে অটোগ্রাফ দেবে না ওই সময় লোকটা তোমার অটোগ্রাফ কেনার জন্যে আমাকে দশ ডলার দিতে চাইল। আমি লোভ সামলাতে পারিনি। আমার মা খুব অসুস্থ। আমি···,' ফোঁপাতে শুরু করল সে।

ছেলেটার কাঁধ চেপে ধরেছিল কিশোর শক্ত হাতে। ও সত্য কথা বলছে বুঝতে পেরে ছেড়ে দিল। পার্স থেকে নোট বই বের করল। 'তোমাকে আমার অটোগ্রাফ দিয়েছি। এবার তুমি আমাকে দেবে। তোমার নাম ঠিকানা লিখে দাও এখানে।'

ছেলেটা আনন্দের সঙ্গে করল কাজটা। নোট বইটা ওর হাত থেকে নিয়ে কিশোর বলল, 'কিটি রোভার, আমি একদিন তোমাদের বাসায় যাব। দেখব সত্যি কথা বলেছ কিনা। তখন আরেকটা অটোগ্রাফ দেব,' ছেলেটার কাঁধ চাপড়ে দিল ও হাসিমুখে। 'ঠিক আছে?'

জবাবে হাসল ছেলেটাও। 'সরি!' বলে চলে গেল সে।

কিশোর একবার ভাবল পিছু নেবে ছেলেটার। সন্দেহ হচ্ছে ছেলেটা ওই অটোগ্রাফ ক্রেতার পরিচয় জানে। ওর মনে নানা প্রশ্ন জাগছে। কিশোরের সই জোগাড়ের জন্যে এত অস্থির হয়ে উঠেছিল কেন লোকটা? জালটাল করে কোন কিছুতে ব্যবহার করবে না তো?

ছেলেটার গমন পথের দিকে তাকিয়ে আনমনে এ সব কথা ভাবছিল কিশোর। মনে মনে বলল, ছেলেটা হয়তো সত্যি কথাই বলেছে। তবু টমকে ওর বাসায় পাঠাব সত্যতা যাচাই করতে।

যে লোকটা কিশোরের অটোগ্রাফ কিনে নিয়েছে সে মাঝারি উচ্চতার, রোগা, কালো চুল, লালচে গাল। কিশোরের সন্দেহ হলো ওই লোকটাই তার বাসায় বোমা রেখে গিয়েছিল কিনা। হয়তো ও-ই ওদের গাড়িটা নষ্ট করার জন্যে দায়ী। কিশোর ঠিক করল লোকটাকে খুঁজে বের করবে।

কিন্তু বৃথা খোঁজাখুঁজি চলল। ক্লান্ত হয়ে শেষে ওর চেনা এক ড্রাগ স্টোরে ঢুকল কিশোর। ওষুধের দোকানটার মালিক মিস্টার টনি। এখান থেকে বেশির ভাগ ওষুধপত্র কেনে কিশোর।

কিশোরকে দেখে হাসলেন আমুদে স্বভাবের মিস্টার টনি। 'কি ব্যাপার, কিশোর? কোন রহস্যের বেড়াজালে হাবুডুব খেতে গিয়ে মাথা ধরেছে? অ্যাসপিরিন দেব?'

মুচকি হাসল কিশোর। 'নতুন একটা রহস্যের বেড়াজালে হাবুডুবু খাচ্ছি ঠিকই, তবে অ্যাসপিরিনের দরকার নেই। আপনার কাছে এসেছি কিছু তথ্য পাবার আশায়।'

'তুমি যেহেতু আমার অনেক দিনের খদ্দের কাজেই তোমাকে ফ্রী তথ্য দিতে আপত্তি নেই আমার,' হাসিটা মুখে ধরে রেখেছেন মিস্টার টনি।

ওর অটোগ্রাফ কিনে নিয়েছে যে লোকটা তার বর্ণনা দিল কিশোর। জানাল লোকটাকে খুঁজছে সে।

মিস্টার টনি বললেন, 'মনে হয় কিছু সাহায্য করতে পারব তোমাকে। মাঝে মাঝে ফোন করতে আসে আমার দোকানে। লোকটার ডাক নাম সম্ভবত কিম। পুরো নাম জানি না। আজও লোকটা ফোন করতে এসেছিল। তাড়াহুড়োর চোটে বুদের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। বলতে শুনলাম সব ঠিকঠাকমত চলছে। ছেলেটার অটোগ্রাফ জোগাড় করে ফেলেছি আমি।'

তথ্য পেয়ে খুশি হলো কিশোর। তবে চেহারায় ভাবটা ফুটতে দিল না। মিস্টার টনিকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল ড্রাগ স্টোর থেকে।

সোজা পুলিশ হেডকোয়ার্টারে চলে এল কিশোর। ক্যাপ্টেন ফ্লেচারকে খুলে বলল একটু আগের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। মনোযোগ দিয়ে কিশোরের কথা শুনলেন পুলিশ চীফ। 'তুমি এসেছ খুব ভাল হয়েছে, কিশোর। আমি এখুনি লোক লাগিয়ে দিচ্ছি ওই কিম ব্যাটাকে খুঁজে বের করার জন্যে। তবে তুমি স্কটল্যান্ড যাবার আগে ওকে ধরতে পারব কিনা কথা দিতে পারছি না।

হাসল কিশোর। 'লোকটাকে ধরতে পারলেই হলো, যখনই হোক। আমার ধারণা এ সব রহস্যময় ঘটনার সঙ্গে সে জড়িত। ওকে ধরতে পারলে বা কোন খবর পেলে আমাকে জানাবেন।'

গ্লাসগো আর এডিনবার্গের কোন্ হোটেলে ওরা উঠবে সেগুলোর নাম ঠিকানা লিখে দিল কিশোর চীফকে। লেডি ওয়াগনারের ঠিকানা লিখতেও ভুলল না।

বাড়ি ফিরে এল কিশোর। মেরিচাচী জানাল ফোন করেছিল টম। বিদায় জানাতে আসবে কিশোরকে। তাকে ডিনারে আসতে বলে দিয়েছেন তিনি।

'ভাল করেছ,' বলে নিজের ঘরে ঢুকল কিশোর। মালপত্র এখনও সব গোছগাছ শেষ হয়নি।

টম এল ছ'টার দিকে। বলল, 'তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম না তো? তোমাকে একটা জিনিস দেখানোর জন্যে তর সইছিল না। এই দেখো।'

একটা দৈনিক কপি দিল সে কিশোরকে। পত্রিকার প্রথম পাতায় চোখ বুলিয়ে চমকে উঠল কিশোর। ওতে বড় বড় অক্ষরে লেখা : অটোগ্রাফ শিকারীদের কবলে

পড়ে নাস্তানাবুদ দুর্ধর্ষ কিশোর গোয়েন্দা।

হেডিং-এর নিচে কিশোরের ছবি। সেই রহস্যময় লোকটাকে ধাওয়া করার সময় তোলা হয়েছে।

চার

কিশোর অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে আছে খবরের কাগজের দিকে। টম বলল, 'তোমার স্কটল্যান্ড যাত্রার কথা আর তাহলে গোপন রাখতে পারলে না। পত্রিকায় জানিয়ে দিয়েছে তুমি আর তোমার চাচা স্কটল্যান্ড যাচ্ছ, তোমাদের আত্মীয়া লেডি ওয়াগনারের মূল্যবান জিনিস হারানোর রহস্য ভেদ করতে।'

'কিন্তু পত্রিকাওলারা এ খবর জানল কি করে?' কিশোর অবাক।

'মুসা আর রবিন বলে দেয়নি তো?' সন্দেহ প্রকাশ করল টম।

কিশোর নিশ্চিত ওরা দু'জন এ কাজ জীবনেও করবে না। তবু মনের খচখচানি দূর করতে দুই বন্ধুকে ফোন করল ও। দু'জনেই জোর দিয়ে বলল যার যার বাবা-মা ছাড়া আর কাউকে তারা স্কটল্যান্ড যাত্রার কথা বলেনি। মুসার বাবা-মা, রবিনের বাবা-মা সবাই জানালেন ওদের আসন্ন সফরের কথা বাইরের কারও কাছে ফাঁস করেননি তাঁরা।

আরও চিন্তায় পড়ে গেল কিশোর। কাগজের লেখাটা পড়ে ফেলল। 'দেখো দেখো, কাণ্ড! লিখেছে লেডি ওয়াগনার নাকি নিজেই স্বীকার করেছেন জিনিসটা হারিয়ে গেছে। হারানো শব্দটার ওপর জোর দেয়া হয়েছে।'

টম কয়েক সেকেন্ড গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিশোরের দিকে। বলল, 'কিশোর, স্কটল্যান্ড যাওয়াটা কি খুব জরুরী?'

'অবশ্যই জরুরী। কেন?'

'তোমাদের বাড়িতে আসার আগে একটা বেনামী ফোন পেয়েছি। একটা অপরিচিত কণ্ঠ বলেছে তোমার বন্ধুকে বাঁচাতে চাইলে ওকে স্কটল্যান্ড যেতে দিয়ো না।'

টমের কথা শুনে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল কিশোরের। তারমানে অদৃশ্য শত্রু ভালভাবেই লেগেছে ওর পেছনে। 'আমি এক্ষুণি পত্রিকা অফিসে ফোন করছি,' কিশোর বলল। 'আরটিকলটা কে লিখেছে, কোত্থেকে সূত্র পেয়েছে জানা দরকার।'

কিন্তু পত্রিকা অফিসে ফোন করেও লাভ হলো না কোন। এক তরুণী জানাল অফিস ছুটি হয়ে গেছে। সবাই বাড়ি চলে গেছে। আর তরুণী এ ব্যাপারে কোন তথ্য দিতে অপারগ। একঘেয়ে কণ্ঠে 'কাল সকালে ফোন করবেন' বলে লাইন কেটে দিল সে।

ডিনার খেতে খেতে খবরের কাগজের লেখাটা নিয়ে আলোচনা হলো। রাশেদ পাশাও আছেন।

'টম, একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ? আরটিকলের কোথাও কিন্তু লেখা নেই মূল্যবান জিনিসটা চুরি হয়েছে,' কিশোর বলল। 'সন্দেহও প্রকাশ করা হয়নি। অথচ হারিয়েছে যখন, চুরিও তো যেতে পারে।'

'ঠিক বলেছিস,' রাশেদ পাশা বললেন। 'চুরির সম্ভাবনার কথা লিখল না কেন ভেবে খটকা লাগছে।'

কিশোর বলল, 'হয়তো যে লোক ওই গল্পের তথ্য যুগিয়েছে সে জানত মূল্যবান জিনিসটা চুরিই হয়েছে। কিন্তু হারিয়ে গেছে বললে, চুরির কথা না তুললে পুলিশ বা অন্য কেউ আর চোরের খোঁজ করবে না। এ কারণেই চুরির শব্দটা সযত্নে এড়িয়ে গেছে।'

'তোর কথায় অবশ্য যুক্তি আছে,' প্রশংসা করলেন রাশেদ পাশা।

টমের দিকে তাকাল কিশোর। 'কাল সকালেই তো আমরা চলে যাচ্ছি। পত্রিকার ব্যাপারটার কি হবে? তুমি খোঁজ নেবে?'

হাসল টম। 'খোঁজ নিতে গিয়ে রহস্যের সমাধান করে ফেলি যদি?'

হাসল কিশোরও। 'তাহলে বেশ হয়। তুমিও গোয়েন্দা বলে পরিচিত হয়ে উঠবে। অবশ্য ইচ্ছে করলে তুমি আমাদের অনেক কাজে আসতে পারো।'

'আমার ওপর ভরসা করার জন্যে ধন্যবাদ, ডিটেকটিভ কিশোর পাশা,' বলল টম। 'আর কোন কাজ?'

'একটা ঘটনার কথা তোমাকে বলা হয়নি,' কিশোর বলল। ডাকবাক্সে বোমা রাখার ঘটনাটা জানাল টমকে সে। শুনে চোয়াল ঝুলে পড়ল টমের।

কিশোর বলল, 'আমি চিঠিটার একটা ট্রেসিং করেছি। যাবার আগে তোমাকে দিয়ে দেব। চিঠিটা কে লিখেছে খুঁজে বের করতে পারো কিনা দেখো।'

কিটি রোভারের কথাও কিশোর বলল। 'সময় পেলে ছেলেটার বাড়ি থেকে একবার ঘুরে এসো।'

'যাব,' বলল টম।

বিদায় নেয়ার সময় টম বলল, 'আজ রাতে বাসায় ফিরছি না আমি। এক খালার বাসায় যাব। রেডি হয়ে থেকো। খালার বাসা থেকে এসে তোমাদের আমি এয়ারপোর্টে এগিয়ে দিয়ে আসব।'

'বেশ, তুমি সাতটার মধ্যে চলে এসো। আমরা রেডি হয়ে থাকব,' জানাল কিশোর।

পরদিন সকালে, কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় কিশোরের বাড়ি চলে এল টম। কিশোরদের মালপত্র গাড়ির পেছনের বনেটে তুলে দিল। মেরিচাচীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল কিশোর বিদায় মুহূর্তে, তারপর চড়ে বসল গাড়িতে।

মুসা আর রবিন রেডি হয়েই ছিল। ওরা পেছনের সীটে কিশোরের সঙ্গে বসল। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল ওরা। হাসার কারণটা হলো, পরামর্শ করেই তিনজনে এক রকম কাপড় পরে এসেছে। নেভী ব্লু কোট আর সাদা প্যান্ট। সুর করে মুসা বলল, 'আমরা তিনজন নীল পাখি।'

এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল ওরা। বিদায় মুহূর্তে সবার সঙ্গে হাত মেলাল টম, বলল, 'জন্মদিনের কথাটা ভুলে যেয়ো না কিন্তু।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'ভুলব না।'

খানিক পরে বিমান উড়াল দিল আকাশে। গন্তব্য নিউ ইয়র্ক। রাশেদ পাশার কিছু জরুরী কাজ আছে। সেজন্যেই সরাসরি স্কটল্যান্ডের দিকে না গিয়ে ওখানে যাওয়া। প্লেনে বসে খুনসুটি আর গল্প করে কেটে গেল সময়। নিউ ইয়র্ক পৌঁছে তিন গোয়েন্দাকে কিশোরের 'রীনা আন্টির' বাড়ি চলে যেতে বললেন রাশেদ পাশা। তিনি কাজ সেরে সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবেন। ছেলেরা যেন রেডি হয়ে থাকে। কারণ সন্ধ্যার পর পরই প্লেন ছাড়বে স্কটল্যান্ডের উদ্দেশে।

মিস রীনা বার্টসন স্কুলের টীচার, মেরিচাচীর কাজিন। সেই সম্পর্কে রাশেদ পাশার শালী। কিশোরকে খুব ভালবাসেন। মুসা আর রবিনকেও পছন্দ করেন। আগেও এখানে বেড়াতে এসেছে ওরা।

শহরের উপকণ্ঠে সুসজ্জিত একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন রীনা আন্টি। কিশোরদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তিনি।

'তোমাদের দেখে কি যে ভাল লাগছে আমার,' আন্টি বললেন। 'থাকবে তো ক'দিন?'

হাসল কিশোর। 'ক'দিন কি বলছেন? বড় জোর এক ঘণ্টা। সন্ধ্যায় প্লেন। আন্টি, থাকতে পারলে খুশিই হতাম। কিন্তু আমাদের অনেক তাড়া।'

অল্প কথায় রীনা আন্টিকে সব খুলে বলল কিশোর।

শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন তিনি। বললেন, 'স্কটল্যান্ডে গিয়ে কিন্তু খুব সাবধানে থাকবে তোমরা। কোন ঝামেলায় জড়াবে না।'

বাধ্য ছেলের মত মাথা দোলাল কিশোর। সেটা 'হ্যাঁ' না 'না' বোঝা গেল না।

'দাঁড়াও, স্কটল্যান্ডেই যখন যাচ্ছ, ওখানকার একটা বিশেষ জিনিস দেখাচ্ছি তোমাদের।'

রীনা আন্টি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। টেবিলের ড্রয়ার খুলে বের করলেন লম্বা, সরু, আবলুস কাঠের একটা জিনিস। 'এটা এক ধরনের বাঁশি। ব্যাগপাইপ নামে যে স্কটিশ বাঁশিগুলো আছে, সেটা থেকে খুলে নেয়া। ক'দিন আগে এক বাঁশিওয়ালার কাছ থেকে কিনেছি।'

'বাজিয়ে শোনান না,' অনুরোধ করল মুসা।

হাসলেন রীনা আন্টি। বাঁশিটা ঠোঁটে ছোঁয়ালেন। চমৎকার একটা সুর তুললেন বাঁশিতে।

'এটা স্কটস হোয়া হেই গানের সুর,' জানালেন তিনি।

'দারুণ তো!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল কিশোর। 'আন্টি, আপনি এত ভাল বাঁশি বাজাতে পারেন জানতাম না। আচ্ছা স্কটস, হোয়া হেই কথার মানে কি?'

জবাবে কৌতুক ঝিলিক দিল রীনা আন্টির চোখে। তিনি স্কটিশ উচ্চারণে স্কটল্যান্ডের নিম্নাঞ্চলের অধিবাসীদের গানের দুটো চরণ গেয়ে শোনালেন:

'স্কটস, ওয়া হেই উই ওয়ালেস ব্লেড,

স্কটস, ওয়াম ব্রুস হ্যাজ আফেন লেড।'

রীনা আন্টি জানালেন গানের কথা আর সুর তৈরি করেছিলেন স্কটিশ কবি রবার্ট বার্নস, ১৩১৪ সালে ব্যাটল অভ ব্যানকবার্নের যুদ্ধের চিত্রটা গানে-কবিতায়

স্মরণীয় করে রাখার জন্যে।

'প্রচুর রক্ত ঝরেছিল সেই যুদ্ধে,' আফসোস করে বললেন রীনা আন্টি। 'এই স্কটিশ কথাগুলোর মানে হলো: "স্কটস, ওয়ালেসদের সঙ্গে যুদ্ধে যাদের প্রচুর রক্ত ঝরেছে; স্কটস, ব্রুস যুদ্ধে যাদের প্রচুর নেতৃত্ব দিয়েছে।"

'দিন তো দেখি,' হাত বাড়াল কিশোর, 'আমি বাজাতে পারি নাকি।'

'পারবে। সহজ। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি নোট বা সুরগুলো কি কি আর কোথায় আঙুল রেখে বাজাতে হবে।'

রীন্টা আন্টির কথামত কিশোর ঠিকঠাক জায়গায় আঙুল রাখার পরে তিনি বললেন, 'এবার বাঁশিতে ফুঁ দাও। সেই সাথে আঙুল তুলতে আর নামাতে হবে। ওটাই আসল। যতক্ষণ না ঠিকমত পারবে, সুর উঠবে না।'

প্রথম প্রথম বাঁশিটা ঠিকমত ধরতেই পারল না কিশোর, ফুঁ দেয়ার কায়দাটাও ঠিক হলো না। রীনা আন্টি বার বার দেখিয়ে দিতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কায়দাটা বাজানোর কৌশল শিখে ফেলল কিশোর। সুরও তুলতে পারল ঠিকমত। তবে রীনা আন্টির মত অত দ্রুত পারল না। এর জন্যে প্রচুর প্র্যাকটিস দরকার। বাজাবে নাকি, মুসা আর রবিনকে জিজ্ঞেস করল সে। সজোরে মাথা নাড়ল দু'জনেই।

'আমার অত বাদক হবার খায়েশ নেই,' সাফ মানা করে দিল মুসা।

স্কটিস হোয়া হেই গানের সুরও তুলে ফেলল কিশোর দেখতে দেখতে।

'বাহ্, দারুণ!' তারিফ করল রবিন। 'কল্পনাই করিনি এত দ্রুত শিখে ফেলবে তুমি।'

কিশোর নিজেও খুশি তার সাফল্যে।

'আবার বাজাব?' মুচকি হেসে বলল ও। সুরটা আবার তুলল বাঁশিতে। বার বার তুলতে লাগল।

রীনা আন্টি হাসিমুখে বললেন, 'সময় কাটানোর জন্যে বাঁশি বাজানোর মত মজা হয় না। স্কটল্যান্ড গেলে আরও গান শিখতে পারবে।'

'গান শেখার সময় পাবে কিনা কিশোর, যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার,' বলল রবিন। 'জোড়া রহস্য ভেদ করতেই ওর সময় কেটে যাবে।'

'রহস্য ভেদ করতে গিয়ে মারা পড়ো না, এটাই হলো আমার কথা,' আবার সাবধান করলেন রীনা আন্টি।

বেরোনোর সময় হলো। আন্টির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিমান বন্দরে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা।

রাশেদ পাশা অপেক্ষা করছিলেন ওদের জন্যে। সবাই মিলে চড়ে বসল প্লেনে। বিলাসবহুল প্লেন, আরামদায়ক আসন। ডিনার খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়ল তিন বন্ধু। সকাল ছ'টা নাগাদ স্কটল্যান্ড পৌঁছুবে প্লেন। আমেরিকান সময় তখন রাত একটা।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙার পরে মুসা কয়েক মুহূর্ত বুঝতেই পারল না কোথায় আছে সে। রবিন তাকে উঠে পড়তে বললেও জেদ ধরে রইল আরও ঘুমাবে। কিন্তু কফি আর স্যান্ডউইচের মন মাতানো গন্ধে ঘুমের রেশ পুরোপুরি কেটে গেল

তার। ঝাঁপিয়ে পড়ল খাবারের ওপর। ওর হুমহাম করে খাওয়ার দৃশ্য দেখে হাসল কিশোর আর রবিন।

তার দিকে দু'জনকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসল মুসা। 'এত সুন্দর দুনিয়ায় জন্মে যদি খাবারই না খেলাম, জন্মানোটাই বৃথা!'

ওর এই দার্শনিক উক্তির জবাবে ব্যঙ্গ করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রবিন, এমন সময় প্লেনটা ভয়ানক ঝাঁকি খেতে শুরু করল। চমকে গেল যাত্রীরা। ভয়ে চিৎকার করে উঠল কেউ কেউ। বিপদ না তো!

পাঁচ

প্লেনটা বার বার ঝাঁকি খেয়েই চলেছে। ভয়ে বাকরুদ্ধ মুসা, চোখ বুজে আছে। কিশোর আর রবিন শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে রেখেছে যে যার সীট।

ঝাঁকির চোটে কাপ আর ডিশগুলো যেন ডানা মেলে উড়ছে। ছিটকে যাচ্ছে চার দিকে, খাবার-দাবার ছিটকে এসে লাগছে যাত্রীদের নাকে-মুখে-গায়ে। তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেল ঝাঁকুনি।

ক্যাপ্টেন এসে ক্ষমা চাইলেন সবার কাছে। 'সরি! আমাদের অটোমেটিক পাইলটে হঠাৎ যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। তবে ঘাবড়াবেন না। আর কোন সমস্যা হবে না। আমরা ম্যানুয়াল কন্ট্রোলে এখন প্লেন চালাচ্ছি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তিন বন্ধু। কিছুক্ষণ পরে ওদের বিমান চক্কর খেতে লাগল প্রেস্টউইক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টকে ঘিরে।

'স্কটল্যান্ডে এসে পড়েছি,' উল্লসিত কিশোর। 'গোয়েন্দাগিরি শুরু হতে যাচ্ছে আমাদের।'

ভ্রুকুটি করল মুসা। 'তোমার মাথায় তো গোয়েন্দাগিরির চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই ঢোকে না। কেন, আমরা ওসব ভুলে গিয়ে এত সুন্দর দেশটাতে শুধু ঘুরে বেড়াতে পারি না?'

হাসতে হাসতে টার্মিনালে ঢুকল ওরা। মালপত্র নেবে। ওখানে ওদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করে দেখা হলো। টার্মিনাল বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকলেন রাশেদ পাশা। ড্রাইভারের বয়স চল্লিশের কোঠায়। মাথায় কুচকুচে কালো চুল। মুখে মিষ্টি হাসি। নিজের নাম জানাল রজার ম্যাকলিন। ড্রাইভারকে গ্লাসগো যেতে বলে রাশেদ পাশা সদলবলে চড়ে বসলেন ট্যাক্সিতে।

তিন বন্ধু যথারীতি পেছনের সীটে বসেছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার রসিক মানুষ। মজার মজার কথা বলছে। তার স্কটিশ উচ্চারণ আর মজার মজার গল্প শুনে ওরা প্রচুর হাসাহাসি করল। রাস্তার পাশের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়ে নিয়ে চলেছে রজার ম্যাকলিন। দেখতে দেখতে গ্লাসগো শহরের উপকণ্ঠে চলে এল ওরা। এদিকে শত শত সীগালের ভিড় দেখে কিশোর আর তার বন্ধুরা রীতিমত মুগ্ধ ট্যাক্সি ড্রাইভার জানাল এই সীগালরা সমুদ্রগামী জাহাজের পেছনে মাইলের প-

মাইল পথ পাড়ি দেয় উচ্ছিষ্ট খাদ্যের আশায়। বেশ কিছু পাথরের তৈরি প্রাচীন বাড়ি দেখেও মজা পেল ওরা। প্রতিটা বাড়িতে অনেকগুলো করে মাটির চিমনি। একটা বাড়িতে গুনে দেখল ন'টা চিমনি।

'এত চিমনি কি কাজে লাগে?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'এ সব বাড়ির সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেম নেই,' জবাব দিল রজার ম্যাকলিন। 'তাই প্রতিটা ঘরে একটা করে ফায়ারপ্লেস আছে। আর ফায়ারপ্লেসের সঙ্গে চিমনি তো থাকবেই।'

'আমেরিকার অ্যাপার্টমেন্ট হাউসগুলোতে ওসবের বালাই নেই,' বলল কিশোর। 'সেখানে সেন্টার হল দিয়ে তাকালে বাড়ির পেছনের বাগান পর্যন্ত দেখা যায়।'

মুচকি হাসল ট্যাক্সি ড্রাইভার। 'তোমরা নিশ্চয়ই আমাদের দেশের ওপেন ক্লোজ আর ক্লোজড ক্লোজ-এর কথা শোনোনি?'

সবাই একযোগে ডানে আর বামে মাথা নাড়ল। শোনেনি। রজার ম্যাকলিন বলল, 'আমাদের ঘর বাড়িগুলো, আমেরিকান ভাষায় তোমরা যেগুলোকে বলো অ্যাপার্টমেন্ট হাউস, সে-সব বাড়ির একটা সাধারণ প্রবেশ পথ থাকে। ওটাকে বলে ক্লোজ। যদি প্রবেশ পথে দরজা থাকে তাহলে ওটার নাম হবে ক্লোডজ ক্লোজ আর দরজা না থাকলে ওপেন ক্লোজ।'

ড্রাইভারের কথা শুনে হাসল কিশোর। 'আপনাদের দেশের অনেক কিছুই শেখার বাকি রয়ে গেছে। না বুঝে আমরা হয়তো ভুল করে বসব, লোকে তখন ভুল বুঝবে আমাদের।'

'সেটাই স্বাভাবিক। ওরকম একটু আধটু ভুল করলে কিছু আসে যায় না,' ওদেরকে আশ্বস্ত করল রজার ম্যাকলিন।

রেল স্টেশনের পাশে আকর্ষণীয় একটা হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল ড্রাইভার। গাড়ি থেকে নেমে কিশোররা তিনজনে ঢুকল লবিতে, রাশেদ পাশা রিজার্ভেশনে গেলেন ওদের আগমনী সংবাদ দিতে। দশ মিনিট পার হয়ে যাবার পরেও চাচা ফিরছেন না দেখে উদ্বেগ বোধ করল কিশোর। নিজেই পা বাড়াল রিজার্ভেশনের দিকে। অবাক হয়ে দেখল রাশেদ পাশা ডেস্ক ক্লার্কের সঙ্গে তর্ক করছেন। শুনল চাচা, বলছেন, 'আমি তো আপনাকে ফোন করেছি।'

শেষে 'কি আর করা' ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ক্লার্ক, দুটো চাবি ধরিয়ে দিল রাশেদ পাশা'র হাতে, ডাকল একজন পোর্টারকে। লিফটে ওঠার আগে রাশেদ পাশা কিশোরদের জানালেন রিজার্ভেশন বইতে তাঁর নামের ভুল বানান লেখার কারণে ক্লার্কের সঙ্গে তর্ক হয়েছে। পাশার বদলে সে লিখেছে পেইশা।

রাশেদ পাশা'র রুম থেকে অল্প দূরে কিশোরদের ঘর। ওদেরকে বললেন, 'হাতমুখ ধুয়ে নে। আমি যাই। বাথরুম দরকার।' চলে গেলেন তিনি নিজের ঘরে।

ওদের ঘর দেখে খুব খুশি কিশোর, রবিন এবং মুসা। বেশ বড় রুম, সাজানো গোছানো, অ্যাটাচড বাথ। মুসা ঘোষণা করল জীবনেও নাকি এত বড় টার্কিশ তোয়ালে দেখেনি। 'কমপক্ষে সাত ফুট হবে তোয়ালেগুলো,' বলল সে।

আলমারির টপ ড্রয়ার খুলল কিশোর। জামা কাপড় রাখবে। ড্রয়ারের ভেতরে একটা কাগজ। কাগজটাতে ওর চোখ আটকে গেল।

'রবিন! মুসা!' উত্তেজিত গলায় ডাকল কিশোর। 'এদিকে এসো। একটা রহস্যময় জিনিস দেখে যাও।'

দৌড়ে এল ওরা কিশোরের কাছে। কাগজটাতে অদ্ভুত লেখা দেখে ওরাও হতভম্ব।

'এ লেখার মানে কি?' জিজ্ঞেস করল রবিন। জোরে জোরে পড়ে শোনাল, 'র‍্যাটহ্যাড ডিগ গ্লাস স্ল্যাট লণ্ড মল বীন বল গান অ্যাইল।'

'ড্রইংগুলোও কি অদ্ভুত দেখো,' মুসা বলল।

কাগজের উপরে বাম কোনায় একটা ব্যাগপাইপের ছবি। তার উল্টোদিকে একটা দোলনার মত কিছু, দেখতে নৌকার মত। আর নিচে বাঁ দিকের ছবিটা দেখে মনে হয় একটা আধুনিক দালানের খণ্ডাংশ।

হাসল মুসা। 'এর মধ্যে রহস্যের কিছু তো দেখছি না। হবে হয়তো কোনও বাচ্চা ছেলের কাজ। হিজিবিজি যা খুশি এঁকেছে।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'যে বাচ্চাটা ছবি এঁকেছে সে-ই হয়তো এই অর্থহীন কথাগুলো লিখেছে।'

ওদের সঙ্গে একমত হতে পারল না কিশোর। প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাধা পেল টেলিফোন বেজে ওঠায়। রাশেদ পাশা ফোন করেছেন ভেবে রিসিভার তুলল কিশোর। ওর চাচা নন, ফোন করেছে ডেস্ক ক্লার্ক। উত্তেজিত শোনাল তার কণ্ঠ।

'মিস্টার পাশা বলছেন?'

'আমি কিশোর পাশা।'

'ও, একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে, কিশোর,' বলল সে। 'তোমাদের নামে ভুল রুম বরাদ্দ করা হয়েছে। আমি এখুনি একজন পোর্টার পাঠিয়ে দিচ্ছি মালপত্রগুলো নিয়ে আসার জন্যে। ও তোমাদেরকে নতুন রুমে নিয়ে যাবে।।'

বন্ধুদেরকে খবরটা দিল কিশোর। মুসা বলল, 'ভাগ্যিস, সুটকেস খুলিনি। তবে এমন অভিজাত হোটেলে এ ধরনের ভুল মেনে নেয়া যায় না।'

কিশোর অদ্ভুত লেখাটার ওপর মনোযোগ দিল। ওর স্মরণশক্তি সাংঘাতিক প্রখর। লেখা এবং ছবিগুলো মনে গেঁথে নিল। আর কোনদিন ভুলবে না। আলমারি বন্ধ করতে করতে কিশোর বলল, 'যে লোক এ ঘরে আসছে এখন, এই লেখার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে।'

'লেখাটা আসলে একটা কোড, এই তো বলতে চাইছ তুমি?' রবিনের প্রশ্ন।

'হতে পারে,' জবাব দিল কিশোর।

ইতিমধ্যে পোর্টার চলে এল মালামাল নেয়ার জন্যে। ওরা নতুন রুম পেল হলঘরেই, রাশেদ পাশার রুমের বিপরীতে। রুমে ঢুকে কিশোর বলল, 'চাচাকে জানানো দরকার আমরা ঘর বদল করেছি,' পোর্টারের দিকে ফিরল সে। 'আমরা যে রুমটা ছেড়ে দিলাম ওটা মিস্টার পেইশার ঘর ছিল, তাই না?'

'জ্বী, মাস্টার। উনি ওটার রিজার্ভেশন নিয়েছেন। আপনারা ওঁর রুম দখল

করেছেন শুনে ভীষণ রেগে গেছেন।'

হাসল মুসা। 'লোকটা ভেবেছে তার ঘরটা নোংরা করে দেব আমরা।'

ওসব ভেবে ওই লোক বিরক্তি হয়নি, কিশোর নিশ্চিত। তার মনের ভেতর খচখচ করছে অদ্ভুত লেখাটা নিয়ে। কাগজটা কিশোররা দেখে ফেলতে পারে ভেবেই কি মিস্টার পেইশা রেগে গেছে? হয়তো লেখাটায় তার জন্যে কোন গোপন মেসেজ ছিল। চাচার সাথে লাঞ্চের টেবিলে বসে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করল কিশোর।

'তা হওয়া বিচিত্র নয়,' সায় দিলেন রাশেদ পাশা। 'তবে বৈধ কাজেও অনেক সময় কোড ব্যবহার করা হয়। কাজেই ব্যাপারটাকে সন্দেহের চোখে না দেখলেও চলে।'

চাচার সঙ্গে একমত হতে পারল না কিশোর। 'আমাদের ডাকবাক্সে যে চিঠিটা পেয়েছিলাম ওতে লেখা ছিল "পেইশা তোমাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে"। যে লোক আমাদের সাবধান করে দিতে চেয়েছিল সে হয়তো পাশা আর পেইশা নামের মধ্যে গোলমাল করে ফেলেছে। তোমাদের কি ধারণা?'

'কিন্তু পাশাই বা বোমা মারতে যাবে কেন?' রবিনের প্রশ্ন। 'আমার ধারণা, পেইশার কথাই বলেছে লোকটা। হোটেলের এই পেইশাই সেই পেইশা নয়তো?'

মুসা ঝুঁকে এল কিশোরের দিকে। 'আমাদের পাশের টেবিলের লোকটাকে লক্ষ করো। ব্যাটা আমাদের সমস্ত কথা গিলছে।'

কিশোর তাকাল পাশের টেবিলে। বছর চল্লিশ হবে লোকটার বয়স, পেশীবহুল শরীর, বসে আছে একা। গায়ের রঙ লালচে। তাকিয়ে ছিল কিশোরের দিকে। কিশোর তার দিকে ফেরা মাত্র মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে, ঝটপট বিলে সই করে চলে গেল টেবিল ছেড়ে।

কিশোররা ধীরে সুস্থে খাওয়া শেষ করল। তারপর উঠে দাঁড়াল। এক ওয়েট্রেস গেছে আগন্তুকের টেবিলের বিল নিতে। ওদিকে এগিয়ে গেল কিশোর, নার্সকে পাশ কাটানোর সময় এক ঝলক চোখ বোলাল বিলের ওপর। যে রুমটা কিছুক্ষণ আগে ছেড়ে এসেছে কিশোররা বিলের গায়ে ওটার নম্বর লেখা।

এ লোক মিস্টার পেইশা না হয়ে যায় না, ভাবল কিশোর। লবিতে চলে এল ও। পেছন পেছন ওর দুই সহকারী। বিলের কথা ওদেরকে বলল কিশোর। চারপাশে কোন দিকে তাকিয়ে আগন্তুককে দেখতে পেল না।

'তোর ভুলও হতে পারে, কিশোর,' বললেন রাশেদ পাশা। 'কাজেই ওই লোক সম্পর্কে ফট করে কোন উপসংহারে চলে আসা ঠিক না। বিকেলে আমার বিজনেস কনফারেন্স। তোরা ঘরে বসে কি করবি? তারচেয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করে কোনখান থেকে ঘুরে আয় না।'

'তা মন্দ হয় না,' কিশোর বলল। 'কিন্তু কোথায় যাব? এ শহরের কিছুই চিনি না।'

'হেড পোর্টারকে জিজ্ঞেস করতে পারিস। আকর্ষণীয় জায়গাগুলো চিনিয়ে দেবে। কোত্থেকে গাড়ি ভাড়া করলে সুবিধে হবে তাও বলতে পারবে। বললে গাড়িও ভাড়া করে দিতে পারে।'

রাশেদ পাশা চলে গেলেন। কিশোর হেড পোর্টারের কাছে গেল। বলল শহরের আকর্ষণীয় জায়গাগুলো ঘুরে দেখতে চায় ওরা। গাড়ি ভাড়া করবে। পোর্টার কি এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারবে? পোর্টার রাজি হয়ে গেল সানন্দে। বলল গাড়ি ভাড়া করতে কোন সমস্যা নেই।

'তোমার ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে?' জানতে চাইল সে।

'আছে।'

একটা এজেন্সিকে ফোন করল পোর্টার। তারা জানাল আধঘণ্টার মধ্যে হোটেলে একটা ছোট গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে।

'লক লোমোন্ডে গেছ কখনও?' জিজ্ঞেস করল পোর্টার। যায়নি শুনে ওখানে যাবার পরামর্শ দিল সে।

'খুব সুন্দর জায়গা,' বলল পোর্টার। 'যাবার পথে গ্লাসগো ইউনিভার্সিটিতে থামতে পারো। প্রাচীন এবং বিখ্যাত এই বিশ্ববিদ্যালয়। রেইনকোট নিতে ভুলো না যেন। স্কটল্যান্ডের আবহাওয়াকে বিশ্বাস নেই। এই রোদ এই বৃষ্টি।'

পোর্টার একটা ম্যাপ বের করে দেখাল কিশোরদেরকে। কয়েক জায়গায় পেন্সিল দিয়ে দাগ দিল। এ সব জায়গায় ওদেরকে ঘুরতে যাওয়ার পরামর্শ দিল।

'আশা করি সময়টা ভাল কাটবে তোমাদের,' ম্যাপটা কিশোরের হাতে দিল পোর্টার। 'গাড়ি চালানোর সময় মনে রেখো, এ দেশে রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে গাড়ি চালানোর নিয়ম।'

কিশোর বলল এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। আধঘণ্টা পরে ভাড়া করা গাড়িতে উঠে পড়ল তিন গোয়েন্দা। ঠিক করল, প্রথমে ইউনিভার্সিটি দেখতে যাবে।

গ্লাসগো ইউনিভার্সিটি দেখে মুগ্ধ হলো ওরা। বিশাল এলাকা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়। ধূসর রঙের পাথুরে বিল্ডিংগুলো দেখার মত। একসারিতে দাঁড়ানো।

গাড়ি চালিয়ে শহর ছেড়ে চলে এল কিশোর, ছুটল লক লোমোন্ডের রাস্তা ধরে। গ্রামাঞ্চলে ঢুকে পড়ল ওরা। অপূর্ব নিসর্গ দেখে শিস দিল মুসা, 'আহ, প্রকৃতি কত সুন্দর। পাতাবাহারের ঝোপগুলো দেখছ? অপূর্ব! কিশোর, গাড়ি থামাও। আমি কাছ থেকে দেখব।'

রাস্তার পাশে গাড়ি থামাল কিশোর। শুধু পাতাবাহার নয়, ফণিমনসা, বৈঁচিরও ঝোপ রয়েছে প্রচুর। ভারী সুন্দর লাগছে দেখতে।

আবার গাড়ি চালাল কিশোর। রবিন ওদের মনোযোগ আকর্ষণ করল কতগুলো মাঙ্কি পাজল গাছের দিকে। গাছগুলোর ডালপালাগুলো মোচড়ানো, একটার সাথে আরেকটা লেগে আছে। 'ওক আর এলমের তুলনায় এই অদ্ভুত নামের বানুরে-গাছগুলো অনেক ছাড়া ছাড়া ভাবে বেড়ে উঠেছে লক্ষ করেছ?'

কিন্তু কেউ মুসার কথার জবাব দেয়ার আগেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'সাবধান, কিশোর! গাড়ি আসছে রং সাইড দিয়ে!'

বার বার হর্ন টিপতে লাগল কিশোর। কিন্তু ড্রাইভার পাত্তা দিল না। কি করবে বুঝতে পারছে না। কিশোর যে পাশে আছে সেদিকে থাকলে অ্যাক্সিডেন্ট অনিবার্য। কিন্তু রাস্তার বিপরীত দিকে যাবার চেষ্টা করলে উল্টো দিক থেকে আসা

গাড়ির ড্রাইভারও একই কাজ করে বসতে পারে।

ভয়ে বুক শুকিয়ে গেছে মুসার। আর্তনাদ করে উঠল, 'খাইছে! গুঁতো মারতে আসছে তো!'

ছয়

তীরবেগে ছুটে আসছে গাড়িটা। রাস্তার অন্য পাশে সরার কোন ইচ্ছেই তার আছে বলে মনে হলো না।

গাড়ি না থামিয়ে উপায় নেই। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। মুহূর্তে রাস্তার পাশে নেমে পড়ল ও। গাড়ি ঢুকে গেল একটা বেড়ার মধ্যে। ব্রেক কষল। ঠিক সেই মুহূর্তে অপর গাড়ির ড্রাইভার ঝুঁকে পড়ল তার স্টিয়ারিং হুইলের ওপর, সাঁৎ করে গাড়ি নিয়ে এল তার বাঁ দিকের রাস্তায়।

বিদ্যুৎ গতিতে কিশোরদের পাশ কাটাল ড্রাইভার, ডান হাত দিয়ে আড়াল করে রেখেছে মুখ।

'লোকটা উন্মাদ!' রেগে গেছে মুসা।

'সেয়ানা পাগল বলো। দেখলে না হাত দিয়ে মুখ আড়াল করে রেখেছিল যাতে তাকে আমরা চিনতে না পারি,' বলল রবিন।

কিশোর কোন মন্তব্য করল না। চুপচাপ বসে আছে ড্রাইভিং সীটে। গা কাঁপছে এখনও। একটুর জন্যে ভয়াবহ একটা অ্যাক্সিডেন্টের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। বেড়াটা ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে গেছে। এজন্যে নিশ্চয়ই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ভাবল ও। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। বেড়ায় ঘের বাড়িটা একতলা। পাথরে তৈরি। প্রবেশ পথটা ধনুকাকৃতির।

মুসা আর রবিন উত্তেজিত হয়ে দুর্ঘটনার আলোচনা করছে। রবিন গাড়িটার লাইসেন্স নাম্বার টোকার চেষ্টা করেছিল। সফল হয়নি। শুধু আংশিক নম্বর টুকেছে: জিবি-২।

মুসা বলল, 'কিশোর। স্কটিশ পশমী কাপড়ে মোড়া সেই হুমকিপত্রের কথা মনে আছে? সেই একই লোকের হামলা নয়তো এটা?'

'হতে পারে,' কিশোর বলল। 'লোকটা ভুল করে রং সাইডে গেলেও আমার হর্ন শুনে তার সাবধান হওয়া উচিত ছিল।'

বিল্ডিং-এর সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন বছর পঞ্চাশ বয়েসের এক মোটাসোটা মহিলা। এগোলেন কিশোরদের দিকে। তাঁকে দেখে গাড়ি থেকে নামল কিশোর। মুসা আর রবিনও নামল।

'ঘটনাটার জন্যে আমি দুঃখিত,' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল কিশোর; 'আসলে দোষটা আমার ছিল না। আমি অ্যাক্সিডেন্ট এড়াতে গিয়ে...,' মহিলাকে সব খুলে বলল সে। রাস্তায় পলাতক ড্রাইভারের গাড়ির টায়ারের চিহ্ন ফুটে আছে। দেখতে পেলেন মহিলা।

'আপনার ভাঙা বেড়ার জন্যে যা ক্ষতিপূরণ লাগে দিতে রাজি আছি আমি,' শেষে কিশোর বলল।

কড়া স্কটিশ উচ্চারণে মহিলা বললেন, 'না। না। তার দরকার হবে না। তোমাদের যে কোন ক্ষতি হয়নি তাতেই আমি খুশি।'

রাস্তার বেসামাল ড্রাইভারদের কাণ্ডজ্ঞানহীন গাড়ি চালানো নিয়ে কিছুক্ষণ বিষোদগার করলেন তিনি।

কিশোর বলল, 'গাড়িটাকে সরাচ্ছি। বেড়ার কতটা ক্ষতি হয়েছে বোঝা যাবে।'

দেখা গেল তেমন ক্ষতি হয়নি। কিশোর আবারও ক্ষতিপূরণ দিতে চাইল। মহিলাও নেবেন না। মাথা নেড়ে বলল, 'তোমরা ঠিকই আমাদের দেশের আইন মেনে চলেছ। কাজেই অন্যের দোষের জন্যে তোমাদেরকে দোষারোপ করতে পারি না।'

মিসেস ডর্নকে ধন্যবাদ দিল কিশোর। হাসিমুখে জানতে চাইল, 'বাঁ দিক ঘেঁষে গাড়ি চালানোর নিয়ম কবে থেকে শুরু হয়েছে আপনাদের?'

মহিলা জানালেন, অনেক আগে স্কটল্যান্ডের রাস্তাঘাট ঘোড়সওয়ারদের জন্যে নিরাপদ ছিল না। প্রায়ই ডাকাতেরা হামলা চালাত। বিপরীত দিক থেকে আসা হামলাকারীকে রোখার জন্যে তাই তাদেরকে রাস্তার বাঁ দিক দিয়ে ঘোড়া চালাতে হতো। বাঁ হাতে ঘোড়ার লাগাম থাকত। ডান হাতে সদা প্রস্তুত তরবারি।

মুসা বলল, 'ভাগ্যিস ওই বিপজ্জনক সময়ে আমার জন্ম হয়নি।'

মিসেস ডর্ন হাসলেন, 'আমার তো মনে হয় আগের চেয়ে এখন রাস্তাঘাটে চলা অনেক বেশি বিপজ্জনক। তোমাদের এই অ্যাক্সিডেন্টটাও তো তার প্রমাণ।'

মহিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লক লোমোন্ডের দিকে আবার যাত্রা শুরু করল ওরা। রাস্তার দু'পাশে বড় বড় খামার বাড়ি আর উঁচু উঁচু পাথরের দেয়াল দেখে বেশ মজা পেল তিন বন্ধু।

একটু পরে লক লোমোন্ড চোখে পড়ল ওদের। পাহাড় ঘেরা প্রকাণ্ড একটা লেক। স্ফটিক স্বচ্ছ জল। লেকের মাঝখানে ছোট ছোট অনেক দ্বীপ। দূর থেকে বিন্দুর মত লাগছে।

একটা খাঁড়ির পাশে গাড়ি থামাল কিশোর। এক সারি হাউসবোটের দিকে চোখ আটকে গেল ওর। জানালাসহ প্রকাণ্ড চৌকোনা বাক্সের মত হাউসবোটগুলো। একেকটা একতলা সমান উঁচু, সাদা রং করা। প্রতিটা হাউসবোটের নিজস্ব ডক বা জাহাজঘাটা রয়েছে।

উত্তেজিত গলায় কিশোর বলল, 'দেখো, হাউসবোটগুলো। হোটেল রুমের সেই ছবির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার।'

'আমারও,' সায় দিল রবিন। 'কিন্তু হাউসবোটের সঙ্গে আমাদের রহস্যের কি সম্পর্ক?'

শ্রাগ করল কিশোর। 'সম্পর্ক থাকতে পারে আবার না-ও থাকতে পারে। তবে জরুরী সূত্র হতে পারে এটা।'

মুসা এ সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। খানিক আগেও আকাশ

ছিল ঝকঝকে, পরিষ্কার। এখন কালো কালো মেঘ ঢেকে ফেলছে সূর্য। বাতাসের বেগও বাড়ছে।

'খুব বেশি দূরে যাওয়া উচিত হবে না আমাদের,' বলল সে। 'ঝড় আসতে পারে। হোটেলে তাড়াতাড়ি ফিরে যাই, কি বলো?'

কিশোর সায় দিল ওর কথায়। বলল আর সামান্য একটু এগিয়ে দেখেই ফিরে যাবে। পানির খুব কাছ দিয়ে গেছে রাস্তা। খানিকটা এগোনোর পরে তীরের কাছে পাথরের ছোট একটা বেদী চোখে পড়ল ওদের। বেদীর ওপরে একটা বাচ্চা ছেলের মূর্তি।

'মূর্তিটা এখানে কেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আমি গাইড বইতে মূর্তিটার কথা পড়েছি,' জবাব দিল কিশোর। 'ওই বাচ্চাটা এখানে ডুবে মারা যায়। তার বাবা-মা বাচ্চার স্মরণে মূর্তিটা বানান।'

'খুবই দুঃখজনক ঘটনা!' বিড়বিড় করল মুসা।

লুস নামে ছোট একটা শহরে এসে ঢুকেছে ওরা। জোর গতিতে বইতে শুরু করল বাতাস। ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। তীব্র গতিতে বাতাস আছড়ে পড়ছে গাড়ির ওপর। ঝাঁকি খাচ্ছে গাড়ি। হুইলের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করতে হলো কিশোরকে গাড়িটাকে উল্টে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে।

'জলদি চলো!' মিনতি করল মুসা। 'বাতাসের মতিগতি মোটেও ভাল ঠেকছে না আমার।'

স্পীড বাড়াল কিশোর। সেই খাঁড়ির কাছে চলে এল যেখানে হাউসবোটগুলো বাঁধা। খাঁড়িতে প্রচণ্ড ঢেউ উঠেছে। ঢেউয়ের ধাক্কায় ভয়ানক দুলছে জলযানগুলো।

'এ রকম আবহাওয়ায় লক্ষ টাকা দিলেও আমি হাউসবোটে থাকতাম না,' ওদিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল রবিন।

হঠাৎ লেক থেকে ভীষণ বেগে ফুঁসতে ফুঁসতে উঠে এল ঝোড়ো বাতাস, ভয়ানক শক্তি নিয়ে আছড়ে পড়ল ওদের গাড়ির ওপর। বাতাসের ধাক্কায় রাস্তার অন্যপাশে ছিটকে চলে গেল গাড়ি। প্রাণপণ শক্তিতে ব্রেক কষল কিশোর। ডিগবাজি খেতে গিয়েও খেল না। স্থির হয়ে রইল যান্ত্রিক বাহন।

মুসা আর রবিন দুলতে থাকা হাউসবোটগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'একটা বোট উল্টে যাচ্ছে।'

চট করে ওদিকে তাকাল কিশোর। সারির তিন নম্বর হাউসবোটটা ঢেউ আর বাতাসের ধাক্কায় দলছুট হয়ে ছিটকে গেছে, আছড়ে পড়েছে তীরে। পর মুহূর্তে ডিগবাজি খেয়ে উল্টে গেল ওটা। বাতাসের ক্রুদ্ধ হুংকার ছাপিয়ে বোট থেকে কাদের যেন আর্তনাদ শোনা গেল।

'বোটের ভেতর মানুষ আছে!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। 'ওদের নিশ্চয় সাহায্য দরকার।'

নিজেদের বিপদের কথা ভুলে গেল তিন বন্ধু। পেছনের সীট থেকে রেইনকোট আর হ্যাট নিয়ে পরে ফেলল ঝটপট। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল কিশোর, তারপর দরজা খোলার জন্যে হাত বাড়াল।

দরজায় বাতাসের প্রবল চাপ। খুলতে ভীষণ বেগ পেতে হলো। বাতাসের

তীব্র চাপে ফাঁকই করতে পারছে না দরজা। বহু কষ্টে বেরিয়ে এল ওরা গাড়ি থেকে। এদিকে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। লক লোমোন্ডের বুকে সাদা ফেনা নিয়ে নাচানাচি করছে ঢেউ, খাঁড়ির ধারের ছোট ছোট নৌকাগুলোকেও সেই সাথে নাচাচ্ছে যেন খেপে গিয়ে।

তীরের দিকে পা বাড়িয়েছে তিন গোয়েন্দা, ওল্টানো হাউসবোট থেকে তীব্র আর্তনাদ ভেসে এল। আটকে পড়া লোকগুলোকে রক্ষা করতে পারবে ওরা? অন্যান্য হাউসবোটে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। হয়তো হাউসবোটে লোকজন নেই কিংবা ভয়ে বেরোচ্ছে না।

উল্টে যাওয়া বোটটার দিকে বাতাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে এগোচ্ছে ওরা, হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল রবিন। ও ছিল সবার পেছনে। রবিন আর কিশোর পেছনে তাকিয়ে আঁতকে উঠল।

ভয়ঙ্কর ঝোড়ো বাতাস রবিনকে ঠেলতে ঠেলতে পানির ধারে নিয়ে গেছে। বাতাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে কুলিয়ে উঠতে পারছে না সে। তীরের একেবারে কিনারে চলে গেছে। সামলাতে পারল না কোনমতেই। ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে পড়ে গেল নিচের উত্তাল জলরাশির মধ্যে।

সাত

বন্ধুকে বিপদে পড়তে দেখে লক লোমোন্ডের তীব্র ঢেউয়ের মধ্যে ডাইভ দিয়ে পড়ল মুসা ও কিশোর। রবিন বার দুই ভেসে ওঠার চেষ্টা করল। দু'বারই ঢেউয়ের নিচে চাপা পড়ে গেল।

সাঁতার কেটে তার কাছে চলে এল রবিন ও কিশোর। দু'দিক থেকে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল ওকে। তীব্র স্রোতে দাঁড়িয়ে থাকা মুশকিল, পিছলে যেতে চায় পা। তিন বন্ধু পরস্পরের হাত ধরে এক সঙ্গে ফিরতে লাগল তীর লক্ষ্য করে।

তীরে উঠে মাটিতে ধপ করে বসে পড়ল রবিন। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'অ-অনেক ধন্যবাদ।'

'তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো,' কিশোর বলল। 'আমি আর মুসা হাউসবোটে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসি।'

'না, না,' আপত্তি জানাল রবিন। 'আমি ঠিক আছি। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব। বিপদে পড়া মানুষগুলোকে বাঁচাতে চাই।'

বাতাসের হুংকার ছাপিয়ে একটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ ভেসে এল। মাকে ডাকছে।

হাউসবোটের দিকে ছুটল ওরা। ওল্টানো বোটের একটা পাশ বেয়ে ওপরে উঠল অনেক কষ্টে। দরজা দেখতে পেল না কিশোর, একটা জানালা খুলল। জানালার চৌকাঠ দিয়ে নিচে ঝুঁকে তাকাল। দেখল আসবাব, বিছানা ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিপরীত দিকের দেয়ালে। উল্টে যাবার কারণে দেয়ালটাই

এখন হাউসবোটের মেঝেতে পরিণত হয়েছে। দেয়ালের পাশে হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে এক মহিলা। তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসা ছোট একটা মেয়ে। ফোঁপাচ্ছে।

কিশোরের সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকাল বাচ্চাটা। 'আমার আম্মু উঠছে না। ওকে ঘুম থেকে জাগাতে পারবে তোমরা?'

মেয়েটার মুখে শুকিয়ে আছে জলের দাগ। দেখে খুব মায়া লাগল কিশোরের। মনে মনে প্রার্থনা করল মহিলার যেন খারাপ কিছু না ঘটে।

'আমি আসছি, একটু রাখো,' কিশোর বলল। ডাক দিল দুই সহকারীকে। বাচ্চা আর তার মার অবস্থা বর্ণনা করল সংক্ষেপে। শেষে বলল, 'আমার হাত ধরো। তাহলে নিচে নামতে সমস্যা হবে না।'

মুসা আর রবিন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল, দু'পাশ থেকে দু'হাত ধরল কিশোরের, আস্তে আস্তে নিচে নেমে এল ও।

মহিলার দিকে পা বাড়াল কিশোর। পরীক্ষা করে বুঝল অজ্ঞান হয়ে আছে মহিলা, শরীরের কোথাও হাড়-টাড় ভাঙেনি। বোট উল্টে যাবার সময় কোন কিছুতে মাথায় বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছে।

'জানালার নিচে একটা টেবিল রাখছি আমি,' মুসা আর রবিনকে ডেকে কিশোর বলল। 'তোমাদেরকে তাহলে আর নিচে নামতে বেশি কষ্ট করতে হবে না।'

পাইনের শক্ত একটা টেবিল জানালার নিচে ঠেলে নিয়ে গেল কিশোর। রবিন প্রথমে নামল। তারপর মুসাকে নামতে সাহায্য করল ওরা।

বাচ্চাটা আবার কান্না জুড়ে দিয়েছে। এত লোক দেখে ভয় পেয়েছে বোধহয়। ওল্টানো একটা চেয়ারের পেছনে গিয়ে লুকাল। মুসা ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি?'

'চেরি গারবার। পী-প্লীজ আমার মাকে জাগাও না।'

'জাগাব,' ওকে ভরসা দিল মুসা। 'তুমি আগে চেয়ারের পেছন থেকে বেরিয়ে এসো। তারপর তোমার মাকে জাগানোর ব্যবস্থা করছি।'

মুসার নরম কণ্ঠ শুনে ভয় কেটে গেল বাচ্চাটার। দৌড়ে এল ওর কাছে। বিস্মিত গলায় বলল, 'দেখেছ, সব কেমন উল্টে আছে।'

'সব আবার আগের মত ঠিক হয়ে যাবে,' মিষ্টি হাসল মুসা।

এদিকে মিসেস আর্ডেনের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্যে চেষ্টা করে চলেছে রবিন এবং কিশোর। কিশোর কব্জি আর ঘাড়ের পেছনটা হাত দিয়ে ম্যাসেজ করছে। রবিন স্টিমুল্যান্ট খুঁজছে। এক বোতল কর্পূর পেয়ে গেল ও। বোতলটা খুলে মিসেস আর্ডেনের নাকের নিচে ধরল। কর্পূরের ঝাঁঝাল গন্ধে একটু পরেই জ্ঞান ফিরে পেল মহিলা।

মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে দুর্বল গলায় বলল, 'তুমি কে? আমি কোথায়?'

'আম্মু, আম্মু!' করতে করতে ছুটে এল চেরি, ঝাঁপিয়ে পড়ল মা'র কোলে।

একটু পরেই সব কথা মনে পড়ে গেল মিসেস আর্ডেনের। 'তোমরা আমাদেরকে বাঁচাতে এসেছ?' তিন গোয়েন্দাকে জিজ্ঞেস করল সে। 'তোমরা অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটতে দেখেছ?'

'দেখেছি,' জবাব দিল কিশোর। ও সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল মিসেস আর্ডেনের। 'এবার বাইরে যাওয়া যাক। বৃষ্টি নেই। বাতাসও থেমে গেছে। চলুন।'

ওই সময় জানালা দিয়ে উঁকি দিল এক লোক। ডাকল, 'মিসেস গারবার। আপনারা ঠিক আছেন তো?'

'আছি। এই ছেলেগুলো আমাদেরকে বাঁচিয়েছে।'

লোকটা খোলা জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। 'চেরি, তোমার আন্টিও এসেছে। নাও, হাত বাড়িয়ে দাও। আমি তোমাকে তুলে নিচ্ছি।'

মেয়েটাকে আলগোছে তুলে নিল লোকটা। তার স্ত্রীর কাছে চেরিকে দিয়ে এসে আবার জানালার সামনে দাঁড়াল। মিসেস গারবারকে জানালা গলে বেরোতে সাহায্য করল তিন গোয়েন্দা। তারপর নিজেরা একে একে বেরিয়ে এল বাইরে। যে লোকটা চেরি আর তার মাকে একটু আগে বাইরে নিয়ে এসেছে তার নাম ব্রেক। ব্রেকের বউ তিন গোয়েন্দার কাকভেজা দশা দেখে বলল, 'আমাদের বাসায় চলো। জামা কাপড় শুকিয়ে নেবে।'

এ প্রস্তাবে না বলার কিছু নেই। ব্রেকদের হাউসবোটে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হাউসবোট। সাজানো-গোছানো। স্টোভের আগুনে যে যার জামা কাপড় শুকিয়ে নিল ওরা। মুখ হাত ধুলো। চুল আঁচড়াল। মিসেস ব্রেকের চোখের দৃষ্টি হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কিশোরের দিকে তাকিয়ে।

'আরে তোমার তো ছবি দেখেছি ফটোগ্রাফি ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকায়,' বিস্ময় তার চেহারায়। 'এজন্যই তোমার নামটা চেনা চেনা লাগছিল। তুমিই তা হলে সেই বিখ্যাত কিশোর গোয়েন্দা?'

মুখ লাল হয়ে উঠল কিশোরের। প্রশংসার জন্যে নয়। স্কটল্যান্ডের মানুষও তার উপস্থিতির কথা জেনে ফেলেছে বলে। ভয় হলো ওকে এ ভাবে সবাই-ই হয়তো চিনে ফেলবে। তাহলে গোয়েন্দাগিরির কাজ সারা। শত্রুকে ধরা খুবই কষ্টকর হয়ে উঠবে। তাকে দেখামাত্র কেটে পড়বে ওরা।

'তুমি তো রহস্য খোঁজো, না?' বলল মিসেস ব্রেক। 'এখানেও অনেক রহস্যের সন্ধান পাবে। লক্ষ করেছ এদিকের শেষ হাউসবোটটা সারি থেকে অনেকটা দূরে?'

'না তো!' কিশোর বলল।

গলার স্বর ঝপ করে নেমে এল মিসেস ব্রেকের। 'ওই হাউসবোটে রহস্যময় লোকজনের আনাগোনা চলছে। হাউসবোটের মালিকরা বোধহয় বোটটা ওই লোকগুলোর কাছে ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। তবে এখানকার কেউই রহস্যময় লোকগুলোকে চেনে না। ওরা বেশিরভাগ সময় রাতের বেলা আসে। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করেছি, ওদের গাড়ি নেই।'

কৌতূহলী হয়ে উঠল কিশোর। সিদ্ধান্ত নিল রহস্যময় হাউসবোটে একবার ঢুঁ

মেরে আসবে। এ ব্যাপারে মিসেস ব্রেককে আরও কিছু প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল ওর। কিন্তু কয়েকজন প্রতিবেশী চলে আসায় সম্ভব হলো না। চেরি আর মিসেস গারবার এখন অনেক স্বাভাবিক এবং সুস্থ। ব্রেক পরিবার আর গারবারদের কাছ থেকে বিদায় নিল তিন গোয়েন্দা। তারপর পা বাড়াল সারির শেষ হাউসবোটের দিকে। ডক থেকে সরু ডেকে উঠে এল ওরা। জলযানটা ডেক দিয়ে ঘেরা। হাউসবোটের জানালা বন্ধ, ভেতরে পর্দা ফেলা। বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না। নক্ করেও লাভ হলো না। কারও সাড়া মিলল না। ডেকে বৃথাই হাঁটাহাঁটি করল ওরা, বাসিন্দাদেরকে সন্দেহ করার মত কোন সূত্র চোখে পড়ল না।

হোটেলে ফিরে এল ওরা। জামা কাপড় পাল্টাল। হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল। মুসা আর রবিন বিশ্রাম নিচ্ছে, কিশোর বেরিয়ে এল ঘর থেকে। রাশেদ পাশার রুমে যাবে। বিকেলের অভিজ্ঞতার কথা বলবে চাচাকে।

ভুল করে প্রথমে যে ঘরটায় উঠে পড়েছিল, সেটার সামনে দিয়ে যাবার সময় ব্যাগপাইপের শব্দ কানে এল কিশোরের। স্কটস হোয়া হেই গানের সুর।

থেমে দাঁড়াল কিশোর। বাজানো শুনেই বোঝা যায় বাদক নবিস লোক। বারবার প্রথম চরণটাই বেসুরো ভঙ্গিতে বাজিয়ে চলেছে।

'নির্ঘাত মিস্টার পেইশা,' ভাবল কিশোর। আলমারির ড্রয়ারে পাওয়া কাগজটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। ওতে ব্যাগপাইপের ছবিও ছিল।

চাচার ঘরের দরজায় নক করল কিশোর।

রাশেদ পাশা ঘরেই আছেন। খুলে দিলেন দরজা। হাতে সান্ধ্য পত্রিকা। কাগজটা কিশোরকে দেখিয়ে বললেন, 'নে, পড়।'

পত্রিকার প্রথম পাতায় ফটোগ্রাফি ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রচ্ছদ ছাপা হয়েছে। ক্যাপশনে কিশোর গোয়েন্দার কথা বেশ ফলাও করে বলেছে।

ছবিটা দেখে গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'ইস্! আবার সেই ছবি। পাবলিসিটি চাই না। তারপরও আঠার মত জিনিসটা যেন লেগেই আছে আমার পেছনে।'

হাউসবোটের ঘটনা চাচাকে খুলে বলল কিশোর। জানাল ওকে কিভাবে চিনে ফেলেছিল মিসেস ব্রেক। শেষে মন্তব্য করল, 'এ রকম অবস্থা চলতে থাকলে গোপনে কিছুই করা যাবে না দেখছি।'

কিশোর গাড়ি দুর্ঘটনার কথাও জানাল চাচাকে। শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন রাশেদ পাশা। 'লোকটা তোকে মারতে না চাইলেও ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কে যে এই কাজগুলো করছে যদি জানতে পারতাম!'

'লেডি ওয়াগনারের হারানো জিনিসটার সঙ্গে এর যোগসূত্র না থেকেই পারে না,' জোর দিয়ে কিশোর বলল। 'চাচা, পুলিশে খবর দেব?'

কিছুক্ষণ ভাবলেন রাশেদ পাশা, তারপর বললেন, 'খবর দিয়েই বা কি লাভ? তোরা তো গাড়ির পুরো নম্বরটা নিতে পারিসনি। ড্রাইভারের চেহারাও দেখতে পাসনি। একটা কাজ কর। আজ আর হোটেলের ডাইনিং রুমে খেয়ে কাজ নেই। হোটেলের পাশেই একটা ফরাসী রেস্টুরেন্ট আছে। ভাল রান্না করে। ওখানে সাতটার সময় চলে যাব। একসঙ্গে ডিনার করব।'

'আচ্ছা, চাচা,' কিশোর বলল।

সন্ধ্যায় ফরাসী রেস্টুরেন্টে গেল ওরা। হেড ওয়েটারকে বলতে রেস্টুরেন্টের এক কোনায় নিয়ে বসাল সবাইকে। এখানে কেউ ওদেরকে বিরক্ত করতে আসবে না। তবে, কিশোর লক্ষ করল ওয়েটার আর একজন বয় বারবার চোরা চাহনিতে দেখছে ওকে।

কিশোরের সন্দেহ হলো ওরা বোধহয় ওকে চিনে ফেলেছে। খাওয়ার শেষ আইটেমটা চলছে, এই সময় বয় এক টুকরো কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে এল।

'মঁশিয়ে, ওই দুই নম্বর টেবিলের ভদ্রলোক আপনার একটা অটোগ্রাফ চাইছেন,' কিশোরকে অনুরোধ করল সে।

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। অনুরোধ রক্ষা করবে না। কিম নামের লোকটার কথা মনে পড়ে গেল। রকি বীচে একটা ছেলের মাধ্যমে দশ ডলার দিয়ে তার অটোগ্রাফ কিনেছিল লোকটা। নিশ্চয় কোনও বদ মতলব আছে। সেটা হাসিল করার জন্যে আর কাউকে অটোগ্রাফ দেবে না সে।

দ্বিতীয় টেবিলের দিকে তাকাল কিশোর, মিষ্টি হাসি ফুটল ঠোঁটে, এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল, বলল, 'দুঃখিত।'

রাশেদ পাশা বিল দিয়ে দিলেন। রেস্টুরেন্ট থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল চারজনে। হোটেলের পেছনের সিঁড়ি বেয়ে চলে এল নিজেদের ঘরে। কিশোরকে বললেন রাশেদ পাশা, 'কাল সকালে এডিনবার্গ যাব। রেডি হয়ে থাকিস। রজার ম্যাকলিন নামের সেই ড্রাইভারটাকেই আবার ভাড়া করেছি।'

পরদিন সকালে, হোটেল ছাড়ার আগে, কিশোর ডেস্কে গেল দেখতে মিস্টার পেইশা এখনও হোটেলে আছে নাকি চলে গেছে। ডেস্ক ক্লার্ক জানাল, 'উনি খুব ভোরে পাওনা মিটিয়ে চলে গেছেন হোটেল ছেড়ে।'

কিশোর অন্যদের সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে ভাবল, 'কেন জানি মনে হচ্ছে মিস্টার পেইশার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে আমার।'

রজার ম্যাকলিন ওদের দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল। জানতে চাইল এডিনবার্গ যাবার আগে শহরের কোথাও ঘুরতে যেতে চায় কিনা।

কিশোর বলল, 'সময় থাকলে ব্যাগপাইপ ফ্যাক্টরি একবার ঘুরে দেখব কি ভাবে বানায়।' মুচকি হাসল সে। 'ফ্যাক্টরিতে গেলে বাঁশি বাজানোটা আরও ভালভাবে শিখতে পারব হয়তো।'

রাশেদ পাশা বললেন হাতে সময় আছে প্রচুর। ড্রাইভার ওদেরকে গ্লাসগোর কেন্দ্রবিন্দু বাণিজ্যিক এলাকায় নিয়ে এল। এখানেই ব্যাগপাইপের কারখানা। কারখানায় শুধু ব্যাগপাইপ নয়, যারা এ বাদ্যযন্ত্র বাজায় তাদের ইউনিফর্মও তৈরি করা হয়।

ওদেরকে পুরো কারখানা ঘুরিয়ে দেখাল গাইড। দেখাল ভেড়ার চামড়ার ব্যাগ। ওতে বাঁশিওয়ালা বাতাস ভরে রাখে। বাঁশি বাজানোর সময় ওটা প্রয়োজন হয়। ব্যাগটা পশমী কাপড় দিয়ে মোড়া।

এরপর ওদেরকে ব্যাগপাইপের কাঠের বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো। যেটা

দিয়ে সুর তোলা হয় ওটাকে চ্যান্টার বলে, ওটার মাথায় একটা রীড থাকে। নিচের অংশে রবারের একটা ভালভ আছে, ব্যাগ থেকে বাতাস বের করতে না চাইলে ওটাকে বন্ধ করে দিলেই হলো। চ্যান্টার ছাড়াও ব্যাগপাইপটার আরও তিনটে পাইপ আছে। একসঙ্গে ওগুলোকে ড্রোন বলে। আলাদা আলাদা ভাবে দুটোর নাম টেনর, অপরটা ব্যাস।

গাইড ব্যাখ্যা করল, 'সব পাইপই বানানো হয় শক্ত আফ্রিকান ব্ল্যাক উড দিয়ে। পাইপ পরিষ্কার রাখা হয় যে হাতির দাঁত দিয়ে ওগুলো আসে ভারত থেকে, আর রীড-এর শর বা নল যা পাইপের মধ্যে থাকে, আনা হয় স্পেন থেকে। সবগুলো অংশ তারপর জোড়া লাগানো হয়।'

লম্বা, ফালি করা, ম্লান হলদে রঙের রীডগুলো সবচেয়ে আকর্ষণ করল কিশোরকে। শুনল নলগুলোকে খুব সাবধানে কাটা হয় যাতে ঠিকঠাক সুর আসে।

আরও কিছুক্ষণ ঘোরার পরে ব্যাগপাইপের কারখানা পরিদর্শন শেষ হয়ে গেল। গাইডকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে এল ওরা। কারখানা থেকে বেরোতে বেরোতে মুসা মন্তব্য করল, 'এত কঠিন জিনিস শিখে কাজ নেই বাপু। তারচেয়ে আমার পিয়ানোই ভাল।'

গাড়িতে উঠল ওরা। রজার বলল 'স্টার্লিং ক্যাস্‌ল্ দেখবেন? খুব সুন্দর জায়গা। গেলে ভাল লাগবে।'

সমস্বরে ওরা জানাল স্টার্লিং ক্যাস্‌ল্ দেখতে যেতে কারও আপত্তি নেই।

দুর্গের কাছাকাছি এসেছে, রবিন মুগ্ধ গলায় বলল, 'কি বিশাল দুর্গ!' উঁচু পাহাড়ের ওপর পাথরের বিল্ডিংগুলো দাঁড়িয়ে আছে আভিজাত্য আর গাম্ভীর্য নিয়ে।

রঙিন ঘাগরা পরা দুই গার্ড দাঁড়িয়ে ছিল প্রবেশ পথের ধারে। ভেতরে ঢুকতে একজন গাইড ওদের দুর্গ দেখাতে নিয়ে চলল। ঢালু, খোয়া বাঁধানো ড্রাইভওয়ে চলে গেছে একটা প্লাজার দিকে। ওখানে সার বেঁধে দাঁড়ানো পাথরের বেশ কয়েকটা দালান।

'সবচেয়ে ছোট দালানটা এক সময় টাকশাল হিসেবে ব্যবহার করা হতো,' হাত তুলে দেখাল গাইড। 'আশপাশের পাহাড় থেকে সংগ্রহ করে আনা হতো রূপা। তা দিয়ে মুদ্রা তৈরি করা হতো। লোকে বলে ওই রূপা নাকি ছিল স্টার্লিং সিলভারের আদি উৎস।'

রাজারা থাকত যে সব ঘরে, সেগুলোর বিশাল আকার-আকৃতি। সুসজ্জিত ঘরগুলো দেখে গোয়েন্দারা রীতিমত মুগ্ধ। ছোট একটা ঘর ব্যবহার করতেন মেরী, স্কটল্যান্ডের রানী। ইংল্যান্ডের কারাগারে বন্দি হবার আগে এ ঘরেই থাকতেন তিনি। গাইড রাজা-রাজড়াদের নিয়ে এমন গল্প শুরু করে দিল যে তার বকবকানিতে রীতিমত মাথা ধরে গেল তিন গোয়েন্দার।

কিশোরের মনে ধরল দুটো নাম–দুই দেশী বীর উইলিয়াম ওয়ালেস এবং রবার্ট ব্রুস। মনে পড়ল তাঁদের সম্মানে স্কটস হোয়া হেই গানটা রচনা করা হয়েছিল।

শুধু কিশোররা নয়। দুর্গ দেখতে এসেছে আরও অনেকে। তাঁরা বাইরে চলে

গেলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মুসা। 'বেচারী রানীর জন্যে খারাপই লাগছে। বিশ বছর কারাগারে বন্দি! তারপর গলা কেটে হত্যা! ওহ্, ভাবা যায় না!'

ওদেরকে নিয়ে দুর্গের উঠোন পার হয়ে একটা পাথরের সিঁড়ির সামনে চলে এল গাইড। সিঁড়ি চলে গেছে নিচে, আন্ডার গ্রাউন্ডে। 'মাটির নিচের কারাগার দেখবেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'দেখলে ক্ষতি কি?' বললেন রাশেদ পাশা।

'তাহলে আপনারা দেখে আসুন,' বলল গাইড, 'আমাকে আপনাদের দরকার হবে না। আমি এখানে দাঁড়াই।'

ওরা চারজন সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে। এখানে খুব ঠাণ্ডা। আর সেঁতসেঁতে। কারাগারের দূর প্রান্তে চলে এল ওরা। শিউরে উঠল মুসা। 'কি ভয়ংকর জায়গা! এখানে নিরীহ লোকজনকে বিনা দোষে বন্দি করে রাখা হতো ভাবতেই কেমন লাগছে। এখানে আর ভাল্লাগছে না। আমি গেলাম।'

ঘুরল মুসা, প্রায় দৌড়ে চলে এল বাইরে। ওর পেছন পেছন রাশেদ পাশা এবং রবিনও। মুচকি হাসল গাইড। 'গা ছমছমে জায়গা, তাই না?' তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের আরেকজন সঙ্গী কই? সেই কিশোর গোয়েন্দা? ওনার ছবি উঠেছিল না কাগজে?'

এতক্ষণে খেয়াল করল সবাই, কিশোর ওদের সঙ্গে নেই।

'আমি যাই। দেখি কিশোর কি করছে,' বললেন রাশেদ পাশা।

কিছুক্ষণ পরই ফিরে এলেন তিনি। চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ।

'কিশোরকে নিচে কোথাও দেখলাম না।'

'কি!' চেঁচিয়ে উঠল গাইড। 'উনি অবশ্যই নিচে আছেন। ওনাকে ওপরে উঠতে দেখিনি আমি।'

আতঙ্কিত হয়ে পড়ল মুসা, রবিন, রাশেদ পাশা। সিঁড়ি বেয়ে ছুটল নিচে। কি হলো কিশোরের? কোথায় সে?

আট

কিশোরকে না দেখে গাইডও চিন্তায় পড়ে গেল। সিঁড়ির শেষ মাথায় চলে এসেছেন রাশেদ পাশা, ওপর থেকে ডাকল সে, 'দাঁড়ান। আমি আসছি। একটা কথা বলব,' নেমে নিচে এল সে। বলল, 'আপনারা নিচে যাবার পরপরই একজন দর্শক নিচে গিয়েছিল। বিড়বিড় করে কি সব বলছিল। আমি শুধু শুনলাম, বলছে, এবার ওকে বাগে পাব আমি! এখন মনে হচ্ছে কিশোরের কথাই বলছিল সে। হয়তো···হয়তো ওকে সাফোকেশন চেম্বারে আটকে ফেলেছে।'

'কি!' এক সঙ্গে আঁতকে উঠল তিনজন।

গাইড জানাল ওরা প্রথম যে কামরায় ঢুকেছিল তার দেয়ালে ছোট একটা

ফোকর আছে। বহু আগে ওই কামরায় বন্দিদের ঢোকানো হতো। তারপর ফোকরটা পাথর দিয়ে বন্ধ করে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলা হতো ওদের। সেই পাথরটা এখনও আছে ওখানে।

কথা শেষ করেই গাইড পড়িমরি করে ছুটল সাফোকেশন চেম্বারের দিকে। সেই সঙ্গে মুসা, রবিন এবং রাশেদ পাশাও। কামরায় ঢুকে দেখল পাথরটা পড়ে আছে মেঝেতে। তবে কিশোরের কোন পাত্তা নেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন রাশেদ পাশা। 'খোদা! বাঁচা গেল! কিশোর হয়তো অন্য কোথাও আছে।'

আবার দৌড় দিল ওরা সিঁড়ির দিকে।

ওপরে উঠে ওদের বুক থেকে দেড়মনি পাথরটা নেমে গেল দুর্গের প্রধান প্রবেশ পথ ধরে কিশোরকে এগিয়ে আসতে দেখে।

'কিশোর!' চেঁচিয়ে বলল মুসা। 'তোমার জন্যে টেনশনে আমরা মরি। আর তুমি এখানে! কোথায় গিয়েছিলে?'

কিশোর জবাব দিল, 'তোমরা যখন কারাগারের ভেতরে ওই সময় একটা জিনিসের ওপর চোখ আটকে যায় আমার। ঠিক তখন একটা লোককে দেখি সিঁড়ি বেয়ে নামছে, এগিয়ে আসছে আমার দিকে। লোকটা কে জানো? রকি বীচের সেই অটোগ্রাফ চোর কিম।'

'তুমি ঠিক দেখেছ?' রবিনের গলায় অবিশ্বাস ।

'অবশ্যই,' কিশোর বলল। 'আমাকে দেখামাত্র ঘুরে দাঁড়ায় সে, দৌড় দেয় পাগলের মত। আমি ওর পিছু নিয়েছিলাম কিন্তু ধরতে পারিনি। গেটের বাইরে দাঁড় করানো গাড়িতে এক লাফে উঠে পড়ে সে। দেখে মনে হলো লক লোমোন্ডের সেই গাড়ি যেটা আমাদেরকে চাপা দিতে চেয়েছিল। খুব দ্রুত চলে গেল গাড়িটা। তবে ড্রাইভারের সীটে বসা লোকটাকে চিনতে পেরেছি আমি ঠিকই। মিস্টার পেইশা ।'

'ওরা দু'জনে তাহলে মিতালি পাতিয়েছে,' বলল রবিন। 'আর মতলব ভাল নয় বোঝাই যায়।'

এতক্ষণ চোখ বড় বড় করে কিশোরের গল্প শুনছিল মুসা। এবার গাইডের কথা বলল সে। গাইড যে একটা লোককে বিড়বিড় করে কি বলতে শুনেছিল। গম্ভীর গলায় শেষে যোগ করল, 'তুমি সাবধান না থাকলে ওই কিম ব্যাটা নির্ঘাত তোমাকে সাফোকেশন চেম্বারে আটকে ফেলত।'

মুখ বাঁকাল রবিন। 'যত সব হাস্যকর চিন্তা-ভাবনা। কিশোর, ওই লোক কেনই বা গুহার ভেতরে আসবে আর এলেও তোমার চোখে পড়ে যাবার ঝুঁকি কেন নেবে সে?'

'আমার ধারণা, রবিন, লোকটাকে পাঠানো হয়েছে আমাদের কথা আড়ি পেতে শোনার জন্যে। তবে এভাবে আমার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যাবে হয়তো ভাবতেই পারেনি সে।'

রাশেদ পাশা সন্দেহ করলেন শত্রুপক্ষ ওদের প্রতিটি পদক্ষেপ সতর্কভাবে লক্ষ করছে। 'মিস্টার পেইশাকে নিয়ে যে সন্দেহটা করেছিস মনে হচ্ছে তা মিথ্যা

নয়,' কিশোরকে বললেন তিনি। 'হোটেল রুমে তোদের কথা আড়ি পেতে শুনেছে সে। তাই আমরা রওনা হবার আগেই হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এখন থেকে কথা বলার ব্যাপারে সাবধানে থাকতে হবে তোদের।'

কিশোর পলাতক গাড়ির লাইসেন্স নম্বর টুকতে পেরেছে কিনা জানতে চাইলেন রাশেদ পাশা।

'পেরেছি,' কিশোর বলল। 'দুর্গে ঢোকার গেটে দাঁড়ানো এক গার্ডের সাহায্যে আমি পুলিশকে ফোন করেছিলাম। তারা নম্বর পরীক্ষা করে বলেছে গাড়িটা ভাড়া করা। এরপরে যা ঘটেছে, তাতে মনে হয় না ওরা ওই গাড়ি আর ব্যবহার করবে।'

রবিনের খুব রাগ হলো। 'আমরা যখনই কোন রহস্যের সমাধানের কাছাকাছি যাই সব গোলমাল হয়ে যায়।'

'গেটের গার্ড কিমকে থামাল না কেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

শ্রাগ করল কিশোর। 'খুব দ্রুত গাড়ি চালিয়ে চলে যাওয়ায় হয়তো সময় পায়নি গার্ড।'

ওরা ডোনাল্ডের গাড়িতে চড়ে বসল। একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে কেউ টুঁ শব্দটিও করল না। হাসি-আনন্দে মেতে উঠল সবাই। রজার ম্যাকলিন এডিনবার্গের নানা দর্শনীয় জায়গা ঘুরিয়ে দেখাল ওদেরকে। মজার মজার কৌতুক বলে হাসিয়ে মারল। সারা দিন চলে গেল ঘুরে-ফিরে, গল্প করে। সন্ধ্যা নাগাদ ওদেরকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল রজার। গ্লাসগোর মত এ হোটেলটাও রেল স্টেশনের পাশে।

রজার ম্যাকলিনকে বিদায় দিতে খারাপই লাগছিল ওদের। আমুদে স্বভাবের লোকটা ভালই জমিয়ে রেখেছিল সারাটা দিন।

হোটেলের লবিতে ওরা চা-নাস্তা খেল। আরও খানিক গল্প-গুজব চলল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল দোতলায়। নিজেদের রুমে ঢুকছে সবে কিশোর, বেজে উঠল ফোন। রিসিভার কানে তুলল কিশোর। অপারেটর জানাল, ওভারসিজ কল অর্থাৎ স্কটল্যান্ডের বাইরে থেকে ফোন এসেছে। কয়েক সেকেন্ড পরে ফোনে যার সপ্রতিভ কণ্ঠ ভেসে এল, খুশি হলো কিশোর। 'টম!'

'তোমার জন্যে খবর আছে, কিশোর,' টম জানাল। 'পত্রিকায় তোমাকে নিয়ে আরটিকল লিখেছে যে লোকটা, তার খোঁজ পেয়ে গেছি। চাপ দিতেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে কিম নামে এক লোকের কাছে থেকে সে তোমাদের প্ল্যান জেনে নিয়েছিল। খোঁজ নিয়ে জেনেছি কিমের আসল নাম হলো কিম ব্রাগনার।'

'দারুণ!' উত্তেজিত শোনাল কিশোরের গলা। 'কিম সম্পর্কে কি কি জানো?'

'জানি, পুলিশের সঙ্গে কোন ঝুট-ঝামেলায় জড়ায়নি লোকটা। তাই বলে যে ভাল লোক, তা-ও নয়। তার কয়েকটা চেক ব্যাঙ্ক থেকে বাউন্স হয়ে ফিরে এলে আইনী ঝামেলায় আরেকটু হলেই ফেঁসে যাচ্ছিল এই কিম।'

'খাঁটি গোয়েন্দার মত কাজ করেছ দেখছি,' প্রশংসার সুর কিশোরের কণ্ঠে।

'আসল কথাটা তো এখনও বলাই হয়নি। যে তোমাদের ডাকবাক্সে বোমা

রেখে ভয় দেখাতে চেয়েছিল তাকেও খুঁজে বের করেছি আমি!'

নয়

উৎসুক হয়ে শুনছে কিশোর। হুমকি দিয়ে নোটটা যে লিখেছে তাকে কিভাবে সনাক্ত করেছে টম, সেটাও জানাল। 'লেখাটা দেখে তোমার মতই আমারও প্রথমে মনে হয়েছিল ওটা কোনও মেয়ের হাতের লেখা। হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্টকে দেখানোর পর শিওর হয়েছি মেয়েমানুষের লেখাই। এক্সপার্ট জানাল বয়স্ক মহিলার হাতের লেখা। কাগজের ধরন দেখে ধারণা করলাম মহিলা শহরে, মধ্যবিত্ত কোনও এলাকায় বাস করে। আর তাহলে স্থানীয় দোকানে কেনাকাটা করতে আসবেই। ওসব জায়গার দোকানগুলোতে খুঁজতে শুরু করলাম।'

'এবং মহিলার খোঁজ পেয়ে গেলে তুমি?' অবাকই হলো কিশোর।

হাসল টম। 'হ্যাঁ, পেয়ে গেলাম। আমার সঙ্গী অবশ্য একজন ছিল। আমার এক কাজিন। বিভিন্ন স্টোরে খদ্দেরদের ওপর চোখ রেখেছিলাম আমরা। তারপর একদিন পেয়ে গেলাম আমাদের কাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে।'

'আচ্ছা!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কিশোর।

'বয়স্কা মহিলারা কেনাকাটা করে যখনই ক্যাশে আসত, আমি আর আমার কাজিন বোমা হামলা নিয়ে কথা শুরু করে দিতাম। আর আড়চোখে লক্ষ করতাম তাদের প্রতিক্রিয়া,' একটু বিরতি দিল টম।

'তারপর?'

'এক দিন এক সুপার মার্কেটে বোমা হামলা নিয়ে কথা বলছি, দেখলাম এক বৃদ্ধার মুখ সাদা হয়ে গেছে, কাঁপছে সে। বুঝতে পারলাম অবশেষে আসল মানুষটিকে পেয়ে গেছি আমরা। জেরার মুখে স্বীকার করল বুড়ি সে-ই চিঠিটা রেখে এসেছিল তোমাদের ডাকবাক্সে।'

'তুমি সত্যি জিনিয়াস!' উৎসাহ দিল কিশোর। 'বলে যাও।'

'মহিলার নাম মিসেস হ্যাগার্ড। ঘর ভাড়া দিয়ে পেট চালায়। তাদের পাড়ায় অনেকেই ওরকম ঘর ভাড়া দিয়ে চলে। এক দিন মিসেস হ্যাগার্ড তার ঘরের জানালা বন্ধ করতে যাচ্ছে হঠাৎ নিচ থেকে দু'জন লোকের গলা শুনতে পায় সে। গলির মুখে বুড়ির বাড়ি। প্রতিদিন বহু লোক ওই গলি দিয়ে আসা-যাওয়া করে। বুড়ি কাউকে তেমন লক্ষও করে না। তবে ওই লোক দুটোর প্রতি সে কৌতূহলী হয়ে ওঠে তাদের কথাবার্তা শুনে। একজন বলছিল মিস্টার পেইশার কাছ থেকে নাকি নির্দেশ পেয়েছে একজন কিশোর গোয়েন্দা আর তার চাচা মিস্টার পাশাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে হবে।'

'আর কি শুনেছেন মিসেস হ্যাগার্ড?' উত্তেজিত গলায় জানতে চাইল কিশোর।

'ওটুকুই। আর শুনেছে মিস্টার পাশা ব্যবসায়ী, স্যালভিজ ইয়ার্ডের ব্যবসা

আছে। মিসেস হ্যাগার্ড লোক দুটোকে দেখতে পায়নি। সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেরেই তারা চলে যায়। বুড়ি বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেবে কিনা। একবার ভেবেছিল পুলিশে ফোন করবে। পরে আর করেনি।

'তো কি করল মহিলা?'

'সুপার মার্কেটের ক্যাশিয়ারের কাছে খোঁজ নিল শহরে কোন কিশোর গোয়েন্দা থাকে কিনা। যখন শুনল কিশোর পাশা নামে একটা ছেলে আছে যে গোয়েন্দাগিরি করে বেড়ায়, তার চাচা স্যালভিজ ইয়ার্ডের ব্যবসা করে, স্বভাবতই ভেবে অবাক হয়ে গিয়েছিল সে পাশা বনাম পাশার মধ্যে এমন কি বিরোধ থাকতে পারে যার জন্যে একজন অপরজনকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে চায়। পাশাদেরকে মহিলা ভেবেছিল একই পরিবারের লোক।'

'অবশেষে,' বলে চলল টম, 'মিসেস হ্যাগার্ড বেনামে ওই চিঠি লেখার সিদ্ধান্ত নেয়। সে-ই চিঠিটা তোমাদের ডাকবাক্সে রেখেছিল, তারপর বেল বাজিয়ে দ্রুত কেটে পড়েছিল।'

টমের গোয়েন্দাগিরির আবার তারিফ করল কিশোর। তারপর স্কটল্যান্ডে ওর অভিযানের কথা জানাল, বলল পেইশা নামের লোকটার কথা।

'এখন বুঝতে পারছি মিসেস হ্যাগার্ড পেইশা নামটার ভুল উচ্চারণ শুনেছিল,' কিশোর বলল। 'পেইশাকে পাশা শুনেছিল। অথবা পাশাকে পেইশা মনে করেছিল।'

টমকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন নামিয়ে রাখল কিশোর। কি কি কথা হয়েছে জানার জন্যে মুসা আর রবিনের তর সইছে না। ওদেরকে পুরো ঘটনা খুলে বলল কিশোর। শেষে বলল, 'চাচাকে জিজ্ঞেস করব পুলিশকে সমস্ত ঘটনা জানাব কিনা।'

'জানানোর এখনই সময়,' বলল রবিন। 'পেইশা নামের ভয়ঙ্কর লোকটা তোমার ক্ষতি করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। সুযোগ পেলে সে তোমাকে খুন করেও ফেলতে পারে।'

'কিন্তু তোমাকে খুন করতে চাইবে কেন সে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

শ্রাগ করল কিশোর। 'কি জানি। পেইশা লোকটা বোধহয় কোন গুণ্ডাদলের সরদার। হয়তো এমন কোন অবৈধ কাজ সে করছে, চাইছে না আমি বা চাচা তাতে নাক গলাই। হয়তো স্মাগলিং-এর কোন ব্যাপার।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মুসা। 'কোথায় ছোটখাট রহস্য দিয়ে শুরুটা হয়েছিল, এখন এর মধ্যে স্মাগলার, বোমা হামলার মত বিচ্ছিরি জিনিসও ঢুকে বসে আছে। খোদাই জানে সামনে আরও কি আছে!'

ওর বলার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল কিশোর এবং রবিন। কিছুক্ষণ পরে রাশেদ পাশা ঢুকলেন ওদের ঘরে। ডিনার খেতে যাবেন। ওদেরকে নিয়ে নিচে নেমে এলেন। টমের ফোনের কথা চাচাকে জানাল কিশোর। পুলিশে খবর দেয়া উচিত—ওদের সঙ্গে একমত হলেন রাশেদ পাশা। ডিনার শেষে কিশোরই ফোন করল। পুলিশে খবর দিল। এ পর্যন্ত যা যা জেনেছে কোন কিছুই লুকাল না পুলিশের

কাছে। চীফ কনস্টেবল প্রতিশ্রুতি দিল মিস্টার পেইশাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে গ্রেফতার করার চেষ্টা করবেন।

পর দিন সকালে পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে ফোন এল। কিশোরকে যেতে বলা হলো। গেল কিশোর। সুপারিনটেনডেন্ট বললেন, 'এখন পর্যন্ত মিস্টার পেইশার কোন খোঁজ আমরা পাইনি। তবে তোমার কথামত হাউসবোটে গিয়েছিলাম। হাউসবোটের বাসিন্দাদের সম্পর্কে যা যা সন্দেহ করেছ সেগুলো সত্যি হতেও পারে। তবে কাল সন্ধ্যায় গিয়ে হাউসবোটে কাউকে পাইনি। পড়শীরা বলল বিকেলের দিকে নাকি হাউসবোট থেকে অনেকগুলো বড় বড় বাক্স আর প্যাকেজ নামিয়ে ট্রাকে তোলা হয়েছে। হাউসবোটের বাসিন্দারা চলে যাবার আগে টাকা আর চিঠি রেখে গেছে। চিঠিতে লেখা ছিল টাকাটা হাউসবোটের ভাড়া হিসেবে দেয়া হয়েছে। আমরা ওখানে পৌঁছুতে দেরি করে ফেলি। তবে স্কটল্যান্ডের সমস্ত পুলিশকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আমি নিশ্চিত, মিস্টার পেইশা এবং তার সঙ্গী কিম ব্রাগনারকে ধরা পড়তেই হবে।'

পর দিন ওয়াগনার এস্টেটে বিজনেস কনফারেন্স থাকায় সেখানে চলে গেলেন রাশেদ পাশা। ছেলেরা ঠিক করল এডিনবার্গ ক্যাস্‌ল্‌ দেখতে যাবে। ট্যাক্সি ভাড়া করে রওনা হলো পাহাড়ের ওপরের দুর্গ দেখতে।

প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের দুই পাশে সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। একজনের পরনে ঝালরওয়ালা, শক্ত বোতাম লাগানো জ্যাকেট আর মাথায় দুই ফিতেওয়ালা সরু গ্লেনগারি ক্যাপ। অন্য জন পরছে রেজিমেন্টাল ট্রাউজার। গোয়েন্দাদের দেখে দুই সৈনিক হাসল। তিন গোয়েন্দা পাথুরে রাস্তা মাড়িয়ে রাজ প্রাসাদের উঠানে চলে এল।

প্রাসাদে ঘরের সীমা-সংখ্যা নেই। বেশিরভাগ ঘরে পুরানো অস্ত্রশস্ত্র আর রেজিমেন্টাল কোট ঝুলছে। কিশোর লক্ষ করল শোকেসগুলোর বেশিরভাগে ঘাগরা অনুপস্থিত। একজন গার্ড জানাল, ১৭৪৫ সালে, জ্যাকোবাইট বিদ্রোহের সময় বোনি প্রিন্স চার্লি স্কটল্যান্ড থেকে পালিয়ে ফ্রান্সে চলে যান, ক্ষমতায় আসে হাউস অভ হ্যানোভার। ওই সময় থেকে ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডে ঘাগরা পরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

'কাজটা করা হয়েছিল হাইল্যান্ডাররা যাতে স্কটিশ বংশধরদের কথা মনেও না আনে,' বলল গার্ড। 'এ প্রথা দীর্ঘদিন চলেছে। রাজা তৃতীয় রবিন সিংহাসনে বসার পরে আবার ঘাগরা পরার অনুমতি দেন।'

মুসা মন্তব্য করল, 'ঘাগরা পরার অনুমতি পেয়ে ভালই হয়েছে। ঘাগরা পরা পুরুষদেরকে ছবির মত লাগে দেখতে।'

রাজকীয় প্রাসাদের বেশির ভাগটা দেখা শেষ করে, সেন্ট মার্গারেট চ্যাপেল ঘুরে দেখল ওরা। তারপর গেল বিখ্যাত হলিরুড প্যালেসে। এ প্রাসাদের ভীষণ লম্বা, উঁচু আসনের দরবার ঘরে বসে অভিজাতরা স্কটল্যান্ড শাসন করতেন। ওখান থেকে ওরা গেল বিখ্যাত ধর্মযাজক এবং সমাজ সংস্কারক জন নক্সের বাড়িতে। পুরানো, চমৎকার একটা দালানে বাস করতেন জন নক্স। তাঁর বাড়ি বোঝাই প্রচুর

বই, চিঠিপত্র আর ধর্মীয় বক্তৃতার নথিপত্র। রবিন একটা বক্তৃতার কিছু অংশ পড়ে মন্তব্য করল, 'বোঝা যায় ইনি খুব জ্বালাময়ী ভাষণ দিতেন। তবে জন নক্স এখন বেঁচে থাকলে তার টানা দুই ঘণ্টার ধর্মীয় ভাষণ লোকে শুনত কিনা সন্দেহ আছে।'

জন নক্সের বাড়ি দেখে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল ওরা। মুসা বলল তার খুব খিদে পেয়েছে।

সেইন্ট গাইলস ক্যাথেড্রালের পাশে ছোট একটা রেস্টুরেন্ট দেখে ওতে ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা। পেটের কাজটা শেষ করে বেরিয়ে এল। হাঁটা দিল রয়াল মাইলের দিকে। ওদিক থেকে ওরা এসেছে।

মিনিট দুই চুপচাপ হাঁটল ওরা, হঠাৎ রবিন বলে উঠল, 'আমার ধারণা একটা লোক পিছু নিয়েছে আমাদের।'

পলকের জন্যে ফিরে তাকাল কিশোর। লালচুলো, গোঁফওয়ালা একটা লোক সত্যি ওদের পেছন পেছন আসছে। লোকটার মুখে লাল-দাড়ি। পরনে ঘাগরা আর আকাশী নীল বালমোরাল।

'লোকটাকে চেনা চেনা লাগছে,' কিশোর বলল। 'কিন্তু কোথায় দেখেছি মনে করতে পারছি না।'

'ঘুরে চলো সোজা লোকটার দিকে হেঁটে যাই,' ফিসফিস করে বলল রবিন। 'দেখি কি ঘটে।'

একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল তিনজনেই। লোকটা পাশ কাটিয়ে গেল ওদের। মুখটা আরেক দিকে ঘুরিয়ে রেখেছে। কিছুটা রাস্তা যাবার পরে ঘুরল সে। আবার তিন গোয়েন্দার পেছন পেছন আসতে শুরু করল।

'রাস্তা পার হয়ে হলিরুডের দিকে আবার চলো সবাই,' পরামর্শ দিল কিশোর।

রাস্তার বিপরীত দিকে চলে এসেছে ওরা, লাল-দাড়িও পার হলো রাস্তা। আবার হাঁটা ধরল ওদের পেছনে। 'আরে, এ দেখছি কিছুতেই পিছ ছাড়ছে না,' বলল মুসা। 'এখন কি হবে?'

মুচকি হাসল রবিন। লোকটাকে কিশোরের চেনা চেনা লাগলেও চিনতে পারছে না। বলল, 'মনে হয় ছদ্মবেশ ধরেছে। ওর গোঁফ-দাড়ি দুটোই নকল মনে হচ্ছে আমার।'

দশ

'ওর দাড়ি-গোঁফ টেনে দেখতে পারলে হতো,' মুসা বলল।

'তা তো হতোই,' জবাব দিল রবিন। 'কিন্তু যাও না টান দিতে, কষে লাগিয়ে দেবে কয়েক ঘা। পিস্তল বের করলেও অবাক হব না।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'এক কাজ করা যাক। আলাদা হয়ে যাই আমরা। মিলিত হব হলিরুড প্যালেসে। লোকটা একা তিনজনের পিছু নিতে পারবে না।'

'বুদ্ধিটা মন্দ নয়,' মুসা বলল। 'লোকটা তোমার পিছু নিলে আমি আর রবিন ওর পিছু নেব।'

পরিকল্পনাটা ভালই ছিল। গোলমাল হয়ে গেল স্কটিশ ল-কোর্ট বিল্ডিং-এর কাছে এসে। লাল-দাড়ির পেছন পেছন আসছিল মুসা। হঠাৎ মুহূর্তে একটা দালানের মধ্যে ঢুকে পড়ল লোকটা।

বুক ধক করে উঠল মুসার। দৌড় দিল লোকটা যে বিল্ডিং-এ ঢুকেছে, সেদিকে। কিন্তু গেটে দারোয়ান আটকে দিল মুসাকে। 'পাস আছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না।'

'তাহলে তো ভেতরে ঢুকতে পারবে না। আজ বন্ধ। পাস ছাড়া ভেতরে ঢোকা নিষেধ।'

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল মুসার। 'একটু আগে লাল রঙের দাড়িওয়ালা একটা লোককে ঢুকতে দেখলাম। সে কিভাবে ঢুকল?'

দারোয়ান কটমট করে তাকাল মুসার দিকে। 'তার কাছে পাস ছিল বলে ঢুকতে পেরেছে।'

এ লোককে অনুরোধ করেও লাভ হবে না বুঝতে পারল মুসা। গেটের বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ও। কিন্তু লাল-দাড়ির কোন খবরই নেই। লোকটা কি এখানে নিজের কাজে এসেছিল? তাহলে ওদের অনুসরণ করছিল কেন?

অনেক ভেবেও এ প্রশ্নের জবাব মিলল না। হতাশ হয়ে ফিরে চলল মুসা। চলে এল হলিরুড প্যালেসে। কিশোর আর রবিন অপেক্ষা করছিল তার জন্যে।

'কোন খবর আছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল মুসা। যা ঘটেছে খুলে বলল ওদেরকে। 'লোকটা পাস জোগাড় করল কি করে ভাবছি আমি,' রবিন মন্তব্য করল। 'হয় জাল পাস, নয়তো চুরি করা।'

ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে কিশোরের মস্তিষ্কে। লোকটাকে এত চেনা চেনা লাগছিল কেন? কিন্তু চিন্তা করাই সার হলো। কোন উপসংহারে পৌঁছুতে পারল না। 'আমাদের আপাতত আর কিছু করার নেই।'

লাল-দাড়ির চিন্তা বাদ দিয়ে প্রাসাদ দেখার দিকে মনোযোগ দিল তিন গোয়েন্দা। ১১২৮ সালে এটা তৈরি করা হয়। তখন ছিল মঠ। লালচে বাদামী রঙের পাথুরে কাঠামোটা এখনও ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। প্রকাণ্ড দালানটাকে ঘিরে রেখেছে বিরাট এক বাগান আর উঁচু লোহার বেড়া।

ওদেরকে ভেতরে নিয়ে গেল একজন গাইড। প্রতিটা ঘর সুসজ্জিত। জানা গেল গ্রেট ব্রিটেনের বর্তমান রাজ পরিবারের জন্যে প্রাসাদে বড় একটা অ্যাপার্টমেন্ট বরাদ্দ করা আছে। এডিনবার্গে বেড়াতে এলে এখানেই তাঁরা ওঠেন।

ডাইনিং রুম দেখে শিস দিয়ে উঠল মুসা। এত বড় ডাইনিং রুমও হয়! 'বাপরে বাপ! দুই মাথায় দু'জন একসঙ্গে খেতে বসলে কারও কথা কেউ শুনবে না।'

হাসল গার্ড। ওদেরকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিল। একটা ট্যাক্সি নিয়ে তিন গোয়েন্দা চলে এল হোটেলে। রাশেদ পাশা তাঁর কাজ শেষ করে চলে এসেছেন।

চা খেতে খেতে সারাদিন কি কি ঘটেছে তার ফিরিস্তি দিল চাচাকে কিশোর। লাল-দাড়ির কথা শুনে কপালে ভাঁজ পড়ল রাশেদ পাশার। বললেন, 'লোকটার আবার দেখা মিললে পরিচয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করবি।'

'পরের বার সফল হবই,' দৃঢ়কণ্ঠে কিশোর বলল।

রাশেদ পাশা জানালেন তাঁর কনফারেন্স সফলই হয়েছে, তবে কাজ পুরোপুরি শেষ করতে আরও ক'টা দিন থাকতে হবে এডিনবার্গে।

'তোরা এই ফাঁকে ওয়াগনার হাউস থেকে ঘুরে আসতে পারিস,' পরামর্শ দিলেন তিনি। 'লইয়ারদের অফিসে এরিনা হিগিনস নামে একটা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলো। খুব ভাল মেয়ে। ইনভারনেস-শায়ার এলাকাটা নিজের হাতের তালুর মত চেনে। ওর সঙ্গে ঘুরে আয় না।'

এরিনা হিগিনসের সঙ্গে ওই দিনই হোটেলে পরিচয় হলো কিশোরদের। ওদেরই বয়েসী। লম্বা। সুন্দরী। এক মাথা কালো চুল। বড় বড় নীল চোখ। কিশোরের দিকে ফিরে এরিনা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ছবি ফটোগ্রাফিক ইন্টারন্যাশনালের প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছে না?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। 'হ্যাঁ। আর সেজন্যেই তোমাদের দেশের সবার চোখে পড়ে যাচ্ছি আমি।' সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাগুলোর কথা মেয়েটাকে জানাল ও।

এরিনা বলল, 'তবে ইনভারনেস-শায়ারে লোক সংখ্যা কম। ওখানে তোমাকে কেউ বিরক্ত করবে না।'

এক সঙ্গে ডিনার করল ওরা। ওদের সঙ্গে খুব দ্রুত মিশে গেল এরিনা। সে এমনই মেয়ে সবাইকে দ্রুত আপন করে নিতে পারে। ঠিক হলো পরদিন সকালে গাড়ি ভাড়া করে ওয়াগনার হাউস দেখতে যাবে ওরা।

কিশোর ওর রহস্যের কথা বলল এরিনাকে। জানাল রহস্য ভেদ করার চেষ্টা চালাচ্ছে তিন গোয়েন্দা। 'পদে পদে আমাদের বিপদ। কাজেই আমাদের সঙ্গে সত্যি যাবে কিনা ভাল করে ভেবে নাও।'

হেসে উঠল স্কটিশ মেয়েটা। 'বিপদ আর উত্তেজনা আমি খুব পছন্দ করি। কাজেই তোমাদের সঙ্গে না যাবার কোন কারণ নেই।'

এক মহিলা যাচ্ছিল কিশোরদের টেবিলের পাশ দিয়ে, এরিনাকে দেখে হাত নেড়ে অদ্ভুত ভাষায় কি যেন বলল, বুঝতে পারল না ওরা। মহিলা চলে যেতে ব্যাখ্যা করল এরিনা, 'মহিলা গেইলিক ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলেছে।'

'মিষ্টি ভাষা তো!' কিশোর বলল। 'তুমি টানা বলতে পারো?'

'পারি,' বলল এরিনা।

কিশোর বলল, 'তাহলে আমাকে কয়েকটা শব্দ শিখিয়ে দিতে হবে। তবে এখন নয়। পরে। যাবার সময়।'

হাসল এরিনা। 'পরের দরকার কি? এখনই শিখে নাও না,' সে প্লেট থেকে একটা রুটি তুলে নিল। 'একে বলে অ্যারান।'

'অ্যারান মানে রুটি?'

'হ্যাঁ। কাল আমরা লং-এ করে যাব। লং মানে জাহাজ। তবে আমরা যে জলযানটাতে চড়ব সেটা একটা ফেরিবোট।'

কিশোরের হঠাৎ মনে পড়ে গেল 'লং' শব্দটা সে হোটেলের আলমারির ড্রয়ারের কাগজে দেখেছিল। জিজ্ঞেস করল, 'এরিনা, মল কি কোন শব্দ?'

'হ্যাঁ। তবে সঠিক উচ্চারণ হলো মাওল। এর মানে হলো ধীর গতি।'

কিশোর ওর ব্যাগ খুলে নোটবই বের করল। কাগজের সেই অদ্ভুত মেসেজটা লিখল। এরিনা লেখাটা অনুবাদ করে দিল : হাইওয়ে ডিচ লক রড শিপ স্লো ওয়াইফ মেম্বার উইদাউট স্ট্যাম্প। বলল, 'স্ট্যাম্প মানে কোন কিছুর ছাপ বা প্রভাব।'

'আমি এখন শিওর,' কিশোর বলল, 'মেসেজটা আসলেই একটা কোড ছিল। "শিপ স্লো" দিয়ে নিশ্চয় লক লোমোন্ডের ওই হাউসবোটটাকে বোঝানো হয়েছে যেখানে রহস্যময় লোকগুলো থাকত।'

'ঠিক বলেছ,' উত্তেজিত দেখাল রবিনকে। 'মেসেজটা মিস্টার পেইশার জন্যে রেখে দেয়া হয়েছিল। ওই লেখার মানে হতে পারে: কিশোর যদি এসে হাজির হয়, হাউসবোটের অধিবাসীরা যেন মালপত্র নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়ে।'

'এ সব বিবেচনা করে মনে হচ্ছে,' রাশেদ পাশা বললেন, 'বাক্সগুলোতে হয়তো চোরাই মাল ছিল।'

কিশোরও একমত হলো চাচার সঙ্গে। এ সবের পেছনে একটা স্মাগলিং র‍্যাকেট থাকা বিচিত্র নয়। গম্ভীর মুখে বলল, 'যে গাড়িটা আমাদের চাপা দিতে চেয়েছিল মিস্টার পেইশাই ওটার ড্রাইভার ছিল । ধাক্কা দিয়ে রাস্তা থেকে আমাদের ফেলে একটা দুর্ঘটনা ঘটানোর ইচ্ছে ছিল। না পেরে ফিরে গিয়ে তার লোকদের কেটে পড়তে বলেছে।'

রাশেদ পাশা চিন্তিত গলায় বললেন, 'তোদের সন্দেহ সত্য হলে বলতে হয় এ সবের সঙ্গে গেইলিক কোড মেসেজের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক হয়তো সত্যি রয়েছে।'

এগারো

স্থির দৃষ্টিতে গেইলিক কোড মেসেজটার দিকে তাকিয়ে আছে পাঁচজনে–রাশেদ পাশা, তিন গোয়েন্দা ও এরিনা।

অবশেষে এরিনা বলল, 'যে লোক এ কথাগুলো লিখেছে সে ভাষাটার সঙ্গে তেমন পরিচিত নয় বোঝা যায়। কারণ অনেক অশুদ্ধ শব্দ লিখেছে সে। মনে হচ্ছে ডিকশনারি দেখে লিখেছে। তাই সাজিয়ে লিখতে পারেনি।'

রবিন হাসল। 'ওয়াইফ মেম্বার উইদাউট স্ট্যাম্প' কথাটা দেখে ভেবেছিলাম এ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে কোন মহিলা রহস্যটির সঙ্গে জড়িত। ভিনদেশী কেউ, যে এ দেশে বৈধ নয়।'

সপ্রশংস দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকালেন রাশেদ পাশা। 'তোমার ব্যাখ্যা ঠিকও হতে পারে। তোমাদের উচিত চোখ-কান খোলা রাখা, লক্ষ রাখা কোন মহিলা কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে কিনা।'

কিশোর মুচকি হাসল। 'যদি তাই হয় এ ধরনের খেলায় রবিন আমাকে হারাতে পারবে না। আমার ধারণা, মেসেজের প্রথম দুটো শব্দ "হাইওয়ে ডিচ" দিয়ে বোঝানো হয়েছে মিস্টার পেইশা যাতে সুযোগ পেলে ধাক্কা মেরে আমার গাড়ি খাদে ফেলে দেয়।'

'সেই চেষ্টা করেওছিল সে,' মুসা জানাল এরিনাকে।

একটু পরে টেবিল ছাড়ল ওরা। এরিনা সবাইকে শুভ রাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল। পরদিন সকালে, নাস্তার পরে দেখা করবে আবার।

পরদিন সকাল ন'টায় হোটেলে চলে এল এরিনা। কিশোররা চার সীটের একটা কনভার্টিবল ভাড়া করেছে। কিশোর আর তার চাচা গাড়ি ভাড়ার কাগজপত্রে সই করার পরে রেন্ট-আ-কারের লোক চলে গেল। এক পোর্টার গোয়েন্দাদের ব্যাগ তুলে দিল গাড়ির ট্রাঙ্কে। চাচার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ড্রাইভিং সীটে বসল কিশোর। গাড়ি ছেড়ে দিল।

এরিনার নির্দেশ মত গাড়ি চালাচ্ছে কিশোর। উত্তর পশ্চিমে, ফোর্ট উইলিয়াম শহরের দিকে ছুটে চলেছে।

'শুনলাম তোমার বাড়ি আইল অভ স্কাইটে,' এরিনাকে বলল মুসা। 'ভাল লাগে তোমার ওখানে?'

'অবশ্যই,' হাসি মুখে জবাব দিল এরিনা। 'তোমরা দেশে যাবার আগে আমার বাড়িতে একবার এসো। স্থানীয় ইতিহাসের গল্প আর উপকথা শোনাব।'

'এখনই বলো না,' অনুরোধ করল কিশোর। 'আইল অভ স্কাইতে বিখ্যাত কি কি জায়গা আছে?'

'একটা বিখ্যাত জায়গা হলো বোরেরেগ, ওখানে এক সময় ব্যাগপাইপ শেখানোর সবচেয়ে নাম করা কলেজটা ছিল। গোটা হাইল্যান্ড থেকে বাদকরা যেত ওই কলেজে ভর্তি হতে,' বলার সময় চোখ ঝলমল করতে লাগল এরিনার।

'ব্যাগপাইপ শেখানোর জন্য কলেজও ছিল নাকি?' কৌতূহল বোধ করল রবিন।

'ছিল। কয়েক'শ বছর আগে থেকেই ব্যাগপাইপ শেখানোর জন্যে অনেক কলেজ গড়ে উঠেছিল। বোরেরেগের কলেজে ম্যাকক্রিমন শেখানো হতো। অত্যন্ত অভিজাত একটা বিষয়। দুশো বছরেরও বেশি সময় ধরে চলেছে।'

'ব্যাগপাইপের ইতিহাস এত বর্ণাঢ্য জানা ছিল না,' কনভার্টিবলটাকে ঝকঝকে একটা রাস্তা দিয়ে চালাতে চালাতে মন্তব্য করল কিশোর। রাস্তার দু'ধারে ঝোপঝাড়।

'তবে ব্যাগপাইপের ইতিহাসের দাবিদার স্কটিশরা একা নয়,' জানাল এরিনা। 'মিশরে প্রথম ব্যাগপাইপ বাজানো হয় সাধারণ চ্যান্টার আর ড্রোন দিয়ে। পরে ওগুলো জোড়া লাগানো হয় চামড়ার ব্যাগের সঙ্গে এবং জুড়ে দেয়া হয় ব্লো পাইপের সাথে।'

'মিশর!' নাম শুনেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে মুসা। হাসতে হাসতে বলল, 'ভাবা যায় রাজা তুতানখামেন ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছেন?'

হাসল এরিনা। 'তুমি হয়তো এখন কল্পনায় দেখবে অ্যারিস্টোটল এবং জুলিয়াস সিজারও ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছেন। গ্রীক এবং রোমানদের মাঝেও ব্যাগপাইপ বাজানোর রেওয়াজ ছিল। তারপর প্রথাটা কেলটিক আর রোমান হামলার কারণে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।'

'তাই যদি হয় তাহলে ওটাকে স্কটিশ যন্ত্র বলে কেন লোকে?' জানতে চাইল কিশোর।

ব্যাখ্যা করল এরিনা। 'আদি যন্ত্রটা ইউরোপের বিচ্ছিন্ন কোন কোন অঞ্চলে এখনও বাজানো হয়। তবে স্কটিশ হাইল্যান্ডে এর ইতিহাস ভিন্ন। আমাদের দেশের মানুষের ওই পাইপের সুর সাংঘাতিক পছন্দ ছিল। ক্লান্ত মানুষের মাঝে শক্তির সঞ্চার করত ব্যাগপাইপের সুর। তাদের বাদকদের নিয়ে গর্বের অন্ত ছিল না হাইল্যান্ড উপজাতির সর্দারদের।'

'বাজনার কথা শুনতে শুনতে আমার খিদে পেয়ে গেছে,' আচমকা বেরসিকের মত বলে উঠল মুসা। 'খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে ।'

ওর কথা শুনে হেসে উঠল তিনজনেই। এরিনা বলল কাছেই একটা ভাল হোটেল আছে। ওখানে লাঞ্চ করা যাবে।

সুসজ্জিত হোটেলের বিশাল ডাইনিং রুমে ঢুকে পেট পুরে খেল ওরা। তারপর বেরিয়ে পড়ল আবার।

দু'পাশে বনভূমি আর পাহাড় সারির মাঝ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে কিশোর। মাইলের পর মাইল সবুজ তৃণভূমিও চোখে পড়ছে। মাঠে মনের সুখে ঘাস খাচ্ছে গরু-ছাগল আর ভেড়ার দল। খানিক পরে কিশোর লম্বা, সরু একটা জলধারার সামনে এসে পৌঁছুল। এরিনা জানাল এটা লক লেভেনের একটা বাহু বা শাখা।

ছোট্ট গ্রাম বাল্লাহুলিশে ঢোকার পরে এরিনা বল্ল, 'এখান থেকে ফেরিতে চড়ে ইনভারনেস-শায়ারে ঢুকব। গাড়িতে গেলে লক লেভেনের শাখা ঘুরে যেতে হবে। অনেক সময় লাগবে।'

ফেরিঘাটে সবার আগে কিশোরের গাড়ি পৌঁছুল। একটু পরে অন্যান্য যানবাহন আসতে শুরু করল। ফেরির চেহারাও দেখা গেল কয়েক মিনিট বাদে।

ছোট, সমতল একটা ডেক আছে ফেরিতে। ফেরি চালক এবং তার সহযোগীর জন্যে ছোট্ট একটা কেবিনও আছে। নদীতে তীব্র স্রোত। জেটিতে বাঁধা

হলো ফেরি। গ্যাঙ প্ল্যাঙ্ক বেয়ে প্রথমেই উঠল কিশোরের গাড়িটা। তারপর পর পর আরও তিনটা গাড়ি। আর জায়গা নেই। ছেড়ে দিল ফেরি।

'দারুণ, না!' নদীর বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিতে নিতে মন্তব্য করল মুসা।

শাখা নদীর ওপারে পৌঁছুতে বেশি সময় নিল না ফেরি। তীরে পৌঁছার পরে গ্যাঙ প্ল্যাঙ্ক আবার নামিয়ে দেয়া হলো। ফেরি চালক ইশারা করল কিশোরকে ড্রাইভ করতে। তীর ঘেঁষা খোয়া বিছানো রাস্তা, দু'ধারে কোন রেলিং নেই, দু'পাশেই, নিচে নলখাগড়ার ঝোপ মুখ উঁচিয়ে আছে।

'সাবধান!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

কিশোর গাড়ির আয়নার দিকে তাকাল এক ঝলক। পেছনের গাড়িটা স্টার্ট নিয়েছে। ড্রাইভারের সীটে বসা সেই লাল-দাড়ি। পেছন থেকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে বসল সে। কিশোরের হাতে ঝাঁকি খেল স্টিয়ারিং হুইল। সে কিছু করার আগেই ধাক্কার চোটে শূন্যে উঠে গেল ওদের কনভার্টিবল গাড়ি।

ঝাঁকি খেয়ে কনভার্টিবলের যাত্রীরা ছিটকে পড়ে গেল পানিতে, শুধু কিশোর ঝুলে রইল হুইলের সঙ্গে, নিজের সীটে। খাড়াভাবে গাড়িটা পড়ল চার ফুট গভীর পানিতে।

দৃশ্যটা দেখে হায় হায় করে উঠল সবাই। থেমে গেল অন্যান্য গাড়ি, লোকজন ছুটল ওদেরকে রক্ষা করতে। সম্পূর্ণ কাকভেজা হয়ে, গায়ে কাদা মাখা অবস্থায় তীরে উঠে এল মুসা, রবিন এবং এরিনা। কিশোরের কোমর পর্যন্ত ভিজে গেছে।

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল একজন লোক। হ্যাঁচকা টানে জুতো-মোজা খুলে প্যান্টের নিচের অংশ হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে নিল সে। তারপর লাফ দিয়ে নামল পানিতে। সাঁতার কেটে চলে এল কিশোরের কাছে।

ভয় কেটে গেছে কিশোরের, তবে এখনও অল্প অল্প কাঁপছে। লোকটার বাড়ানো হাত ধরল ও। 'থ্যাংক ইউ!' তারপর নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল, 'কিন্তু গাড়িটাকে পানি থেকে তুলি কিভাবে?'

'পানি থেকে তুললেও ও গাড়ি এখন আর চালাতে পারবে না তোমরা,' হাসল স্কটিশ লোকটা। 'তবে তোমাদের গাড়ি তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করছি আমি। কয়েকজন মিলে হাত লাগালেই হয়ে যাবে। বেশি ভারী নয় গাড়িটা।'

এ ভাবে সাহায্য করার জন্যে লোকটাকে আবারও ধন্যবাদ দিল কিশোর। বলল, 'তবে আপনাকে আর পেরেশানি করতে চাই না। এদিকে রেকার পাওয়া যাবে গাড়িটা তোলার জন্যে?'

'তা পাওয়া যাবে,' বলল লোকটা। 'তোমরা বললে আমি একটা জোগাড় করে দেয়ার চেষ্টা করতে পারি।'

'পারলে খুব ভাল হয়,' বিনীত সুরে কিশোর বলল।

ওদিকে বাকি তিনজন রাগে গজগজ করছে। বিশেষ করে মুসা। 'লাল-দাড়ি শয়তানটার জন্যেই এ অঘটনটা ঘটল!' ফুঁসে উঠল সে।

এমন সময় এক মহিলাকে ডকে উঠে আসতে দেখা গেল। ওদের দিকে

তাকিয়ে মিষ্টি হাসলেন তিনি। নিজের পরিচয় দিলেন মিসেস কারগুনার বলে।

'তোমরা কেউ আহত হওনি দেখে স্বস্তি বোধ করছি,' বললেন তিনি। 'গাড়িটার জন্যে অবশ্য খারাপই লাগছে। আমার গোলাবাড়িটা এখান থেকে দূরে নয়···বেন নেভিস পাহাড়ের ঠিক নিচে। আমি একা থাকি। তোমরা আজকের রাতটা আমার সঙ্গে কাটালে খুশি হব। কাল সকালে যেখানে যাবার যেয়ো। অবশ্য কাল সকালের আগে তোমাদের গাড়ি ঠিক হবে কিনা সন্দেহ।'

মহিলার বদান্যতার জন্যে তাকে ধন্যবাদ দিল ওরা। মুসা বলল, 'আপনার বাড়ি যেতে আপত্তি নেই আমাদের। তবে আগে আমাদের বন্ধুকে জিজ্ঞেস করতে হবে,' কিশোরকে দেখাল সে।

ফেরির অন্যান্য গাড়িগুলো ফেরি পার হতে শুরু করেছে। জেটি থেকে বেরোনোর পথে দাঁড়িয়ে রইল রবিন। একেকটা গাড়ি যাচ্ছে আর ড্রাইভারকে হাত তুলে থামিয়ে জিজ্ঞেস করছে অ্যাক্সিডেন্ট যে ঘটিয়েছে ওই লোকটাকে দেখেছে কিনা কিংবা লাইসেন্স নম্বর টুকেছে কিনা। কেউই 'হ্যাঁ' বলতে পারল না।

অ্যাক্সিডেন্ট দেখে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। কেউ লক্ষ করেনি কে কাণ্ডটা ঘটিয়েছে। তবে একজন বলল অপকর্মের হোতা অ্যাক্সিডেন্ট করেই গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে।

কিশোরকে ইতিমধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে তীরে। 'আমি ঠিক আছি,' বন্ধুদেরকে আশ্বস্ত করল সে। মিসেস কারগুনারের দাওয়াতের কথা শুনে বলল, 'আপনার বাড়িতে বেড়াতে পারলে ভালই লাগবে আমাদের।'

যে লোকটা কিশোরকে তীরে উঠতে সাহায্য করেছে সে গাড়ির ট্রাঙ্ক খুলে ওদের ব্যাগগুলো নিয়ে এল। এয়ারটাইট কমপার্টমেন্ট বলে ব্যাগ-ট্যাগের কোন ক্ষতি হয়নি। শুধু সুটকেসগুলো সামান্য ভিজে গেছে। জেটিতে তোলা হলো সবগুলো ব্যাগ আর সুটকেস। জেটির লোকজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওগুলো বয়ে নিয়ে এল তীরে।

মিসেস কারগুনার আগ্রহ নিয়ে লক্ষ করছিলেন কিশোরকে। এরিনার দিকে ফিরে গেইলিক ভাষায় কি যেন বললেন। জবাবে হাসল এরিনা। কিশোরকে বলল, মিসেস কারগুনার জানতে চাইছেন পত্রিকার পাতায় যে কিশোর গোয়েন্দার ছবি তিনি দেখেছেন সেই ছেলেটি আর কিশোর একই লোক কিনা।

হাসল কিশোর। 'কাদা মেখে ভূত হয়ে গেছি। তারপরও আমাকে চিনে ফেলেছেন।'

রেকারে করে সরিয়ে নেয়া হলো কিশোরদের কনভার্টিবল। মিসেস কারগুনার ওদেরকে নিয়ে পা বাড়ালেন নিজের গাড়ির দিকে। লাগেজগুলো বনেটে রাখা হলো। তারপর পাঁচজন চড়ে বসল গাড়িতে।

মিসেস কারগুনারের গোলাবাড়ি একতলা একটা বিল্ডিং। তাতে অনেকগুলো ঘর। ওদেরকে দুটো বেডরুম দেখিয়ে দিলেন মিসেস কারগুনার। মস্ত বিছানা পাতা। ওপরে পেতে রাখা হয়েছে রঙিন চাদর, পায়ের কাছে ভাঁজ করা কম্বল। কিশোরদের তিনজনকে একটা ঘরের বিছানা ভাগ করে নিতে হলো। আর এরিনা

মেয়ে বলে আলাদা একটা ঘর পেল।

গোসল-টোসল সেরে, ধোয়া জামা-কাপড় পরে যখন ফ্রেশ হয়ে নিল ওরা, ততক্ষণে রাতের খাবার রেডি করে ফেলেছেন মিসেস কারগুনার। প্রথমে পরিবেশন করা হলো পেঁয়াজের সুপ, সাথে সেদ্ধ করা মুরগী। তারপর এল ভেড়ার মাংসের স্টু—আলু আর সাদা শালগম মেশানো। সেই সঙ্গে বাঁধাকপির তরকারী। রুটি তো আছেই। সবশেষে ধোঁয়া ওঠা ব্রেড পুডিং, তাতে কিশমিশ এবং কাস্টার্ড সস মেশানো।

'দারুণ খেলাম,' মস্ত ঢেকুর তুলল মুসা। 'গলা পর্যন্ত ভরে গেছে। এ রকম যদি মাত্র দুই বেলা খাওয়ান, চিরকাল থেকে যাব আপনার বাড়িতে।'

হাসলেন মিসেস কারগুনা। 'তোমরা তো এখনও ট্রিকল ডোডিই খাওনি।' এক বয়াম বাদামী রঙের, আঠাল ক্যান্ডি নিয়ে এলেন মিসেস কারগুনার। মিষ্টি ওরা সবাই পছন্দ করে। কাজেই খেতে আপত্তি করল না কেউ।

খাওয়ার পরে প্লেট-বাসন মাজতে মিসেস কারগুনারকে সাহায্য করল চারজনেই। তারপর ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে গল্পগুজব করল খানিকক্ষণ। শেষে শুভরাত্রি জানিয়ে যে যার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

গভীর রাতে হঠাৎ ব্যাগপাইপের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। দূর থেকে আসছে। সুরটা শুনেই চিনে ফেলল। স্কটস হোয়া হেই বাজাচ্ছে কেউ। তবে সুরটা বেসুরো।

এত রাতে কে বাঁশি বাজায় দেখার জন্যে আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নামল কিশোর। দ্রুত পরে নিল জামা কাপড়, তারপর পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল বাইরে।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ হাসছে। ভারী কুয়াশার চাদরে ঢাকা প্রকৃতি। তবে কিশোর নিশ্চিত দূরের কোনও পাহাড় থেকে আসছে বাঁশির শব্দ।

গোলাবাড়ির সামনে, একটা বেঞ্চিতে বসে বাঁশি শুনবে বলে ঠিক করেছে কিশোর, এমন সময় একটা ট্রাক আসতে দেখল বাড়ির দিকে। বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে সগর্জনে ছুটে গেল ওটা। কিশোর শুনতে পেল ট্রাকের ভেতর থেকে ভেড়া ডাকছে।

ভেড়া! ট্রাক!

টমের কথা চট করে মনে পড়ে গেল কিশোরের। ও বলেছিল স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ডে ইদানীং খুব বেশি ছাগল আর ভেড়া চুরি যাচ্ছে।

এই ট্রাকটা কি ভেড়াচোরদের দলের কারও?

বারো

কিশোর ছুটে গেল সামনে, চোখ কুঁচকে ট্রাকের লাইসেন্স নম্বর পড়ার চেষ্টা করল।

সেই মুহূর্তে ট্রাকটাকে চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য করে দিল দুই ছায়ামূর্তি। দৌড়ে আসছে তারা। ওদের জন্যে দ্রুত ধাবমান ট্রাকটাকে আর দেখতেই পেল না কিশোর।

কাছে এসে দাঁড়াল মুসা আর রবিন।

'কিশোর, তুমি আমাদেরকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ,' অভিযোগ করল মুসা। 'দরজা খুলে বেরোনোর শব্দ পেলাম। তারপর আর ফিরে আসছ না দেখে মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। এখানে কি করছ?'

কিশোর দ্রুত ঘটনাটা জানাল ওদেরকে।

'ভেড়াচোর!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

কিশোর কিছু বলার আগেই হঠাৎ দূরে শিস দিল কে যেন। কয়েক সেকেন্ড বিরতি। আবার শোনা গেল শিসের শব্দ। এভাবে বিরতি দিয়ে এক মিনিট ধরে চলল শিস দেয়া।

'ওটা আবার কি?' অবাক হলো মুসা।

কিশোর বলল, 'ব্যাগপাইপের শব্দ।'

'ব্যাগপাইপে শিস দেয়া যায় জানতাম না তো,' বলল মুসা।

'নাকি কেউ কোন সঙ্কেত দিচ্ছে?' রবিনের প্রশ্ন।

'কি জানি,' চিন্তিত গলায় কিশোর বলল। হাঁটা দিল বাড়ির দিকে।

মিসেস কারগুনার এবং এরিনা দু'জনেই ঘুমে বিভোর। এত কিছু ঘটে গেছে টেরই পায়নি। পরদিন সকালে ব্যাগপাইপ আর ট্রাকে করে ভেড়া পাচার হবার ঘটনা ওদেরকে খুলে বলল কিশোর। এরিনা বলল চ্যান্টারের রীড দিয়ে যে কোন সুর তোলা সম্ভব। সেটা শিসের মতও হতে পারে।

'কিন্তু কে শিস দিল, কেন দিল, কিছুই মাথায় ঢুকছে না আমার,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল এরিনা।

জবাবে কিশোর কিছুই বলল না। ওর খুঁতখুঁতে গোয়েন্দামন বলছে গভীর রাতে শিস বাজানোর পেছনে নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কারণ আছে। কারণটা কি খুঁজে বের করতে হবে।

ট্রাকে করে ভেড়া পাচার হবার সম্ভাবনার ব্যাপারে কিশোরদের সাথে একমত মিসেস কারগুনার। তিনি তাড়াতাড়ি ফোন করে পড়শীদের জানিয়ে দিলেন গতরাতের ঘটনা। তারপর কিশোরদেরকে বললেন, 'রাখালরা এক্ষুণি তাদের কুকুর নিয়ে ভেড়াচোরদের খোঁজে বেরিয়ে পড়বে। তোমরা যাবে নাকি দেখতে?'

'এ সুযোগ পেলে কে ছাড়ে?' কিশোর বলল। 'ভাল কথা। পুলিশে খবরটা দেয়া উচিত না?'

মিসেস কারগুনার বললেন, 'উচিত। তবে চোরেরা কখনও এক জায়গায় দু'বার চুরি করতে যায় না। ট্রাকটাকে যেহেতু তুমি ভাল করে লক্ষই করতে পারোনি কাজেই মনে হয় না পুলিশকে জানিয়ে কোন লাভ হবে। আন্দাজে ভর করে পুলিশ কিছু করতে পারবে বলে ভরসা হয় না।'

রবিন বলল, 'কিশোর, তুমি তো শুধু একবার ভেড়ার ডাক শুনতে পেয়েছ।

এমনও তো হতে পারে ট্রাকের ভেতর ওই একটাই ভেড়া ছিল।'

কিশোরও একমত হলো, তা হতে পারে। ওই ট্রাকে যে সত্যি ভেড়া পাচার হচ্ছিল সে-ব্যাপারে নিশ্চিত নয় ও। কারণ নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ তার হাতে নেই।

নাস্তা সারার পরে মিসেস কারগুনার কিশোরদেরকে পথ বাতলে দিলেন কোন দিকে গেলে মেষপালক আর তাদের কুকুরগুলোর দেখা মিলবে।

ওরা বেরিয়ে পড়ল। একটা পাহাড়ের ধারে এসেছে, দেখল এক মেষপালক, পরনে শিকারীর পোশাক, কুকুর নিয়ে যাচ্ছে। কুকুরটা ভেড়াগুলোকে ছত্রভঙ্গ হতে দিচ্ছে না। কেউ দলছুট হবার চেষ্টা করলেই তাকে তাড়িয়ে নিয়ে পালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এরিনা জানাল এটাকে ইংরেজীতে বলে শেডিং।

কিশোররা খুব মজা পেল দৃশ্যটা দেখে। কি চমৎকার ভাবে ভেড়ার দলটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে কুকুরটা। কোন ভাবেই ছত্রভঙ্গ হতে দিচ্ছে না। কেউ সে চেষ্টা করলে খ্যাঁক খ্যাঁক করে ছুটে যাচ্ছে তার দিকে। এক রকম কানে ধরে বাধ্য করছে পালের সঙ্গে মিশে থাকতে।

ভেড়ার লেজে লাল রঙের ফুটকি দেখে এরিনার কাছে জানতে চাইল মুসা ওগুলো কি।

'ওই চিহ্ন দিয়ে যে যার ভেড়ার পালকে চিনে রাখে মেষপালকরা,' জবাব দিল এরিনা। 'কারও ভেড়ার লেজে থাকে লাল দাগ, কারওটা নীল।'

মেষপালকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল ওরা। লোকটা গর্বের সাথে জানাল এ তল্লাটে তার কুকুরটাই সেরা। 'ভেড়া খুব ভাল চেনে আমার ডারবি। যে কোন ভেড়াকে দলের মধ্যে থেকে ধরে নিয়ে আসতে বলি, নিয়ে আসবে। এজন্যে কয়েকবার পুরস্কারও জিতেছে ও। দেখবে?'

'অবশ্যই,' এক যোগে বলে উঠল ওরা।

ওদেরকে ভেড়ার পাল থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল মেষপালক। তারপর পালের মধ্যে ঢুকে একটা ভেড়ার মাথায় হাত রাখল। এবার ফিরে এল কিশোরদের কাছে।

'ডারবি,' তার কুকুরটাকে ডাকল সে। 'ওই ভেড়াটাকে ধরে নিয়ে আয় তো।'

রকেটের গতিতে ছুটল ডারবি। ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল ভেড়ার পালের মধ্যে। তারপর কোনটার গায়ে মৃদু ধাক্কা দিল, কয়েকটার পায়ে গুঁতো মারল নাক দিয়ে। ভেড়াগুলো ধাক্কা আর গুঁতো খেয়ে দুপাশে সরে গেল। পালের মাঝখানে তৈরি হয়ে গেল একটা রাস্তা। নির্ধারিত ভেড়াটাকে তাড়া করল তখন ডারবি। ভেড়াটা তাড়া খেয়ে ছুটল। চলে এল মেষপালকের কাছে। সম্পূর্ণ ঘটনা ঘটতে সময় নিল এক মিনিটেরও কম।

'দারুণ,' হাততালি দিল কিশোর।

হঠাৎ জ্যাকেটে টান পড়তে নিচে চেয়ে দেখে ছুটে আসা ভেড়াটা ওর জ্যাকেটের একটা বোতাম চিবুতে শুরু করেছে। দৃশ্যটা দেখে হেসে ফেলল কিশোর। জ্যাকেট ছাড়িয়ে নিল ভেড়ার মুখ থেকে।

মেষপালকও হাসল। 'লোকে বলে ছাগলে কি না খায়। আমি বলি ভেড়ায় কি

না খায়। কোন কিছুতেই ওদের অরুচি নেই।'

মেষপালককে ওরা ধন্যবাদ দিল মজার একটা খেলা দেখানোর জন্য। তারপর ফিরে এল মিসেস কারগুনারের বাড়িতে। মিসেস কারগুনার জানালেন আগের রাতে কাছের এক খামার থেকে অনেকগুলো ভেড়া চুরি হয়ে গেছে।

'অনেকগুলো?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'তুমি যে ট্রাকটা দেখেছ তার মধ্যে অনেকগুলো ভেড়ার জায়গা কি হবে, কিশোর?'

'তা হবে,' কিশোর বলল। 'আমার ধারণা, ভেড়াগুলোকে ওষুধ খাইয়ে বা ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে ট্রাকে তোলা হয়েছিল। একটা ভেড়ার হয়তো ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ওটারই ডাক শুনেছি আমি।'

'কি নিষ্ঠুর লোক!' শিউরে উঠল রবিন।

মিসেস কারগুনারের চেহারা কঠোর দেখাল। 'চোরের মনে কি আর দয়ামায়া থাকে?' কিশোরের দিকে ফিরলেন তিনি। 'তবে তোমার কথায় যুক্তি আছে, কিশোর। পুলিশকে জানানো দরকার।'

'পুলিশ হয়তো আমার যুক্তি অবাস্তব বলেই উড়িয়ে দেবে,' কিশোর বলল। 'এখনই পুলিশকে জানিয়ে কাজ নেই। আগে হাতে প্রমাণ পাই। তারপর খবর দেবেন।'

এমন সময় বেজে উঠল ফোন। মিসেস কারগুনার ফোন ধরলেন। দু'একবার হুঁ-হ্যাঁ করে রেখে দিলেন। কিশোরকে বললেন, 'তোমাদের গাড়ি রেডি। তবে তোমরা আরও ক'টা দিন থেকে গেলে ভাল লাগত আমার। কিন্তু জোর করেও লাভ হবে না জানি। চলো, তোমাদেরকে গ্যারেজ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।'

বিদায় নেয়ার সময় মিসেস কারগুনারকে টাকা সাধতে গিয়ে বিপাকে পড়ে গেল কিশোর। কিছুতেই টাকা নেবেন না তিনি। অতিথিদের কাছ থেকে একটা পয়সাও নিতে পারবেন না সাফ সাফ জানিয়ে দিলেন। গ্যারেজেও একই ঘটনা ঘটল। গাড়ির মিস্ত্রি শত সাধাসাধিতেও টাকা নিল না। তার এক কথা, কিশোররা তাদের অতিথি। আর তাদের দেশে বেড়াতে এসে যে ওরা অ্যাক্সিডেন্টের শিকার হয়েছে এটাই বরং হাইল্যান্ডারদের জন্যে লজ্জার ব্যাপার। তার ওপর আবার অতিথিদের কাছ থেকে সামান্য গাড়ি মেরামতির জন্যে পয়সা নেয়া? প্রশ্নই ওঠে না।

কিশোর টাকা দেয়ার জন্যে জোরাজুরি করছে দেখে এরিনা কানে কানে বলল, 'আর কিছু বোলো না। তাহলে এরা অপমান বোধ করবে।'

মিসেস কারগুনার বিদায় বেলায় কিশোরের হাত ধরে বললেন, 'চুরি যাওয়া ভেড়ার রহস্য যদি সমাধান করতে পারো তাহলেই আমাদের অনেক পাওয়া হবে।'

গাড়িতে চড়ে বসল ওরা। এখন ওটা চকচক করছে। ফোর্ট উইলিয়ামের রাস্তা ধরল ওরা। শহরে পৌঁছে দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখল আগে তারপর হোটেলে ঢুকল লাঞ্চ করতে।

লাঞ্চ শেষে এরিনা একটা মিউজিয়ামে নিয়ে গেল ওদেরকে। দেখার মত অনেক কিছুই আছে সেখানে। তবে ওদের সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করল একটা

অদ্ভুত কায়দায় আঁকা ছবি।

ছোট্ট, গোলাকার তৈলচিত্রটা একটা টেবিলের ওপর চিৎ করে রাখা। সরাসরি তাকালে মনে হয় কিছু এলোমেলো রঙের ছোপ। ছবির মাঝখানে খাড়া করে রাখা সিলিন্ডারের মত একটা টিউব। সিলিন্ডারের গায়ে আয়না বানানো। সেই আয়নার ভেতরে ছবির প্রতিবিম্ব পড়ে। ওটার দিকে তাকালে তবে গিয়ে ছবিটা বোঝা যায়। জর্জিয়ান কাপড় পরা এক সুদর্শন তরুণের ছবি।

'উনি আমাদের বিখ্যাত বোনি প্রিন্স চার্লি,' জানাল এরিনা। 'রাজা দ্বিতীয় জেমসের নাতি, ওল্ড প্রিটেন্ডারের ছেলে, যিনি ফ্রান্সে নির্বাসনে চলে গিয়েছিলেন। ১৭৪৫ সালে তরুণ চার্লস ফিরে আসেন স্কটল্যান্ডে। হাইল্যান্ডারদেরকে জড়ো করেন তাঁর পতাকার নিচে। কালুডেন মূরের যুদ্ধে করুণ পরাজয় ঘটে তাঁর। পালিয়ে চলে যান পাহাড়ে।

'স্কটল্যান্ডের অনেকেই পছন্দ করত প্রিন্সকে। চাইত যুদ্ধে জিতে সিংহাসনে আবার বসবেন। এদের একজন ছিলেন ফ্লোরা ম্যাকডোনাল্ড। তিনি রাজপুত্রকে তাঁর পরিচারিকার ছদ্মবেশে ফ্রান্সে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন।'

'দারুণ রোমান্টিক তো!' বিড়বিড় করল মুসা। 'প্রিন্স কিন্তু দেখতে সত্যি সুন্দর!'

হাসল এরিনা। 'হ্যাঁ। তবে ইতিহাস বলে বাহান্ন বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন তিনি।'

'তারমানে তিনি বুঝিয়ে দিলেন বিয়ে করার জন্যে বয়স কোন বাধা নয়,' বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মুসা।

ওর ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল রবিন।

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে আসছে ওরা, এরিনা বলল, 'তোমরা তো এখন ওয়াগনার হাউসে যাবে। কাজেই আমার ডিউটি শেষ। আমি এখন বাড়ি ফিরে যাই?'

কিন্তু কিশোররা কেউই ওকে ছাড়তে চাইল না।

'খুব বেশি তাড়া না থাকলে থাকো না আমাদের সঙ্গে,' কিশোর বলল। তুমি সঙ্গে থাকলে ভাল লাগবে। গোয়েন্দাগিরিতেও সুবিধে হবে।'

'গোয়েন্দাগিরির কথা যখন তুললেই, আর আপত্তি করি কিভাবে? থেকেই যাই,' বলল এরিনা। 'আগেই বলেছিলাম উত্তেজনা ভালবাসি আমি। তা ছাড়া লেডি ওয়াগনারের সঙ্গে সাক্ষাতের লোভটাও সামলাতে পারছি না।'

'আমিও না,' কিশোর বলল।

কথাটা বলার পরই ওর হার্টবিট যেন বেড়ে গেল। অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসে উপস্থিত। যাঁকে নিয়ে এত গল্প শুনেছে কিশোর, তাঁর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত দেখা হতে যাচ্ছে ওর।

তেরো

মেইন রোডে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল ওরা। লাঞ্চ করার জন্যে থামল একটা ছোট হোটেলে। গ্রাম্য, একটা মেঠো পথের ধারে হোটেলটা। ওরা এখন গ্রামে প্রবেশ করেছে। এদিকে ছোট-বড় অনেক পাহাড়। খাওয়া দাওয়া সেরে আবার যাত্রা শুরু হলো। এদিকের রাস্তাঘাট বেশ সরু। পাশাপাশি দুটো গাড়ি চলা দায়। ঘাবড়ে গেল কিশোর।

'বিপরীত দিক থেকে গাড়ি এলে তো বিপদে পড়ে যাব আমরা,' শঙ্কিত গলায় বলল সে। অ্যাক্সিডেন্টের ভয় পাচ্ছে। একবার অ্যাক্সিডেন্ট করার পর থেকে ভয়ে ভয়ে আছে।

ওকে অভয় দিল এরিনা। রাস্তার পাশের মেঠো পথ দেখিয়ে বলল, 'স্কটল্যান্ডের সরু রাস্তার পাশে এ রকম মেঠো পথ অনেক আছে। বিপরীত দিক থেকে গাড়ি এলেও ক্ষতি নেই। চট করে মেঠো পথে উঠে যাওয়া যাবে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। মনোযোগ দিল প্রকৃতির প্রতি। গ্রাম এমনিতেই পছন্দ করে ও। আর স্কটল্যান্ডের গ্রামগুলোর নিসর্গের তুলনা নেই।

রাস্তার ধারে হলুদ রঙের অসংখ্য ফুল ফুটে আছে। ওদিকে এরিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করল মুসা। 'ভারী সুন্দর তো! কি ফুল ওগুলো?'

'ওগুলোর নাম গোর্স,' এরিনা জানাল। 'সারা বছরই এ ফুল ফোটে স্কটল্যান্ডে। প্রবাদ আছে গোর্স ফোটা বন্ধ হলে চুমুও অদৃশ্য হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে।'

হাসল তিন গোয়েন্দা। কি অদ্ভুত বিশ্বাস। তবে বিশ্বাসটা খুব রোমান্টিক মনে হলো ওদের কাছে।

বিকেল চারটের দিকে এরিনা ঘোষণা করল তারা ওয়াগনার হাউসের একদম কাছে চলে এসেছে। একটা খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল গাড়ি। তবে পাহাড়ের চূড়াটা সমতল। দূর প্রান্তে প্রকাণ্ড একটা বাড়ি দেখতে পেল ওরা। বাড়িটাতে অনেকগুলো চিমনি। দূর থেকেই সবুজ ঘাসে ছাওয়া জমি আর ডুমুর, বীচ এবং সিলভার বার্চের সারি নিয়ে ফুটে উঠতে লাগল অপূর্ব প্রাকৃতিক ছবি।

প্রাসাদোপম বাড়িটা সুন্দর একটা বাগান দিয়ে ঘেরা। বাগানে নাম না জানা অনেক ফুল ফুটে আছে। বাড়ির একপাশে ছোট একটা পুকুর। পুকুরের চার ধারে ডগলাস আর ফার গাছ।

'ওহ্, অপূর্ব!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'এখানে থাকতে পারলে আর কিছু চাইতাম না।'

এরিনা জানাল, বছরের এ সময়টাতে এদিকটা এ রকম সুন্দর করে সাজিয়ে তোলে প্রকৃতি। তবে শীতকালে চেহারা ভিন্ন। তখন শুধু হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস

বইতে থাকে, আবহাওয়া থাকে বিষণ্ন, সেঁতসেঁতে।'

'কিন্তু তুমি তো এ পরিবেশেই অভ্যস্ত,' রবিন বলল।

'হাইল্যান্ডে থাকলে তুমিও এ রকম পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে,' জবাব দিল এরিনা। 'আর অভ্যস্ত না হতে পারলে শীতের সময় থাকতেই পারবে না। নিজেকে ভীষণ একা আর মনমরা লাগবে।'

ধূসর, পাথুরে দালানটার মেইন গেটে গাড়ি থামাল কিশোর। বাড়িটায় অসংখ্য ছোট ছোট কাঁচের জানালা।

গুনতে শুরু করল মুসা। ত্রিশ পর্যন্ত গুনেছে, এমন সময় খুলে গেল সদর দরজা। বেরিয়ে এল এক লোক। বাটলার।

খুব বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'আপনাদের দেখে খুব খুশি হলাম।' কিশোরদেরকে সেন্টার হল-এর দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলল সে, 'আপনাদের আসার খবর এখুনি জানিয়ে আসছি মিসেস ওয়াগনারকে।'

উঁচু ছাতওয়ালা লিভিংরুমে ওদেরকে বসতে দিয়ে চলে গেল বাটলার। চাচার কাছে ওয়াগনার হাউসের চাকচিক্যের কথা শুনেছে কিশোর, কিন্তু কল্পনাও করেনি এমন রাজকীয় হবে বাড়িটা। মেঝেতে বহুদামী কার্পেট পাতা। আসবাবগুলো ওক কাঠের। ছোট ছোট চেয়ার-টেবিলগুলো ফ্রেঞ্চ গিল্ট করা। দুটো প্রকাণ্ড জাপানি ল্যাম্প চোখে পড়ল কিশোরের। গায়ে ছবি আঁকা। অপূর্ব দেখতে। ঘরের পেছনে একটা বড় ট্যাপেস্ট্রি ঝুলছে। ওতে এক তরুণীকে দেখা যাচ্ছে। বাতাসে ফুলে উঠেছে তার আলখেল্লার মত পোশাক, মাথায় ঘোমটা। ছবিতে তরুণী প্রাসাদের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে বর্শা হাতে যুদ্ধরত দুই নাইটকে।

'পুরানো দিনের সেই দৃশ্য,' বিড়বিড় করল রবিন। 'সুন্দর!'

কিছুক্ষণ পরে লিভিংরুমে ঢুকল বাটলার। জানাল লেডি ওয়াগনার ওদেরকে দোতলায় যেতে বলেছেন। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল বাটলার। কার্পেট মোড়া সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল ওরা। সিঁড়ির ল্যান্ডিংটাও ছোটখাট একটা ঘরের মত। এদিকের দেয়ালে অনেকগুলো তৈলচিত্র ঝোলানো, ওয়াগনারদের মৃত বংশধরদের ছবি। বাটলার ওদেরকে সুসজ্জিত একটা লিভিংরুমে নিয়ে এল, লেডি ওয়াগনারের ঘরের বাইরে ঘরটা। ভেতরে ঢুকল বাটলার। লেডি ওয়াগনারকে বলল তাঁর অতিথিরা চলে এসেছে।

'ধন্যবাদ, হেনরি,' মিষ্টি এবং জোরালো একটা কণ্ঠ শুনতে পেল ওরা দরজার বাইরে থেকে।

বাটলারের নাম তাহলে হেনরি। ভাবল কিশোর।

কিশোরই আগে ঢুকল ঘরে। তাকাল ঘরের বাসিন্দাটির দিকে।

ভদ্রমহিলার মাথার চুল যেন কাশ ফুল, ধবধব করছে। দুর্বল, রোগা শরীর। তবে চেহারাটা ভারী সুন্দর। আভিজাত্য ঠিকরে পড়ছে তাঁর গোটা অবয়ব থেকে।

নাটকীয় বিনীত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'লেডি ওয়াগনার, আমি আপনার এখানে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধা। মৃদু হেসে বললেন, 'ওসব মধ্যযুগীয়

ফর্মালিটিজ রাখো তো। আমি তোমার চাচীর মামী। আমাকে নানী ডাকবে।'

তার বন্ধুদের সঙ্গে একে একে পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর। প্রত্যেকের সঙ্গে আন্তরিকভাবে করমর্দন করলেন লেডি ওয়াগনার। চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন, 'বোসো। চা খাও। আমি ক্যারিকে ডাকছি।'

দেয়ালের সঙ্গে বাঁধা একটা রশি ধরে টান দিলেন তিনি। কোথাও টুংটাং শব্দে বেজে উঠল মিষ্টি ঘণ্টা। ডাকার জন্যে পুরানো দিনের কায়দাটাই বহাল রেখেছেন তিনি। আধুনিক কলিং বেল লাগাননি।

একটু পরেই মাঝবয়েসী এক মহিলা ঢুকল ঘরে। পরনে কালো গাউনের ওপর সাদা অ্যাপ্রন। মাথায় টুপি। এ ধরনের টুপি কখনও দেখেনি তিন গোয়েন্দা। অনেকটা ঘোমটার মত কুঁচি দেয়া টুপিতে, পেছন দিকে একজোড়া লম্বা, কালো পালক বেরিয়ে আছে।

একটা ট্রলি নিয়ে এসেছে মহিলা। তাতে চায়ের সরঞ্জাম। চায়ের সাথে স্যান্ডউইচ, কেকসহ আরও অনেক কিছু আছে।

চা খেতে খেতে জমে উঠল গল্প। লেডি ওয়াগনার যে এতটা আন্তরিক হবেন, ভাবতেই পারেনি কিশোর। ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে সে, কখন হারানো মূল্যবান জিনিসটার প্রসঙ্গ উঠবে। লেডি ওয়াগনার নিজেই প্রসঙ্গটা তুললেন। বললেন, 'মেরিকে যে জিনিসটা দেব ভেবেছিলাম ওটা ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় একটা জিনিস। একটা ব্রোচ। ব্রোচের মাঝখানে ছিল বড় একটা পোখরাজ পাথর। চারপাশে হিরে দিয়ে সাজানো।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের। 'তাই নাকি! নিশ্চয়ই অসাধারণ দেখতে জিনিসটা।'

মাথা ঝাঁকালেন লেডি ওয়াগনার। 'ব্রোচটা আমার এক পূর্বপুরুষকে উপহার দিয়েছিলেন বোনি প্রিন্স চার্লি।'

'তাই!' অবাক হলো মুসা। 'সেই সুদর্শন রাজকুমার যিনি চাকরের ছদ্মবেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন?'

হাসলেন লেডি ওয়াগনার। 'হ্যাঁ, তিনিই,' তাঁর চেহারায় করুণ একটা ভাব ফুটে উঠল। 'কিশোর, ওই পিনটা হারিয়ে নির্ঘুম রাত কাটছে আমার। আলমারি থেকে বের করেছিলাম দেখতে ওটা ঠিকঠাক অবস্থায় আছে কিনা। তোমার চাচীকে পাঠাব ভাবছিলাম। দেখার পর মনের অজান্তেই পরনের পোশাকে গেঁথে রাখি ওটা। অভ্যাস।

'ঘরে গরম লাগছিল বলে বাগানে হাঁটতে গিয়েছিলাম আমি। অনেকক্ষণ বাগানে হেঁটেছি। ঘুম আসছিল। আবার ঘরে ফিরে আসি আমি। পোশাকটা খুলে ওয়ার্ডরোবে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। পরদিন সকালে ব্রোচটার কথা মনে পড়ে আমার। আলমারিতে ওটা তুলে রাখার জন্যে পোশাক তুলতে দেখি নেই ব্রোচটা।'

'ইস!' আফসোস করল এরিনা। 'নিশ্চয় খুব সুন্দর ছিল?'

ম্লান হাসলেন লেডি ওয়াগনার। 'তা তো নিশ্চয়ই। প্রথমে ভেবেছি হাঁটাহাঁটি

করার সময় ব্রোচটা খুলে পড়ে গেছে। বাগানে তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো। কোথাও পেলাম না ওটা।'

'আপনি কি শিওর জিনিসটা সত্যি খোয়া গেছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

এ প্রশ্নে একটু যেন বিরক্ত হলেন ভদ্র মহিলা। 'তোমার কি ধারণা আমি মনের ভুলে ব্রোচটা কোথাও খুলে রেখেছি?'

'না, না, আমি তা বলিনি!' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। 'জিনিসটা তো চুরি হয়েও যেতে পারে?'

বিস্মিত দেখাল লেডি ওয়াগনারকে। 'চুরি করবে কে? আমি ছাড়া এ বাড়িতে শুধু হেনরি আর ক্যারি থাকে। এরা দু'জনেই অত্যন্ত বিশ্বস্ত।'

'আমি ওদেরকে সন্দেহ করছিও না,' চট করে কিশোর বলল। 'আপনার ব্রোচ হয়তো বাইরে কোথাও পড়ে গেছে। বহিরাগত কেউ ওটা পেয়ে লোভ সামলাতে না পেরে চুরি করেছে।'

'তা হওয়া অসম্ভব নয়,' বললেন লেডি ওয়াগনার। 'তবে এখানে বহিরাগত আসে খুব কম। আমার একটা কুকুর ছিল। ওটার ভয়ে বাইরের কেউ ভেতরে ঢোকার সাহসই পেত না। দুঃখের বিষয়, যে রাতে ব্রোচটা হারালাম আমি সে-রাতে কুকুরটাও গেল মরে।'

কিশোর পত্রিকার সেই লেখাটার কথা ভাবছিল। মূল্যবান জিনিসটা কেউ চুরি করেছে, এ সন্দেহ বরাবরই করে আসছে সে। যদিও পত্রিকায় লেখা হয়েছিল ওটা হারিয়ে গেছে। কিশোরের মনোযোগ ভিন্ন দিকে ফেরানোর জন্যেই ওই তথ্য দেয়া হয়েছিল, সে-ব্যাপারে ওর সন্দেহ নেই।

চা পর্ব শেষ হবার পরে তরুণ অতিথিদেরকে ঘর দেখিয়ে দেয়া হলো। মুসা ও রবিন ওদের সুটকেস খুলতে ব্যস্ত, কিশোর আর এরিনা ঠিক করল একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসবে। হারানো ব্রোচটা খুঁজবে।

কিন্তু জিনিসটার কোন চিহ্ন ওরা দেখল না। তবে চোখে পড়ল জুতোর ছাপ। ওয়াগনার হাউসের পেছন দিকের মাঠে ফুটে আছে গভীর ছাপগুলো। পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো কিশোর ওগুলো হেনরির পায়ের ছাপ নয়। ছাপগুলো অনেক ভারী। আর হেনরি হালকা-পাতলা মানুষ। তবু নিশ্চিত হবার জন্যে হেনরির কাছে গেল সে।

হেনরি আগাছা সাফ করছিল। পায়ের ছাপ দেখে জোর দিয়ে বলল এগুলো তার পায়ের ছাপ নয়। আর এদিকে কেউ আসেনি বলেই সে জানে।

'কেউ না কেউ তো এসেছেই,' কিশোর বলল। 'কারণ পায়ের ছাপগুলো তাজা। হয়তো কাল রাতেই কেউ চুরি করে ঢুকেছিল এখানে। হেনরি, এমনও তো হতে পারে এ পায়ের ছাপ সেই লোকের যে এখানে ঢুকেছিল লেডি ওয়াগনারের ব্রোচ হারানোর রাতে, আর একই লোক আপনাদের পাহারাদার কুকুরটাকে মেরে ফেলেছে?'

শুনে হতবাক হেনরি। 'টোগোকে তো কেউ মারেনি। ওর গায়ে আঘাতের কোন চিহ্ন খুঁজে পাইনি। অবশ্য জানিও না কি কারণে মারা গেছে টোগো।'

ভেড়াচোরদের কথা মনে পড়ে গেল কিশোরের। ও সন্দেহ করেছিল চোরের দল অজ্ঞান করার ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করেছে ভেড়াগুলোকে। প্রহরী কুকুরটাকে কি একই কায়দায় কাবু করে ফেলেছিল চোর যাতে ডাকাডাকি করে কাউকে সাবধান করে দিতে না পারে ওটা?

আরেকটা সন্দেহ হলো কিশোরের। চোর যেহেতু দ্বিতীয়বার হানা দিয়েছে বাড়িতে, নিশ্চয়ই কোন কিছু চুরির মতলব ছিল তার।

হেনরির দিকে ফিরল কিশোর। 'হেনরি, এ পায়ের ছাপ কোন চোরের হওয়াই স্বাভাবিক। দেখুন তো, আপনাদের কোন জিনিস চুরি গেছে কিনা?'

চোদ্দ

কিশোরের কথা শুনে বুক চিতিয়ে টানটান হয়ে দাঁড়াল হেনরি। 'মাস্টার কিশোর, ওয়াগনার হাউস থেকে কখনও কোন কিছু চুরি হতে পারে না। এ বাড়ির প্রতিটি দরজা-জানালায় বার্গলার অ্যালার্ম লাগানো আছে। কেউ ঢোকার চেষ্টা করা মাত্র বেজে উঠবে বেল। চোর ধরা পড়তে বাধ্য।'

'শুনে খুশি হলাম,' কিশোর বলল। 'আপনাদের বাড়িতে মূল্যবান জিনিসপত্রের তো অভাব নেই। জানেনই তো আর কিছুদিনের মধ্যে এ বাড়ি ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে পরিচিতি পেতে যাচ্ছে। তখন সারা পৃথিবী থেকে ট্যুরিস্টরা আসবে ওয়াগনার হাউস দেখতে।'

'স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট ফ্যামিলিও আসবেন,' গর্বিত গলায় জানাল হেনরি। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল নিজের কাজে।

কিছুক্ষণ পরে ওদের সঙ্গে যোগ দিল রবিন আর মুসা। বাগানে আর মাঠে ঘুরে বেড়াল ওরা। এ যাবৎ ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনা করল। কিশোরের স্থির বিশ্বাস, ব্রোচটা চুরি গেছে।

'কিন্তু কে চুরি করতে পারে?' জিজ্ঞেস করল মুসা। কেউ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না। অনুমানও করতে পারল না কিছু।

'একটা ব্যাপার মাথায় ঢুকছে না আমার, কিশোর,' বলল রবিন, 'চোর যদি ব্রোচ চুরি করে পালিয়েই যায় তাহলে সে বা তার দল কেন তোমাকে স্কটল্যান্ডে আসতে বাধা দিচ্ছিল?'

'ঠিক কথা। কেন?' রবিনের প্রশ্নের প্রতিধ্বনি তুলল মুসা। 'লক লোমোন্ডের দুর্ঘটনায় আমি আর রবিন তো প্রায় মারাই যাচ্ছিলাম। এরিনাও অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।'

কিশোর বলল তার ধারণা একটা দিকেই কেবল নির্দেশ করছে ব্যাপারটা। 'বড় ধরনের কিছু এর সঙ্গে জড়িত। ব্রোচ চুরিটা আসল ব্যাপার নয়। আমার বিশ্বাস, যারা ভেড়া চুরি করছে, তারাই ব্রোচটাও চুরি করেছে। ওদের ভয়, ব্রোচ

খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে যদি ওদের খোঁজ পেয়ে যাই, তাহলে দলের সন্ধানও পেয়ে যাব। সেজন্যেই ঠেকাতে চেয়েছে আমাকে।'

প্রশংসার দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল এরিনা। 'গোয়েন্দা হিসেবে কেন তুমি আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান হয়ে গেছ এখন বুঝতে পারছি।'

কিশোরকে বলল মুসা, 'তোমার সন্দেহ সত্যি হলে ধরে নিতে হয় রকি বীচের কিম ব্রাগনার, রহস্যময় মিস্টার পেইশা এবং লাল-দাড়ি এরা সবাই ভেড়া চোরের দলের সদস্য।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

রবিন বলল, 'কিশোর, তুমি তো হাউসবোটের ওই লোকগুলোকেও সন্দেহ করেছিলে। চুরি যাওয়া ব্রোচটা ওখানে থাকতে পারে না?'

'তা পারে,' জবাবটা দিল মুসা। 'কিন্তু এক পাল ভেড়াকে হাউসবোটে লুকানো সম্ভব না। যায় কোথায় ওগুলো?'

কিশোর বলল, 'জ্যান্ত রাখতে না পারলেও চুরি করা পশুর পশম, চামড়া এ সব লুকানো অসম্ভব নয়। হয়তো দূরে কোথাও পাচার করে দেয়। আমেরিকায় হলেও অবাক হব না।'

'হুঁ, তা ঠিক,' মাথা দোলাল এরিনা। 'প্রশাসন হারিয়ে যাওয়া জ্যান্ত ভেড়া খুঁজছে, পশম বা চামড়া খোঁজার চিন্তাই হয়তো তাদের মাথায় নেই।'

এরপর মিনিটখানেক চুপচাপ হাঁটল ওরা। তারপর কিশোর বলল, 'কাল একবার আমি ওই রাস্তায় যাব যেখান থেকে ভেড়ার ডাক শুনেছিলাম।'

'মিসেস কারগুনারের বাড়ির কাছে যেতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'ওখানে গেলে কোন সূত্র পেতে পারি।' এরিনার দিকে ফিরল। 'ওই ট্রাকটা কোত্থেকে আসে অনুমান করতে পারো?'

এরিনার সন্দেহ, বেন নেভিস পাহাড়ের নিচের উপত্যকা থেকে আসে। কি ভেবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ। 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। আমরা রাতের বেলা ক্যাম্পিং-এ বেরোই না কেন? উপত্যকাটা ভারী সুন্দর। ওখানে অনেক লোকজন আসে পাহাড়ে চড়তে। বেন নেভিসে ওঠার দৌড় প্রতিযোগিতাও করে কেউ কেউ।'

রবিন জানতে চাইল, 'পাহাড়টা কত উঁচু?'

'সাড়ে চার হাজার ফুটের কাছাকাছি।'

অবাক দেখাল মুসাকে। 'অতখানি ওপরে দৌড়ে ওঠে?'

'হ্যাঁ।'

মুচকি হাসল রবিন। 'রহস্য থাক বা না থাক পাহাড়টা দেখতে খুব ইচ্ছে করছে আমার।'

ক্যাম্প করার পরিকল্পনায় রোমাঞ্চিত হলো তিন গোয়েন্দা। বাড়ি ফিরে লেডি ওয়াগনারের কাছে জানতে চাইল কিশোর, ক্যাম্প করার সরঞ্জামাদি পাওয়া যাবে কিনা ওবাড়িতে।

'চিলেকোঠাতেই পাবে,' বললেন লেডি ওয়াগনার। 'ক্যাম্প আর হাইকিঙের

জন্যে বহু জিনিস আছে ওখানে।'

চিলেকোঠায় যাবার আগে লেডি ওয়াগনার তিন গোয়েন্দা আর এরিনাকে নিজের প্রকাণ্ড বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখালেন। এক সঙ্গে এত তৈলচিত্রের সমাহার জীবনেও দেখেনি মুসা। একটা ঘরে নাইটদের অনেক বর্ম ঝুলতে দেখা গেল।

চিলেকোঠা বলতে অপ্রশস্ত গুমোট একটা ঘর দেখবে ভেবেছিল কিশোর। কিন্তু লেডি ওয়াগনারের চিলেকোঠার ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল ও। বিশাল একটা ঘর। চমৎকার সব আসবাব দিয়ে সাজানো। লেডি ওয়াগনার জানালেন এক সময় এটা গেম রুম হিসেবে ব্যবহার করা হতো। ওয়াগনার হাউসের পুরুষরা অতিথিদের নিয়ে বিলিয়ার্ড খেলতেন। ঘর ভর্তি পুরানো দিনের আসবাবপত্র, বই আর ট্রাঙ্ক।

'ট্রাঙ্কে নানা ধরনের কাপড় চোপড় আর কম্বল পাবে,' বললেন লেডি ওয়াগনার। 'যার যা পছন্দ নিয়ে নাও।'

ট্রাঙ্কের ভেতরের জিনিসপত্র দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল তিন গোয়েন্দার। কত রকমের যে ঘাগরা চোলি, ব্লাউজ আর মোজা তার হিসেব নেই। টুপিও আছে প্রচুর।

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল কিশোরের। 'এ দিয়ে চমৎকার ছদ্মবেশ হবে।'

ভুরু কোঁচকালেন লেডি ওয়াগনার। 'ছদ্মবেশ দিয়ে কি হবে?'

'এই একটু মজা করা আরকি,' এখনই তার সন্দেহের কথা মহিলাকে বলতে চাইল না কিশোর। যদি বিপদের কথা ভেবে ঘাবড়ে যান। বাধা দিয়ে বসেন।

হাসলেন লেডি ওয়াগনার। 'করও মজা। এ সব পোশাক এক সময় আমার পূর্বপুরুষরা পরতেন। জানো বোধহয় আমার পূর্বপুরুষদের অনেকেই বিভিন্ন উপজাতির বংশধর ছিলেন।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ, চাচীর কাছে শুনেছি।'

ট্রাঙ্ক থেকে যে যার পছন্দ মত পোশাক বেছে নিল তিন গোয়েন্দা। চমৎকার মানিয়ে গেল সবাইকে।

'এ সব পরে বাইরে গেলে কোন অসুবিধে নেই তো?' জানতে চাইল কিশোর। 'ছিঁড়েটিড়ে যায় যদি।'

লেডি ওয়াগনার আশ্বস্ত করলেন অসুবিধে নেই।

'তোমাদেরকে স্লিপিং ব্যাগ বা বেড রোল দিতে পারছি না,' বললেন তিনি। 'ট্রাঙ্কে ন্যাকস্যাক আর গরম কম্বল আছে। ওতেই ক্যাম্পিঙের কাজ চালিয়ে নিতে হবে।'

ট্রাঙ্ক খুলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে নিচে নেমে এল ওরা। ক্যারি ওদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। 'তোমাদেরকে একদম হাইল্যান্ডারদের মত লাগছে!'

হাসল তিন গোয়েন্দা। বলল ক্যাম্পিঙে যাচ্ছে। গাড়িতে চড়ে বসল সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে। খাবারের প্যাকেট আর ঝুড়িটা গাড়িতে তুলে দিল ক্যারি।

এরিনার নির্দেশ মত শর্টকাটে গাড়ি চালাল কিশোর। রাস্তাটা মিসেস

কারগুনারের বাড়ির পাশ দিয়ে বেন নেভিস পাহাড়ের দিকে মোড় নিয়েছে।

যেখানে সূত্র পাবে আশা করেছিল কিশোর, সেখানে পৌঁছে তেমন কিছু চোখে পড়ল না ওদের। উপত্যকার দিকে চলল তখন ওরা ।

উপত্যকায় পৌঁছে একটা ব্রিজের ওপর উঠল। ব্রিজের নিচে একটা সরু নদী। পাহাড়ী জলপ্রপাত থেকে ওটার সৃষ্টি। ব্রিজের নিচ দিয়ে স্বচ্ছ পানি কলকল করে বয়ে চলেছে।

'দারুণ! দারুণ!' উচ্ছ্বসিত হয়ে চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে মুসা।

দু'পাশে খাড়া পাহাড়। তবে এত খাড়া নয় যে পাহাড়ে চড়া যাবে না। গাছ আর ঝোপঝাড়ের মাঝে ইতস্তত ছড়ানো পাথর খণ্ড। এখানে ওখানে জন্মে রয়েছে এক ধরনের বুনো গুল্ম, বেগুনি ফুল। পাহাড়ের বুকে অপূর্ব লাগছে।

রাস্তাটা চলে গেছে নদীর পাশ ঘেঁষে। বেশ কয়েক জায়গায় সাইন বোর্ড চোখে পড়ল ওদের। এরিনা জানাল ওগুলো ক্যাম্পারদের জন্যে সংরক্ষিত। রাস্তায় একদল হাইকারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের। বেন নেভিসে দৌড় প্রতিযোগিতার জন্যে প্রস্তুত।

রাস্তার এক পাশে গাড়ি থামাল কিশোর। জানালা দিয়ে গলা বাড়াল সবাই। হাইকারদের দেখছে। চারটে ছেলে। সবার পরনে সাদা ট্রাঙ্ক আর জার্সি। তাতে স্কুলের তকমা লাগানো। একটা ছেলে এরিনাকে দেখে হাত তুলল।

'আমার জন্যে দোয়া কোরো,' জোরে জোরে বলল সে। 'আমরা ওই বড় পাইন গাছটা পর্যন্ত দৌড়ে যাব। আবার ফিরে আসব। যাব-আসব বিশ মিনিটের মধ্যে।'

জবাবে মাথা ঝাঁকাল এরিনা। তিন গোয়েন্দাকে বলল ছেলেটা ওর দূর সম্পর্কের চাচাত ভাই। নাম ডেনিস। ছেলেগুলো দৌড় শুরু করল। ওদের দৌড়ের ভঙ্গি দেখে কিশোররা অবাক। কি স্বচ্ছন্দে খাড়া ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে। পাইন গাছটার কাছে দলটাকে পৌঁছুতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল এরিনা, 'দেখো দেখো, ডেনিস সবার আগে!'

ঢাল বেয়ে ডেনিসই সবার আগে নামতে শুরু করল। তবে ওঠার চেয়ে নামাটা বেশি বিপজ্জনক মনে হলো। গোয়েন্দারা সবাই যে যার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। এরিনা বলল, 'ডেনিসই জিতবে।'

হলোও তাই। ঠিক বিশ মিনিটের মাথায় যেখান থেকে দৌড় শুরু করেছিল সেখানে পৌঁছে গেল ডেনিস। ওর বন্ধুরা এলো যথাক্রমে পঁচিশ মিনিট, আটাশ মিনিট এবং ত্রিশ মিনিটে।

এরিনা ওর চাচাত ভাই এবং অন্যান্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল তিন গোয়েন্দার। কিশোরদের ওরা ওদের ক্যাম্পে যাওয়ার দাওয়াত দিল। নদীর তীরে ক্যাম্প করেছে ডেনিসরা।

সানন্দে দাওয়াত কবুল করল এরিনা এবং তিন গোয়েন্দা। ডেনিসদের সঙ্গে চলে এল নদীর তীরে। ওখানে আরও অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে আছে। বেশির ভাগের পরনে ঘাগরা। ক্যাম্পারদের কেউ এসেছে আইল অভ স্কাই থেকে, কেউ বা

ইনভারনেসের শহর থেকে। দেখা গেল অনেককেই এরিনা চেনে। সবাই বেশ আন্তরিক। ফলে ওদের সঙ্গে মিশে যেতে সময় লাগল না তিন গোয়েন্দার।

অনেক গল্পগুজব হলো। খাওয়া দাওয়া হলো। সবাই হাসি-ঠাট্টায় মশগুল, এমন সময় দূরবর্তী বাঁশির আওয়াজে কান খাড়া হয়ে গেল কিশোরের। কাত হয়ে শুয়েছিল, উঠে বসল। ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে কে যেন। একটা সুরই বাজাচ্ছে বারবার। পাহাড় থেকে ভেসে আসছে। সেই স্কটস হোয়া হেই।

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে পাহাড়ের দিকে তাকাল কিশোর। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। কোনও ঢালের ওপর দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে? একের পর এক অতীতের ঘটনাগুলো মনে পড়ে যেতে লাগল কিশোরের। কয়েকটা প্রশ্ন এল মাথায়। ওই বিশেষ সুরটা কি বারবার ওকে উদ্দেশ্য করেই বাজানো হচ্ছে? বাঁশিটা কি মিস্টার পেইশা বাজাচ্ছে? সে কি তার সঙ্গীদের বাঁশি বাজিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে কাছাকাছিই আছে কিশোর?

সে বাদে মুসা বা রবিন কেউই খেয়াল করেনি বাঁশির শব্দ। এরিনাও না। যেমন বেজে উঠেছিল, তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল বাজনা। বাঁশি বাজার কথা সহকারীদের জানাল কিশোর। বলল, 'আমি পাহাড়ে উঠতে যাচ্ছি। রহস্যময় বাঁশিওয়ালার খোঁজ মেলে কিনা দেখি।'

মুসা বলল, 'ওটা তোমার জন্যে কোন ফাঁদ নয় তো? বিপদে পড়ে যাও যদি?'

হাসল কিশোর। 'সবাই এক সঙ্গে গেলে কোন বিপদ হবে না।'

রবিন বলল, 'তোমাকে একা ছাড়বও না আমরা।'

ক্যাম্পারদের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা। বলল পাহাড়ে চড়তে যাচ্ছে। তবে গরম আবহাওয়ার জন্যে পাহাড়ে চড়াটা তেমন সুখকর হলো না। ঘেমে নেয়ে গেল সবাই। কিশোর আর এরিনা এগিয়ে আছে সামনে। মুসা আর রবিন খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে। তবে মুসা ওদের নাগাল ধরে ফেলল একটু পরেই।

'রবিন কই?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মুসা বলল তাড়াতাড়ি পৌছার জন্যে অন্য রাস্তা ধরে আসছে রবিন। 'ওর আর তর সইছে না। তাড়াতাড়ি চূড়ায় উঠতে চায় ।'

ঠিক তখন রবিনের চিৎকার শুনতে পেল ওরা। পাঁই করে এক সাথে ঘুরে দাঁড়াল তিনজন। সামনের দৃশ্যটা দেখে আঁতকে উঠল ভয়ে। ওদের থেকে খানিক দূরে, পাহাড়ের উতরাইয়ে দাঁড়িয়ে একটা লোক জোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে রবিনকে। এ লোকটাই ফেরিতে ধাক্কা মেরে ওদের ফেলে দিয়েছিল।

'আবার সেই লাল-দাড়ি!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

ধাক্কার চোটে মাটিতে ছিটকে পড়ল রবিন। পর মুহূর্তে ডিগবাজি খেতে খেতে পাহাড় থেকে পড়ে যেতে শুরু করল ও। আর লাল-দাড়ি এক ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল ঢালের আড়ালে।

পনেরো

কিশোর আর মুসা ছুটল রবিনকে বাঁচাতে। গড়াতে গড়াতে ও পড়ে যাচ্ছে পাহাড় থেকে।

রবিনের ভাগ্য ভাল সামান্য নিচেই খাড়া ঢাল সমতল হয়ে গেছে। থেমে গেল তার গড়ানো। কিশোর আর মুসা ততক্ষণে চলে এসেছে কাছে। উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল কিশোর, 'লাগেনি তো?'

রবিন জবাব দেয়ার আগে বলে উঠল মুসা, 'লাগেনি মানে! দেখছ না ওর গা কত জায়গায় ছড়ে গেছে। রবিন, চলো। এখনই ডাক্তারের কাছে যাব।'

'তার দরকার হবে না,' বলল রবিন। 'তেমন লাগেনি আমার।'

উঠে দাঁড়াল ও। দুই বন্ধু সহায়তা করল ওকে। গা থেকে যতটা সম্ভব ধুলো ঝেড়ে ফেলল।

'লাল-দাড়ি ব্যাটাকে ধরতেই হবে,' ক্ষোভের সঙ্গে রবিন বলল। 'আমাকে এ ভাবে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল!'

এ সময় খেয়াল করল ওরা এরিনা নেই ওদের সঙ্গে। এদিক-ওদিক তাকাল তিন গোয়েন্দা। কোথাও দেখা যাচ্ছে না এরিনাকে।

ভয় পেয়ে গেল ওরা। লাল-দাড়িটা এরিনার কোন ক্ষতি করেনি তো?

'আমি ওপরে যাচ্ছি। এরিনাকে খুঁজে বের করব,' কিশোর বলল।

মুসা আর রবিন বলল ওরাও যাবে। তিনজনে মিলে পাহাড় বাইতে শুরু করল। একটু পর পর নাম ধরে ডাকল এরিনার। সাড়া মিলল না।

পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়ায় উঠে এসেছে কিশোর, জঙ্গলের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল এরিনাকে। জঙ্গলের ধারের ঢালের কাছে আছে ও। দূর থেকে দেখে মনে হলো নিজেকে আড়াল করে কোন কিছুর ওপর চোখ রেখেছে।

বন্ধুদের নিয়ে এরিনার কাছে চলল কিশোর। ঢালের ধারে এসে ডাক দিল এরিনাকে। জানতে চাইল ও এখানে কি করছে। হাসল এরিনা। 'দুশ্চিন্তার কিছু নেই। বলতে পারো তোমাদের মত গোয়েন্দা হবার চেষ্টা করছি। আমি লাল-দাড়িকে এদিকে দৌড়ে আসতে দেখেছি। ভাবলাম এদিকে এলে লোকটার দেখা পাব।'

'খোঁজ পেয়েছ লোকটার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল এরিনা। 'লাল-দাড়ির খোঁজ পাইনি। তবে একটা জিনিসের খোঁজ পেয়েছি। ওই দিকে দেখো।'

নিচে হাত তুলে দেখাল ও।

ওদের নিচে সরু একটা উপত্যকা, সেখানে চড়ে বেড়াচ্ছে একপাল ভেড়া। এরিনা জানাল খানিক আগেও ওখানে এক মেষপালক ছিল। এখন নেই।

'মেষপালকদের সঙ্গে কুকুর থাকবেই,' বলল এরিনা। 'কিন্তু এ লোকের সঙ্গে ছিল না। ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক। আমার ধারণা লোকটা মেষপালক নয়, ছদ্মবেশী কেউ। ভেড়াগুলো নির্ঘাত চুরি করা। এখানে এনেছে পাচার করার জন্যে।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর, 'তোমার সন্দেহ অমূলক না-ও হতে পারে। এখুনি পুলিশে খবর দেয়া দরকার।'

'এখান থেকে খবর দেয়া যাবে না। ফোন নেই। তার জন্যে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'আমার সন্দেহ ওই লাল-দাড়ি আমাদের প্রতিটা পদক্ষেপ লক্ষ করছে,' কিশোর বলল। 'সে-ই হয়তো বাঁশিতে স্কটস হোয়া হেইর সুর বাজিয়ে তার স্যাঙ্গাৎদের সঙ্কেত দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে আমরা এখানে ক্যাম্পিঙে এসেছি। আমরা পাহাড়ে উঠে এলে মরিয়া হয়ে ওঠে সে। কারণ তার এলাকার কাছে চলে এসেছি আমরা।'

'আর মরিয়া হয়ে সে ধাক্কা মেরে আমাকে পাহাড় থেকে ফেলে দেয়,' বলল রবিন। 'ভেবেছে তোমরা আমাকে বাঁচানোর জন্যে ছুটে আসবে। ব্যস্ত থাকবে আমাকে নিয়ে। ভেড়া বা অন্য কিছুর চিন্তা করবে না।'

'ঠিক বলেছ।'

'কিন্তু তারপর আর কিছু করার সাহস পায়নি। ভেড়া না নিয়েই ভেগেছে।'

ওরা ঢাল ছেড়ে চূড়ার দিকে এগোল। তারপর চলে এল নদীর ধারে। ঠাণ্ডা পানিতে ভাল করে হাত মুখ ধুলো রবিন। ঝরঝরে লাগল শরীর।

সে-রাতে স্কটিশ ক্যাম্পারদের সঙ্গে বেশ জমে উঠল তিন গোয়েন্দার। ক্যাম্পাররা পুরানো এবং নতুন স্কটিশ গান গেয়ে শোনাল। দু'একটা জানা গানে সুর মেলানোর চেষ্টা করল তিন গোয়েন্দা। গান শেষে প্রথমে মেয়েরা তারপর ছেলেরা নাচল ব্যাগপাইপের সুরে। একটা ছেলে নিয়ে এসেছে বাদ্যযন্ত্রটা।

কিশোরদেরকেও নাচতে হলো ওদের সঙ্গে। প্রথমে একটু অসুবিধে হলো স্কটিশদের সঙ্গে পা মেলাতে। কিন্তু মুসা জমিয়ে ফেলল। পরে আর তেমন অসুবিধে হলো না। সবাই হাততালি দিতে লাগল তাকে।

নাচের পরে সবশেষে গান গাইতে হলো এরিনাকে। মিষ্টি গলা ওর। দরদ দিয়ে গাইল হাইল্যান্ডারদের একটা প্রিয় গান। তিন গোয়েন্দা ওর গান শুনে মুগ্ধ।

'এ তো ভাল গাইতে পারো তুমি কল্পনাই করিনি,' প্রশংসা না করে পারল না রবিন।

গভীর রাতে আরেক বার খাওয়া-দাওয়া চলল। তারপর সবাই ঘুমাতে গেল। কেউ ঢুকল তাঁবুতে, কেউ বেডরোল নিয়ে শুয়ে পড়ল, কেউ বা ভারী কম্বলে শরীর মুড়ে নিল।

কিন্তু ঘুম আসছিল না কিশোরের। কান পেতে নদীর কলকল শব্দ শুনতে লাগল ও। মনে হলো নদী যেন ওর সঙ্গে কথা বলছে।

ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ কিশোরকে অবাক করে দিয়ে ভেসে এল শিসের

আওয়াজ। শব্দ শুনেই বুঝতে পারল ব্যাগপাইপের সাহায্যে কেউ শিস দিচ্ছে। সঙ্কেত দিচ্ছে বাদক। কিসের সঙ্কেত? কাকে দিচ্ছে?

কম্বলের নিচ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। উঠে দাঁড়াল। চোখ বোলাল পাহাড়ে। ঝলমলে চাঁদের আলোয় বেন নেভিস ধবধব করছে।

চূড়া থেকে নিচে, একটা ঢালের মাথায় আবছা কুয়াশার মধ্যে বংশীবাদকের অবয়ব অস্পষ্টভাবে ফুটে থাকতে দেখল কিশোর। বন্ধ হয়ে গেল শিস। সেই সঙ্গে অদৃশ্য বংশীবাদকও।

বাঁশিওয়ালা কি রক্তমাংসের মানুষ? নাকি ভূত? কিন্তু ভূতে বিশ্বাস করে না কিশোর। তারমানে মানুষ।

কিশোরের মনে পড়ে গেল এর আগে সে যখন বাঁশির আওয়াজ শুনেছিল ওই সময় তার সামনে দিয়ে ছুটে গিয়েছিল চোরাই ভেড়া নিয়ে একটা ট্রাক। এইমাত্র যে শিস দেয়া হলো ওটা কি কোন সঙ্কেত ছিল? সঙ্কেত দিয়ে বোঝানো হলো এখন কোন সমস্যা নেই, কিশোররা উপত্যকায় যে ভেড়ার পাল দেখেছে ওগুলোকে সরিয়ে ফেলতে হবে?

এতক্ষণে নিশ্চয় সরিয়ে ফেলেছেও। গিয়ে আর লাভ হবে না।

ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল ও, বলতে পারবে না।

পরদিন সকালে তারই ঘুম ভাঙল সবার আগে। তারপরে জাগল এরিনা।

রাতের ঘটনা এরিনাকে খুলে বলল কিশোর। 'বেন নেভিসের সেই ঢালটার কাছে যাবে আমার সঙ্গে?'

'চলো।'

পাহাড়ে উঠে এল ওরা। আগের ঢালটার ধারে এসে নিচে তাকাল। উপত্যকার দিকে। যা ভেবেছিল কিশোর। একটা ভেড়াও নেই ওখানে।

'তোমার সন্দেহই মনে হচ্ছে ঠিক,' এরিনা বলল।

'চলো তো খুঁজে দেখি, চোরগুলোকে ধরার জন্যে কোন সূত্রটুত্র পাই কিনা,' কিশোর বলল।

হাঁটতে হাঁটতে এরিনা বলল, 'মেষপালকরা তাদের ভেড়া পাহাড়ের ধারে মুক্তভাবে চড়ে বেড়ানোর সুযোগ দেয়। কাজেই তোমার হারানো ভেড়ার খোঁজ পেয়েও যেতে পারো।'

উপত্যকায় এসে কোন প্রাণী বা মানুষের চিহ্নও দেখল না কোথাও। একটা ছোট গোলাবাড়ি চোখে পড়ল ওদের। কোন মেষপালকের হবে।

'দেখি তো লোকটা বাড়ি আছে কিনা,' কিশোর বলল।

দরজায় কড়া নাড়ল দু'জনে। সাড়া পেল না কারও। এরিনা বলল এ বাড়িতে বোধহয় কেউ থাকে না। দরজায় ধাক্কা দিল ওরা। তালা মারা নেই। ধাক্কা খেয়ে খুলে গেল কবাট। ভেতরে ঢুকল ওরা। ঘরে একটা খাটিয়া, একটা টেবিল আর একটা আলমারিতে কিছু খাবার দেখতে পেল। ফায়ারপ্লেসে ছাই জমে আছে।

'কেউ এখানে থাকে বোঝাই যাচ্ছে,' কিশোর বলল।

না বলে ঘরে ঢুকে পড়ায় অস্বস্তি লাগছিল দু'জনেরই। চলে যাবার জন্যে পা

বাড়িয়েছে, কিশোরের চোখ আটকে গেল টেবিলের ওপর রাখা একটা খোলা বইতে। টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। বইটার দিকে চোখ। গেইলিক ডিকশনারি। খোলা পাতায় একটা শব্দের নিচে দাগ দেয়া। শব্দটা হলো mall।

'এরিনা, এ শব্দটা আমি মিস্টার পেইশার হোটেল রুমের সেই মেসেজের মধ্যে দেখেছি।'

দ্রুত অভিধানের পাতা ওল্টাতে লাগল কিশোর। দেখতে চায় মেসেজের আরও কোন শব্দ দাগ দেয়া আছে কিনা।

'এই যে একটা শব্দ আছে rathad,' উত্তেজিত হয়ে বলল ও।

'এটার নিচেও দাগ দেয়া।'

এরপর আরও কয়েকটা শব্দ খুঁজে পেল কিশোর: dig, glas, slat, long, bean, ball, gun, ail। সবগুলোর নিচেই দাগ দেয়া।

ষোলো

এগুলো জরুরী সূত্র, বুঝতে পারল কিশোর।

এরিনা জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশকে জানাবে না?'

'অবশ্যই জানাব। মিসেস কারগুনারের ওখানে কি ঘটেছে তা-ও বলব,' জবাব দিল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে কি যেন ভাবছে। বলল, 'এরিনা, মেসেজে লেখা highway ditch কথাটার মানে বোঝার চেষ্টা করছি। ভাবছি ওই কথা দিয়ে বিশেষ কোন রাস্তাকে বোঝানো হচ্ছে কিনা যেখান দিয়ে চোরগুলো যাতায়াত করে।'

বিস্মিত দেখাল এরিনাকে। 'তুমি না আগে ওই কথার অন্য মানে করেছিলে? বলেছিলে ওই কথার অর্থ হলো মিস্টার পেইশা কিংবা তার বন্ধুরা তোমাকে খাদে ফেলে দিতে চেয়েছিল।'

'ও সবই অনুমান। এখন যা বলছি সেটাও অনুমান। lock rod আর wife member without stamp কথা দুটোর অর্থ যদি বের করতে পারতাম!'

ডিকশনারিটা খোলা পেয়েছে। সেভাবেই রেখে যাবে ঠিক করল কিশোর। তাহলে কেবিনের বাসিন্দা বুঝতে পারবে না কেউ ওটা ধরেছে। কিশোর হাতে তুলে নিল বইটা। পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগল। হঠাৎ চমকে গেল সে।

ডিকশনারির পাতার ফাঁকে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে তার সেই অটোগ্রাফ দেয়া কাগজটা।

'কি হলো?' জানতে চাইল এরিনা।

জানাল কিশোর।

উদ্বিগ্ন দেখাল এরিনাকে। 'রকি বীচের সেই অটোগ্রাফ সংগ্রহকারী তাহলে এখানেই থাকে। এটাকে গোপন আস্তানা বানিয়েছে।'

বিভ্রান্ত লাগছে কিশোরের। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলতে শুরু করেছে এ সময় আরেক নতুন রহস্য। এবার ওকে নিয়েই টানাটানি।

'পরিষ্কার বুঝতে পারছি কিম ব্রাগনার আমার অটোগ্রাফ নিয়েছিল ওদের বদ মতলব হাসিল করার জন্যে।'

আবার 'wife' বা 'স্ত্রী' শব্দটা নিয়ে ভাবতে লাগল কিশোর। কোন মহিলা কি কোনও কারণে কিশোরের সই ব্যবহার করে চলেছে?

কি করবে ভাবছে কিশোর। অটোগ্রাফের কাগজটা নিয়ে যেতে পারে সে। কিন্তু এটা এখানে না দেখলে সাবধান হয়ে যেতে পারে শত্রুপক্ষ। তার সঙ্গীদের সতর্ক করে দিয়ে কেটে পড়তে পারে। কিশোর ঠিক করল কাগজটা নেবে না। রেখে যাবে। ওদেরকে পুলিশে ধরিয়ে দেয়ার এই মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করবে না।

কাগজটা যেখানে ছিল সেখানেই আবার রেখে দিল কিশোর। বেরোনোর আগে চারদিকটা ভাল করে দেখে নিল দু'জনে। আশপাশে দেখা যাচ্ছে না কাউকে। কারও চোখে পড়ার আগেই দ্রুত ঢাল বেয়ে নেমে এল ওরা। তারপর পা বাড়াল নদীর দিকে। অন্যান্য ক্যাম্পাররা ততক্ষণে উঠে পড়েছে। নাস্তার আয়োজন করছে।

ওদেরকে দেখে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল মুসা আর রবিন। 'কোথায় গিয়েছিলে তোমরা? আমরা এদিকে তোমাদের খুঁজে মরি।'

'কষ্ট দেয়ার জন্যে দুঃখিত,' কিশোর বলল। তারপর দুই সহকারীকে জানাল সকালের অ্যাডভেঞ্চারের কথা।

নাস্তা সেরে ওয়াগনার হাউসের দিকে রওনা হলো ওরা। লেডি ওয়াগনারকে দেখল বাগানে হাঁটাহাঁটি করছেন। ওদেরকে এত সকাল সকাল ফিরতে দেখে অবাক হলেন তিনি। বললেন, 'নিশ্চয়ই বলবে না যে এরই মধ্যে রহস্যের সমাধান করে ফেলেছ।'

'না,' জবাব দিল কিশোর, 'তা বলব না। তবে আমরা দারুণ একটা আবিষ্কার করে এসেছি। এখুনি পুলিশকে জানানো দরকার।'

লেডি ওয়াগনারের চেহারায় অন্ধকার ঘনাল। 'পুলিশও তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। তোমার জন্যে দুঃসংবাদ আছে, কিশোর।'

বৃদ্ধা জানালেন তাকে স্থানীয় সুপারিনটেনডেন্ট ফোন করেছিলেন।

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায় শুনে খটকা লাগল। তোমাকে একটা ব্যাপার নিয়ে সন্দেহ করছে পুলিশ।'

'আমাকে সন্দেহ!' আকাশ থেকে পড়ল কিশোর। 'কি নিয়ে সন্দেহ?'

লেডি ওয়াগনার জানালেন কিছুদিন আগে কয়েকটা জাল চেক দিয়ে স্কটল্যান্ডের ব্যাংক থেকে বড় অঙ্কের টাকা তোলা হয়েছে। চেকে দস্তখত ছিল ফটোগ্রাফি ইন্টারন্যাশনালে ছাপা হওয়া ছেলেটার অর্থাৎ কিশোরের।

থমথমে হয়ে গেল কিশোরের চেহারা। 'আমার অটোগ্রাফ তাহলে অসৎ উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হয়েছে। জাল করেছে কেউ আমার দস্তখত।'

লেডি ওয়াগনারকে রকি বীচের ঘটনাটা খুলে বলল কিশোর। বলল কিভাবে এক লোক তার সই জোগাড় করেছিল। ওই কাগজটাই সে কিছুক্ষণ আগে উপত্যকার গোলাবাড়িতে দেখে এসেছে।

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন লেডি ওয়াগনার। 'আমি অবশ্য সুপারিনটেনডেন্টকে বলেছি তুমি এ কাজ করতেই পারো না। কিন্তু গোঁ ধরে রইল সে। শেষে বলতে বাধ্য হলাম তুমি আসা মাত্র থানায় ফোন করতে বলব তোমাকে।'

'এখুনি যাচ্ছি,' বলে ঘরের দিকে দৌড় দিল কিশোর।

থানায় ফোন করল সে। ফোন ধরলেন সুপারিনটেন্ডেন্ট নিজেই। বললেন দু'জন ইন্সপেক্টরকে লেডি ওয়াগনারের বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন কিশোরের সঙ্গে কথা বলতে।

কিছুক্ষণের মধ্যে দুই ইন্সপেক্টর এসে হাজির। একজন তরুণ, হাসিখুশি স্বভাবের। নাম ক্রুগার। অপরজন গোমড়ামুখো। পিটার।

লেডি ওয়াগনারের বিশাল ড্রইংরুমে বসে কথা বলল ওরা। ক্রুগারের আচরণ দেখে মনে হলো কিশোরের কথা বিশ্বাস করেছে সে। কিন্তু পিটারের মনোভাব তার উল্টো। তার ধারণা মিথ্যা বলছে কিশোর।

'এ দেশে আমার কোন অ্যাকাউন্টই নেই,' কিশোর বলল। 'আমি চেক লিখতে যাব কেন? যে আমার নামে এই অপকর্ম করেছে সম্ভবত আমার ছদ্মবেশ নিয়েছিল সে।'

'আমরা যে তরুণীর চেহারার বর্ণনা পেয়েছি,' কর্কশ গলায় বলল পিটার , 'তার সঙ্গে তোমার চেহারা মিলে যায়। তুমি মেয়ের ছদ্মবেশ নিলে অবিকল তার মতই লাগবে। পত্রিকার ছবি দেখে অনেকে নিশ্চিত করেছে প্রচ্ছদের কিশোর ছেলেটাই আসল অপরাধী, পুলিশকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে মেয়ের ছদ্মবেশ নিয়েছিল।'

জবাবে কি বলবে ভেবে পেল না কিশোর। ওকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে পিটার পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিল কিশোর বা তার বন্ধুদের থানার অনুমতি ছাড়া বাইরে যাওয়া নিষেধ।

লেডি ওয়াগনার এতক্ষণ চুপচাপ ওদের কথা শুনছিলেন। এই প্রথম কথা বললেন তিনি। 'আমি যদি কিশোর আর তার বন্ধুদের সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিই তাহলে ওদের বাইরে যাবার ব্যাপারে কোন আপত্তি করবে তোমাদের সুপারিনটেন্ডেন্ট?'

কিশোর বুঝতে পারছে জটিল আর ঘোরাল হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। লেডি ওয়াগনারের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পাচ্ছে না পিটার। ওদিকে নিজের ডিউটিও পালন করতে হবে। একটা বুদ্ধি এল কিশোরের মাথায়। ওর চাচাকে ফোন করলে কেমন হয়। তিনি হয়তো কোন সমাধান দিতে পারবেন।

ইন্সপেক্টরদের বলল সে, ওর চাচাকে ফোন করতে চায়। রাজি হলো ওরা। কিশোরের ভাগ্য ভাল রাশেদ পাশাকে পেয়ে গেল তাঁর এডিনবার্গের হোটেল

রুমে। দ্রুত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল ও। সব শুনে খুব রাগ হলো রাশেদ পাশার। তিনি ইন্সপেক্টরদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন।

ফোন ধরল পিটার। কয়েক মিনিট হুঁ-হ্যাঁ করার পর রিসিভার রেখে দিল। তারপর ফোন করল তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে। কিশোররা চুপচাপ বসে রইল ড্রইংরুমে।

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা শেষ করে পিটার বলল, 'মিস্টার রাশেদ পাশাও প্রস্তাব দিয়েছেন তাঁর ভাতিজার সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিতে রাজি আছেন তিনি। অতএব তোমাদের বাইরে ঘোরাঘুরির ব্যাপারে বিধিনিষেধ শিথিল করা হলো।'

'ধন্যবাদ,' তিক্তকণ্ঠে কিশোর বলল। 'আমি এখন খুঁজে বের করব কে চেক জাল করে আমাকে ফাঁসিয়েছে।'

মিসেস কারগুনারের বাড়ির সামনে দিয়ে ট্রাকে করে ভেড়া পাচার হবার খবর ইন্সপেক্টরদেরকে জানাল সে। বলল ওর সন্দেহ ভেড়াচোরেরা উপত্যকাটিকে গোপন আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করছে। 'গতকাল আমি একপাল ভেড়া দেখেছি ওখানে। কিন্তু আজ সকালে দেখি একটাও নেই। ওখানে একটা গোলাবাড়িতে গেলে এক টুকরো কাগজে আমার নাম সই দেখতে পাবেন। আমেরিকায় একটা লোক চালাকি করে আমার অটোগ্রাফ নিয়ে নিয়েছিল। সেই অটোগ্রাফটাই ওটা।'

পুলিশ অফিসাররা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল কিশোরের দিকে। পিটারের চোখে আক্রমণাত্মক ভাবটা নেই, বরং প্রশংসা দেখা যাচ্ছে।

কিশোর বলল, 'অটোগ্রাফটা পাবেন একটা গেইলিক ইংলিশ ডিকশনারির মধ্যে।'

চলে গেল ইন্সপেক্টর দু'জন। দেরি না করে উপত্যকায় তদন্ত চালাবে।

লাঞ্চের পরে কোন খবর আছে কিনা জানার জন্যে থানায় ফোন করল কিশোর।

'গোলা বাড়িতে গিয়ে খান কয়েক আসবাব ছাড়া আর কিছুই পাইনি,' ক্রুগার জানাল ওকে। 'বাকি সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

শুনে দমে গেল কিশোর। আবার তীরে এসে তরী ডোবার মত অবস্থা।

'ভেড়ার কি খবর?' জানতে চাইল কিশোর। 'কেউ তার ভেড়া চুরির খবর জানিয়েছে?'

'এক কৃষক বলল তার পঞ্চাশটা ভেড়া খুঁজে পাচ্ছে না। ফেয়ারি ব্রিজের বামনদের মত যেন হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেছে ভেড়াগুলো।'

ফোন শেষ করে বন্ধুদের কাছে ফিরে এল কিশোর। এরিনাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি সব ফেয়ারি ব্রিজের বামনদের কথা বলছিল অফিসার। ঘটনাটা কি বলো তো?'

মুচকি হাসল এরিনা। বলল, 'ও রূপকথাই বলতে পারো। বহু বহু বছর আগে নাকি এক ধরনের বামন মানুষ বাস করত আমাদের দেশের কাছে। দুষ্টুমি করতে ভালবাসত তারা। একদিন তাদের দেশে বিশালদেহী কিছু মানুষ এল। বামনরা

ভাবল এদের সঙ্গে তারা পেরে উঠবে না। তাই তারা বিশালদেহীদের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে শুরু করল। একদিন কয়েকজন বামন সাহস করে বিশালদেহীদের সঙ্গে দুষ্টুমি করে বসল। পরক্ষণে ভয় পেয়ে গিয়ে লুকাল অনেক দিনের পুরানো পাথুরে একটা ব্রিজের নিচে। এ ব্রিজ ছিল তাদের লুকিয়ে থাকার অন্যতম প্রধান জায়গা। তাদের নামানুসারে পরে ব্রিজটার নামকরণ করা হয় ফেয়ারি ব্রিজ।'

রবিন বলল, 'আছে নাকি ব্রিজটা এখনও? গেলে খুঁজে দেখা যেত বামনরা এখনও আছে নাকি।'

শুনে হাসল কিশোর আর এরিনা।

কিন্তু আঁতকে উঠল মুসা। 'না না দরকার নেই! ওসব বামন-ফামন কিংবা ভূতপ্রেতের চেয়ে ভেড়া আর রত্নচোররা অনেক ভাল। ওদের অন্তত চোখে দেখা যায়।'

এরপর ওরা বাগানে ঘুরতে বেরোল। সবাই গল্প করছে, কিশোর ছাড়া। কিসের চিন্তায় যেন ডুবে আছে ও। শেষে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'কি ভাবছ এত, কিশোর? সেই গোলাবাড়িতে গিয়ে আবার তদন্ত চালানোর কথা ভাবছ না তো? পুলিশ ব্যাপারটা পছন্দ করবে না বলে সাহস পাচ্ছ না।'

'ঠিক ধরেছ।'

'পুলিশের গুল্লি মারো। চলো তো যাই,' বলল রবিন।

ম্লান হাসল কিশোর। 'পুলিশের সঙ্গে এরই মধ্যে অনেক ঝামেলা হয়ে গেছে। লেডি ওয়াগনারের অনুমতি ছাড়া কোথাও যেতে পারছি না আমি।'

কিন্তু রাজি হয়ে গেলেন লেডি ওয়াগনার। বললেন, 'তুমি যে খুব বড় মাপের গোয়েন্দা আমি সেটা বেশ বুঝতে পেরেছি, কিশোর। আর হারানো ব্রোচ, ভেড়াচোর এবং জাল চেকের রহস্য এই তিনটা বিষয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে, তা-ও জানি। এ রহস্যের সমাধান করতে পারবে যদি বুঝে থাকো, যাও, বাধা দেব না। পুলিশকে আমি সামলাব।'

অনুমতি পাওয়া গেছে। মুহূর্ত দেরি না করে বেরিয়ে পড়ল গোয়েন্দারা।

শর্টকাট রাস্তা ধরে লুকানো উপত্যকায় পৌঁছানোর পরামর্শ দিল এরিনা। তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে।

এরিনার নির্দেশ মত মেইন রোড ছেড়ে একটা নির্জন রাস্তায় গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ল কিশোর। দূরে ধোঁয়া চোখে পড়ল। পাকিয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশে। আগুন লেগেছে কোথাও।

একটা মোড় ঘুরতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল ওরা। একটা পাহাড়ের উতরাইতে দাউ দাউ করে জ্বলছে শুকনো চারা গাছের ঝাড়।

চেঁচিয়ে উঠল এরিনা, 'ওই আগুন নেভাতে হবে! ঝাড়ু লাগবে।'

সতেরো

'ঝাড়ু!' অবাক হলো মুসা। 'ঝাড়ু দিয়ে আগুন নেভাবে কিভাবে?'

'কিভাবে নেভাই একটু পরেই তা দেখতে পাবে,' বলল এরিনা। 'কিশোর, আরও জোরে চালাও। বড় গাছগুলোর ওপর হামলা চালানোর আগেই নিভিয়ে ফেলতে হবে আগুন।'

কিশোর কোন প্রশ্ন করল না। গতি বাড়িয়ে দিল। এক সময় এরিনা বলল, 'এবার স্পীড কমাও। ঝাড়ুর কাছে চলে এসেছি আমরা।'

একটা মাঠের সামনে গাড়ি থামাল কিশোর। মাঠের এক কোনায়, কাঠের খুঁটিতে লাগানো হুকে বেশ কয়েকটা ঝাড়ু ঝুলে আছে। লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল এরিনা। এক ছুটে খুঁটিটার কাছে গিয়ে আরেক ছুটে ফিরে এল গাড়ির কাছে। হাতে চারটা ঝাড়ু। ওগুলো বন্ধুদের হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'এগুলো বার্চের ডাল দিয়ে তৈরি। শক্ত তার দিয়ে মোড়ানো। আগুন নেভাতে খুব কাজে লাগে। তাই সব সময় এই ঝাড়ু মাঠে প্রস্তুত রাখা হয়।'

কত দেশের কত রীতি, কত কায়দা! আজব মনে হলো মুসার। তবে এ সব নিয়ে বেশি ভাবার সময় নেই এখন।

আবার দ্রুত গাড়ি ছোটাল কিশোর। এরিনা বলল ঝাড়ু দিয়ে বাড়ি মেরে মেরে নেভাতে হবে আগুন। কয়েক মিনিটের মধ্যে পাহাড়ের ধারে পৌঁছে গেল ওরা। চারা গাছগুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে।

'ভাগ হয়ে যাব আমরা,' নির্দেশ দিল এরিনা। 'উতরাইয়ের কিনারার বাইরের দিকের আগুন নেভাব। গায়ে আগুনের তাপ লাগবে। কিন্তু করার কিছু নেই।'

ঝাড়ু নিয়ে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল আগুন নেভাতে। আধঘণ্টার মধ্যে উতরাইয়ের মাঝখানের আগুন নিভিয়ে ফেলল। বড় গাছগুলোকে আগুনের ছোবলের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে ওরা।

ক্লান্ত হয়ে গেছে সবাই কঠিন কাজটা করতে গিয়ে।

মুসার ইচ্ছে করছে শুয়ে পড়তে। কিন্তু ছাই আর অঙ্গারের মধ্যে শোয়া যাবে না। ওরা গাড়ির দিকে পা বাড়াল।

চারজনেরই মুখ লাল। ঘামে ভিজে গেছে শরীর। হাতের কয়েক জায়গায় ফোস্কাও পড়েছে। জামা-কাপড় ধুলো আর ছাইতে দৈন্য দশা, জুতোর রং তো চেনাই যায় না।

রবিন বলল, 'চেহারার যা দশা হয়েছে একেকজনের। এখন কারও সঙ্গে দেখা না হলেই বাঁচি।'

মলিন হাসি হাসল মুসা। 'তোমার আশা পূরণ হচ্ছে না, রবিন। ওই দেখো কারা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।'

কিশোরের গাড়ির পেছনে থেমে আছে আরেকটা গাড়ি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সেই দু'জন পুলিশ অফিসার।

'ক্রুগার আর পিটার। ওরা কোত্থেকে!' অবাক হলো রবিন।

হাতে ঝাড়ু নিয়ে রাস্তায় উঠে এল চারজন। বিস্মিত হয়ে ওদের দিকে তাকাল পুলিশ অফিসাররা। কিশোরই ঘটনাটা খুলে বলল। আগুন নেভানোর জন্যে সমস্ত কৃতিত্ব দিল এরিনাকে।

'তোমরা যে আগুন নেভাতে পেরেছ এই-ই ঢের,' প্রশংসা করল কাঠখোট্টা পিটার ।

'ঠিক সময়ে আসতে পেরেছি বলে কাজটা করতে পেরেছি,' কিশোর বলল। পা বাড়াল নিজের গাড়ির দিকে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল পিটার, তারপর এগিয়ে গেল কিশোরের দিকে। 'আমি দুঃখিত, কিশোর। তোমাকে খামোকাই সন্দেহ করেছিলাম। কোন খারাপ লোক আর যা-ই করুক বনের আগুন নেভাতে যাবে না জীবনের ঝুঁকি নিয়ে।'

কিশোর হাসল তার দিকে তাকিয়ে। 'আমি কিছু মনে করিনি। আপনি আপনার ডিউটি পালন করেছেন মাত্র।'

জবাবে মাথা ঝাঁকাল পিটার। তার সঙ্গী মুচকি মুচকি হাসছে।

গাড়িতে চড়ে বসল কিশোররা। পুলিশ অফিসারদের বিদায় জানাল হাত নেড়ে। ওরা তখন আগুন কতটুকু নিভেছে পরীক্ষা করতে ব্যস্ত। গাড়ি ছুটিয়ে দিল কিশোর।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি থামাতে বলল এরিনা। জানাল, 'এখান থেকে পাহাড়ে উঠব আমরা। উপত্যকা এবং গোলাবাড়ি সবই দেখা যাবে এ জায়গা থেকে।'

এরিনা এদিকের রাস্তাঘাট ভালই চেনে। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে একটা পায়েচলা পথে চলে এল ও। পথটা সোজা চলে গেছে উতরাইয়ের দিকে। কিশোর সন্দেহ করল এ পথটাকেই হয়তো চুরি করা ভেড়া পাচার করার রুট হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর বোলাল ওরা। চোখে পড়ল না কাউকে। গোলাবাড়িতে ঢুকল কয়েক মিনিট পরে। কিন্তু কোন সূত্র পেল না।

'সব জায়গাতেই খোঁজ করেছি,' বলল রবিন, 'শুধু ডোর ইয়ার্ডের ছাইয়ের পাঁজা ছাড়া।'

লম্বা ডাল দিয়ে ছাইয়ের পাঁজা খুঁচিয়ে দেখল সে আর মুসা। নিচে টিনের ক্যান, কলার খোসা আর ভাঙা কাঁচের টুকরো ছাড়া কিছুই পেল না।

'নকল মেষপালক হাউসকীপার হিসেবে ভালই ছিল বলতে হবে,' বলল মুসা। 'কি সুন্দর ফিটফাট রেখে গেছে ঘর-দোর।'

কথাটা কানে গেল কিশোরের। প্রশ্ন জাগল মনে, যে লোকের চলে যাবার তাড়া ছিল সে কেন ঘরদোর ফিটফাট করে রেখে যাবে?

মুসা এখনও আবিষ্কারের নেশায় ছাইয়ের পাঁজা খুঁজে চলেছে। একটা ছোট ক্যানভাস পেয়ে গেল ও, একটা বোর্ডের সাথে পেরেক মারা। ক্যানভাসে কে যেন

রং করে রেখেছে। কাঁচা হাতের কাজ।

'কি এটা?' আপন মনেই প্রশ্ন করল মুসা। এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ক্যানভাসের দিকে। তারপর ঠেলে সরিয়ে রাখল ওটা।

কিশোর তুলে নিল ক্যানভাসটা। আবর্জনার স্তূপ থেকে যে সব জিনিস পাওয়া গেছে এটা তার থেকে একটু অন্যরকম। ওর মনে হচ্ছে ক্যানভাসটার কোন গুরুত্ব আছে। গুরুত্বটা কিসের এ মুহূর্তে বুঝতে না পারলেও জিনিসটা নিজের কাছে রেখে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর।

আবর্জনা একত্র করে তার ওপর আবার স্তূপ করা হলো ছাই। কিশোর প্রস্তাব দিল এবার একটু বিরতি নেয়া যায়। 'বাড়ি ফিরি চলো।'

ফেরার পথে চুপ হয়ে রইল কিশোর। চিন্তামগ্ন। বাড়ি ফিরে ক্যানভাসটা নিয়ে পরীক্ষা করবে ঠিক করল। গোসল সেরে নেমে পড়ল আয়না সংগ্রহের খোঁজে।

কিশোরকে অনেকক্ষণ লাপাত্তা দেখে এরিনা, মুসা আর রবিন ঢুকল লেডি ওয়াগনারের বসার ঘরে। দেখল গোয়েন্দাপ্রধান ঝুঁকে আছে একটা টেবিলের ওপর। টেবিলে ক্যানভাসটা মেলে রেখেছে। মাঝখানে কতগুলো আয়না সাজানো। আয়নার একটা চক্র বানিয়েছে।

'কি করছ, কিশোর?' জানতে চাইল মুসা।

'এই যে ক্যানভাসটা,' জবাব দিল কিশোর, 'বহু রঙা এই ক্যানভাসটাকে ভালমত লক্ষ করো। প্রথম দর্শনে মনে হবে এতে জ্যাবরা-থ্যাবরা কিছু রং ছাড়া কিছু নেই। বোনি প্রিন্স চার্লির যে ছবিটা দেখেছিলাম মিউজিয়ামে, মনে আছে? এটাও অনেকটা সে-রকম। সেই ছবিতে সিলিন্ডারের গায়ে তৈরি করা আয়নায় ছবিটা দেখা যাচ্ছিল। মনে নেই?'

মাথা ঝাঁকাল সবাই। মনে আছে। ক্যানভাসে রাখা আয়নাগুলোতে ছবি দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু দেখতে পেল না।

লেডি ওয়াগনারও চেষ্টা করলেন। তিনিও কিছু বের করতে পারলেন না। 'কিশোরের সঙ্গে আমিও একমত, কোন কিছু আছে এটাতে। কিন্তু সেটা বের করব কিভাবে?'

'মনে হচ্ছে এ সব সাধারণ আয়না দিয়ে দেখা যাবে না,' কিশোর বলল। 'বাড়িতে কাঁচের তৈরি টিউবের মত কোন জিনিস আছে?'

লেডি ওয়াগনার তেমন কোন জিনিসের কথা মনে করতে পারলেন না। কিশোরকে বললেন খুঁজে দেখতে।

ক্যানভাসটা হাতে নিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল কিশোর। একতলায়, আলমারির মধ্যে স্বচ্ছ কাঁচের একটা বড়সড় গবলিট পেয়ে গেল সে। পানপাত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় এগুলোকে।

'একেবারে ঠিক সাইজের জিনিস পেয়ে গেছি,' খুশি হলো কিশোর। 'এখন আমার বুদ্ধি কাজে লাগলেই হলো।'

লেডি ওয়াগনারের কাছে ফিরে এল ও। গবলিটের ভেতরের দেয়ালে পারদ মাখিয়ে ওটাকে আয়না বানানোর অনুমতি চাইল।

'ঠিক আছে। বানাও,' অনুমতি দিলেন লেডি ওয়াগনার। 'হেনরি তোমাকে হয়তো সাহায্য করতে পারবে। ওর কাছে নানা অদ্ভুত জিনিস থাকে। পারদও থাকতে পারে।'

কিন্তু হেনরির কাছে পারদ নেই। কিশোর ঠিক করল ফোর্ট উইলিয়ামে যাবে। পারদ কিনে আনবে। সেই সাথে কিছু কোটিং।

বন্ধুরা যেতে চাইল ওর সঙ্গে। আপত্তি নেই কিশোরের। সবাই মিলে রওনা হয়ে গেল। মেইন স্ট্রীটে এসেছে, উত্তেজিত গলায় বলে উঠল কিশোর, 'ওই দেখো। সেই লাল-দাড়ি।'

কিশোরের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল বাকি তিনজনও।

'তাই তো,' বলল রবিন। 'ব্যাটা অন্য গাড়ি চড়ে যাচ্ছে।'

দাঁতে দাঁত চাপল কিশোর। এবার আর লাল-দাড়িকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে দেবে না। পিছু নিল। লোকটার গাড়ির লাইসেন্স নম্বরও মুখস্থ করে নিল।

দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছে লোকটা। বাধ্য হয়ে কিশোরকেও গতি বাড়াতে হলো। পেট্রল পুলিশের হাতে ধরা পড়লেই গেছি, মনে মনে ভাবল কিশোর। কিন্তু ওরা শহরের বাইরে চলে এসেছে। পেট্রল পুলিশ চোখে পড়ল না। চলল অনুসরণ।

লাল-দাড়ি বোধহয় বুঝতে পেরেছে তার পিছু নেয়া হয়েছে। গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল সে। তীব্র বেগে ছুটতে লাগল তার গাড়ি। কিন্তু কিশোর তার পেছনে জোঁকের মত সেঁটে রইল।

দক্ষিণ দিকে চলেছে ওরা। লক লোমোন্ডের রাস্তা ওদিকেই।

'হাউসবোটে যাচ্ছে বোধহয়,' মন্তব্য করল রবিন।

মুসা বলল, 'এইবার পেয়েছি ব্যাটাকে। এক ঘুষিতে ওর নাক ভেঙে না দিয়েছি তো আমার নাম মুসা না।'

হাসতে গিয়েও হাসল না কিশোর। মুখ গোমড়া হয়ে গেছে ওর গ্যাস গজের দিকে চোখে পড়তে। ওটা খালি। তীব্র বিতৃষ্ণা নিয়ে কিশোর বলল, 'ইস্! তেল শেষ! এবারেও ধরা হলো না ওকে।'

আঠারো

কিশোরের কথা মাত্র শেষ হয়েছে, খকখক করে কেশে উঠল ইঞ্জিন। ধুঁকতে ধুঁকতে দাঁড়িয়ে পড়ল। হতাশায় গুঙিয়ে উঠল কিশোর।

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে শ্রাগ করল রবিন। 'কি আর করা। গাড়িটাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমরা খেয়াল করলাম না কেন।'

জবাবে কিশোর কিছু বলল না। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ও, দৌড় দিল একটা বাড়ি লক্ষ্য করে। দরজার কড়া নাড়ল। সুন্দরী, হাসিখুশি চেহারার এক মহিলা খুলে দিল দরজা।

জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আপনাদের ফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি? পুলিশে খবর দেব।'

সন্দিহান চোখে কিশোরের দিকে তাকাল মহিলা। তারপর হেসে বলল, 'তুমিই সেই বাংলাদেশী কিশোর গোয়েন্দা, না? ফটোগ্রাফি ইন্টারন্যাশনালে ছবি দেখেছি তোমার।'

'জ্বী-হ্যাঁ, আমিই সেই,' জবাবে কিশোরও হাসল। বেশি কথার মধ্যে গেল না।

মহিলা ভেতরে আসতে বলল কিশোরকে। হলঘরের টেবিলের ওপর রাখা ফোনটা দেখিয়ে দিল। স্থানীয় থানায় কিভাবে যোগাযোগ করবে সে-ব্যাপারে কিশোর সাহায্য চাইল মহিলার কাছে। মহিলা ফোন ধরে দিল। ও ধার থেকে জবাব দিলেন সুপারিনটেনডেন্ট।

'জ্বী, বলুন?'

লাল-দাড়ির কথা জানাল সুপারিনটেনডেন্টকে কিশোর। বলল ওর সন্দেহ লোকটা ভেড়াচোর। 'ইন্সপেক্টর ক্রুগার এবং পিটার চেনেন আমাকে,' শেষে যোগ করল ও।

'তোমার গল্পটা বেশ ইন্টারেস্টিং তো,' বললেন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট জেমস অ্যালিস্টার। বোঝা গেল কিশোরের কথা বিশ্বাস করছেন না তিনি।

কিশোর অনুনয় করল, 'আপনি লোকটাকে গ্রেফতারের ব্যবস্থা করুন, প্লীজ!' অ্যালিস্টারকে গাড়ির লাইসেন্স নাম্বার দিল সে। 'লোকটাকে ধরতে পারলে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাবেন? আমি ওকে সনাক্ত করতে পারব।'

এতক্ষণে বিশ্বাস হলো বোধহয় অ্যালিস্টারের। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে। আমি এখনই ওকে ধরার ব্যবস্থা করছি। তুমি এখানে চলে এসো। আরও কথা আছে মনে হচ্ছে তোমার। সবটা শোনা যাক।'

'আচ্ছা,' বলে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ঠিকানা জেনে নিয়ে ফোন রেখে দিল কিশোর। মিসেস টেনর, মানে যার বাড়িতে ঢুকে ফোন করেছে কিশোর, তার কাছে পেট্রল সার্ভিসের নম্বর জানতে চাইল। নম্বর জেনে পেট্রল সার্ভির্সকে ফোন করল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল পেট্রল সার্ভিসের জন্যে।

মিসেস টেনর কৌতূহল প্রকাশ করল লাল-দাড়ির ব্যাপারে। জিজ্ঞেস করল, 'ওই লোক কি তোমার কোন কেসের সঙ্গে জড়িয়েছে?'

কিশোর সংক্ষেপে জানাল, 'আমি ফোর্ট উইলিয়ামে লেডি ওয়াগনারের ওখানে উঠেছি। আপনি বোধহয় জানেন ওই এলাকা থেকে বেশ কিছুদিন ধরে ভেড়া চুরি হয়ে যাচ্ছে। আমার ধারণা লাল দাড়িওয়ালা যে লোকটার কথা বললাম, সে ভেড়াচোরদের সঙ্গে জড়িত।'

কিশোরের জবাব সন্তুষ্ট করল মহিলাকে। বলল, ' লেডি ওয়াগনারের সঙ্গে যে দেখা করতে আসছ তুমি সেটা কাগজে পড়েছি।'

'তারমানে আমার কোন খবরই আর অজানা নেই এ অঞ্চলে,' তিক্ত হাসি হাসল কিশোর। 'আমার এক বন্ধু আমার একটা ছবি ছেপে দিয়েছিল পত্রিকায়।

সেটাই হয়েছে কাল। আমার সেই বন্ধুটি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছে আরও দু'জনের সঙ্গে। আমি যাই,' উঠে দাঁড়াল ও। পার্স বের করল। ফোনের বিল দেয়ার জন্যে।

রীতিমত আপত্তি জানাল মহিলা। 'আরে না না। টাকা দেবে কি! তোমার মত গোয়েন্দার সাথে যে পরিচিত হলাম সেই তো আমার সাত কপালের ভাগ্যি। এই বয়েসে যে কেউ শার্লক হোমস কিংবা এরকুল পোয়ারোর মত গোয়েন্দা হয়ে উঠতে পারে সেটাই আমার জানা ছিল না।'

'এবার কিন্তু সত্যি আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন।' মহিলাকে আর টাকা সাধল না কিশোর।

মিসেস টেনর এগিয়ে দিতে গেল কিশোরকে।

এমন সময় বড় এক ক্যান পেট্রল নিয়ে হাজির হয়ে গেল পেট্রল সার্ভিসের লোক। কিশোরের গাড়ির ট্যাঙ্কে পেট্রল ঢালল। বন্ধুদের সঙ্গে মিসেস টেনরের পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর। তারপর উঠে পড়ল গাড়িতে।

কিশোর ওয়াগনার হাউসের দিকে যাচ্ছে না দেখে অবাক হলো রবিন। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'থানায়,' সংক্ষেপে জবাব দিল কিশোর।

থানায় ঢুকেই খুশি হয়ে উঠল ওরা। অবশেষে ওদের পরিশ্রম সফল হয়েছে। ধরা পড়েছে লাল-দাড়ি। সুপারিনটেনডেন্ট অ্যালিস্টারের ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চেঁচাচ্ছে গাঁক গাঁক করে। নিজেকে নিরপরাধ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে।

'আমি ওয়ারেন স্টোন। একজন আমেরিকান। খামোকা আপনারা আমাকে ধরে এনেছেন। ছেড়ে দিন এখুনি। নইলে পরে পস্তাবেন বলে দিচ্ছি,' হুমকি দিতে লাগল লোকটা।

মুসা, রবিন ও এরিনা ঘরের পেছন দিকে গিয়ে বসল। কিশোর এগিয়ে গেল সামনে। লাল-দাড়ির কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিলেন অ্যালিস্টার। 'তুমি কিশোর পাশা?'

নামটা শোনামাত্র পাক খেয়ে ঘুরল লাল-দাড়ি, মুখোমুখি হয়ে গেল কিশোরের। তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। অফিসার বললেন, 'কিশোর পাশাকে তুমি নিশ্চয়ই চেনো?'

চমকে যাওয়াটা দ্রুত সামলে নিল ওয়ারেন স্টোন। চেঁচিয়ে উঠল, 'একে জীবনে দেখিনি আমি।'

একজন কনস্টেবল ঢুকল ঘরে। রবিন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল তার দিকে। নিচু গলায় বলল, 'ওই লাল-দাড়ি লোকটা ছদ্মবেশী। নকল দাড়ি গোঁফ লাগিয়েছে।'

কনস্টেবল শুনে কিছু বলল না। হাসল শুধু। মিস্টার অ্যালিস্টারের কাছে গিয়ে কানে কানে কি যেন বলল।

'তাই নাকি? আচ্ছা দেখছি,' বললেন অ্যালিস্টার। কনস্টেবলকে আদেশ

দিলেন আসামীর দাড়ি গোঁফ পরীক্ষা করে দেখতে, ওগুলো আসল না নকল।

ভয়ানক আপত্তি জানাল ওয়ারেন স্টোন। কিন্তু লাভ হলো না। তার দাড়ি ধরে টান মারতেই মুখ থেকে খুলে এল ওটা। দেখা গেল গোঁফও নকল। এমনকি মাথার চুলও। উইগ পরেছিল সে। তার চুলের রং আসলে কালো।

ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। 'আরে, এ তো কিম ব্রাগনার! রকি বীচে দেখেছি একে।'

মুসা, রবিন আর এরিনাও এগিয়ে এল নকল লোকটাকে দেখতে। উত্তেজিত হয়ে ওরা ওকে নিয়ে কথা বলছে, হাত তুলে সবাইকে থামতে বললেন অ্যালিস্টার। বললেন, 'কিশোর পাশা, তোমার গল্পটা শোনাও তো।'

প্রথম থেকে শুরু করল কিশোর। জানাল এই কিম ব্রাগনার কৌশলে তার অটোগ্রাফ সংগ্রহ করেছিল। 'লোকটাকে রকি বীচে এক নজর দেখেছিলাম আমি। এজন্যেই এডিনবার্গে ওকে চেনা চেনা লাগছিল। ও-ই আমাদের পিছু নিয়েছিল। তখন অবশ্য ছদ্মবেশে ছিল সে।'

কিশোর জানাল হারানো জিনিসের খোঁজে স্কটল্যান্ডে এসেছে ওরা। তার সন্দেহ কিম ব্রাগনার নিজে অথবা তার দলের লোক ওটা চুরি করেছে।

'আমি কিছু চুরি করিনি,' ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল কিম।

কিশোর ওর দিকে ফিরেও তাকাল না। সে তার কথা বলে যেতে লাগল। বলল ভেড়াচোরের দল নিয়ে কিভাবে ওর মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, কিভাবে গোপন কোড মেসেজের মাধ্যমে প্রথমে হাউসবোটে চোরের সন্ধান পায়, তারপর পায় বেন নেভিসের গোলাবাড়িতে।

কিম ব্রাগনারের চেহারা বিবর্ণ হয়ে উঠল। 'তুমি কি বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

মিস্টার অ্যালিস্টারের দিকে ফিরল কিশোর। 'এই কিম একটা ব্যাপার অস্বীকার করতে পারবে না যে আমার একটা অটোগ্রাফ তার দখলে আছে। আমার ধারণা, কিমের দলের কোন একজনের বউ আমার সই জাল করে ব্যাংক থেকে টাকা তুলেছে। হয় মহিলার সঙ্গে আমার চেহারার মিল আছে, চুলটুল কেটে নিয়ে ছেলে সেজে ব্যাংকে গিয়েছে, নয়তো স্রেফ ছদ্মবেশ নিয়ে কাজটা করেছে সে।'

সুপারিনটেনডেন্ট কটমট করে তাকালেন আসামীর দিকে। 'এ অভিযোগের ব্যাপারে তোমার কি বলার আছে?'

'কিছুই না। কারণ এ ছেলে যা বলছে তার কোনটাই সত্যি নয়। আমি কিম ব্রাগনারই নই। আমাকে ছেড়ে দেয়া হোক।'

তবে নিজের সঠিক পরিচয় দিতেও ব্যর্থ হলো সে। সুপারিনটেনডেন্ট বললেন কিমের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে এবং সেগুলোর স্বপক্ষে যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে কিমকে সহজেই হাজতে ঢোকানো যেতে পারে। জামিনও পাবে না সে।

মিস্টার অ্যালিস্টারের নির্দেশে পুলিশ কিম ব্রাগনারকে নিয়ে গিয়ে হাজতে

ভরল। পরে জেলে পাঠানো হবে। তিনি কিশোরকে আরও কিছু প্রশ্ন করলেন। শেষে বললেন, 'সত্যি, বুদ্ধিমান ছেলে তুমি, কিশোর পাশা!'

প্রশংসা সব সময়ই বিব্রত করে কিশোরকে। লজ্জায় লাল হলো সে। বলল, 'আপনার ফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি? আমাদের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে লেডি ওয়াগনার নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন।'

'অবশ্যই করতে পারো,' বললেন অ্যালিস্টার।

প্রাসাদে ফিরে এল গোয়েন্দারা।

সমস্ত ঘটনা শুনে লেডি ওয়াগনার তো অবাক। কিশোররা ফিরে যেতে তৈরি হলো। এ সময় একজন কনস্টেবল ঢুকল ঘরে। কিছুক্ষণ আগে কিমকে জেলে ঢোকাতে গিয়েছিল এ লোক।

'আসামী তোমাদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়,' বলল সে।

'কি কথা?' জানতে চাইল কিশোর।

'তা বলতে পারছি না।'

সুপারিনটেনডেন্ট নিজে কিশোরদেরকে কিমের কাছে নিয়ে গেলেন।

ওদের দেখে খুশিতে উজ্জ্বল হলো কিমের মুখ। 'আমি আগেও বলেছি কোন অপরাধ আমি করিনি, এখনও বলছি। তবে হারানো ব্রোচটা কোথায় আছে জানি আমি। আমাকে ছেড়ে দিলে বলব।'

কিমের কথা শুনে গোয়েন্দারা অবাক। একযোগে ঘুরল মিস্টার অ্যালিস্টারের দিকে। সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার তাঁর।

তিনি দৃঢ় গলায় বললেন, 'তোমাকে এ সময়ে আমি ছেড়ে দিতে পারি না। তবে হারানো ব্রোচ সম্পর্কে সত্যি কথা বললে তোমার ব্যাপারটা আমি বিবেচনা করে দেখতে পারি।'

শ্রাগ করল কিম। 'ঠিক আছে, বলছি। ব্রোচটা চুরি করেছে লেডি ওয়াগনারের বাটলার হেনরি।'

উনিশ

'হেনরি!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা, হতবাক। 'ব্রোচ সে চুরি করতেই পারে না!'

মুখ বাঁকাল কিম। 'তোমাদের ধারণা বাটলার খুব সৎ মানুষ। খোঁজ নিয়ে দেখলেই জানতে পারবে আসলে সে কি।'

কিমের কথা শুনে অবাক কিশোর আর তার বন্ধুরা। হেনরি চোর বিশ্বাস করতে সায় দিচ্ছে না মন। অবশ্য কতটুকুই বা চেনে ওরা লোকটাকে।

'ঠিক আছে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখছি,' বলল রবিন।

রবিনের কথায় সায় জানাল কিশোর।

ওরা থানা থেকে বেরিয়ে এল। গাড়িতে উঠল। ফোর্ট উইলিয়ামের দিকে

গাড়ি ছোটাল কিশোর। মাঝ পথে শুধু একটা দোকানের সামনে এক মিনিটের জন্যে থামল। এরিনাকে পাঠিয়ে পারদ আর পেইন্ট ব্রাশ কিনে আনাল।

প্রাসাদে পৌঁছেই ওরা ছুটল লেডি ওয়াগনারের ঘরে। হেনরি সম্পর্কে যা শুনেছে খুলে বলল সব।

'কথাটা বিশ্বাস করতে পারলাম না,' বললেন লেডি ওয়াগনার। 'হেনরি এখানে বহু বছর ধরে আছে। ওর সততা সম্পর্কে কোন দিন প্রশ্ন তুলিনি।'

তবু হেনরিকে এ ব্যাপারে একবার জিজ্ঞেস করবেন ঠিক করলেন তিনি। হেনরি জানে না কিসের জন্যে ডাকা হয়েছে তাকে, হাসিমুখে ঘরে ঢুকল সে।

'তোমাকে জিজ্ঞেস করতেও লজ্জা লাগছে', ইতস্তত করে বললেন লেডি ওয়াগনার, 'তবু জিজ্ঞেস না করে পারছি না। একজন অভিযোগ করেছে কিশোরের চাচী মেরিকে যে পোখরাজ বসানো ব্রোচটা আমি দিতে চেয়েছিলাম ওটা নাকি তুমি নিয়েছ?'

শুনে মুখ সাদা হয়ে গেল হেনরির। কাঁপতে শুরু করল। অনেকক্ষণ কথাই বলতে পারল না। লোকটার জন্যে মায়া লাগল কিশোরের। কিন্তু কিছু বলল না। যা বলার লেডি ওয়াগনারই বলবেন।

অবশেষে নিজেকে সামলে নিল হেনরি। 'লেডি ওয়াগনার,' দৃঢ় গলায় বলল সে, 'আমি আপনার ব্রোচ নিইনি। ওটার সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি। কে এ ধরনের নোংরা অভিযোগ করেছে জানি না তবে আমার ধারণা ওই লোক নিজের অপকর্ম ধামাচাপা দেয়ার জন্যেই এমন কাজ করেছে।'

বিশ্বস্ত কর্মচারীটির দিকে তাকিয়ে হাসলেন লেডি ওয়াগনার। 'তোমার কাছ থেকে এ রকম জবাবই আশা করেছিলাম, হেনরি। জানতাম এ কাজ তোমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

হেনরিকে কিম ব্রাগনারের কথা জানাল কিশোর। বলল, 'লোকটার কাছ থেকে পুলিশ স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারলে আমরা হারানো ব্রোচ রহস্যের সমাধান করতে পারব বলে আশা রাখি।'

হেনরিকে যে বিশ্বাস করে কিশোর সেটা বোঝানোর জন্যে গবলিট দিয়ে আয়না তৈরির ব্যাপারে সাহায্য চেয়ে বসল তার কাছে। আয়না দিয়ে কি হবে বুঝতে পারল না হেনরি। যখন শুনল এ দিয়ে রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হবে, সাহায্য করার জন্যে উৎসাহিত হয়ে উঠল সে। কিছুক্ষণের মধ্যে, গবলিটে পারদ মাখিয়ে ওটা শুকিয়ে ফেলল হেনরি। গবলিটের রূপান্তর ঘটল সিলিন্ডার আয়নায়। এখন এটা দিয়ে কাজ চালানো যাবে।

গবলিট আয়না ক্যানভাসের বোর্ডের মাঝখানে উল্টো করে বসাল কিশোর। লেডি ওয়াগনার, হেনরি এবং অন্যান্যরা আগ্রহ নিয়ে দেখছে কিশোরের কাণ্ড। জ্যাবরা থ্যাবরা রং-এর মাঝ দিয়ে আয়নায় ফুটে উঠল একটা পাথুরে টাওয়ারের প্রতিচ্ছবি।

'টাওয়ারটা কিসের বলতে পারবেন?' লেডি ওয়াগনারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

লেডি ওয়াগনার টাওয়ারের প্রতিচ্ছবির দিকে কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন তার ধারণা ওটা কোন প্রাচীন দালানের ধ্বংসাবশেষ হবে। হেনরিও সমর্থন করল তাকে।

বলল, 'এ জায়গাটা আমি চিনি। পরিত্যক্ত এক জায়গায় টাওয়ারটার অবস্থান। এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। টাওয়ার দেখতে চাইলে আমি নিয়ে যেতে পারি।'

'অবশ্যই যাব,' খুশি হলো কিশোর। 'এ জায়গায় ভেড়াচোররা থাকতে পারে। এটা ওদের আরেকটা আস্তানা হওয়াও বিচিত্র নয়।'

পর দিনই টাওয়ার দেখতে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। হেনরি জানাল ধ্বংসাবশেষটাকে তার বিচিত্র আকৃতির জন্যে 'মৌচাক' বলে লোকে। কেউ বলে ব্রচ। শত শত বছর আগের টাওয়ার ওটা।

পরদিন সকালে নাস্তা সেরেই রওনা হয়ে গেল ওরা। হেনরির নির্দেশে সরু একটা মেঠো পথ দিয়ে গাড়ি চালাল কিশোর। মিনিট বিশেক পরে পাথুরে টাওয়ারটা দেখতে পেল ওরা।

'সত্যি মৌচাকের মত লাগছে দেখতে,' মন্তব্য করল মুসা।

গাড়ি থামাল কিশোর। হেনরি ওদেরকে নিয়ে পা বাড়াল ধ্বংসপ্রাপ্ত টাওয়ারের দিকে। একটা মাঠ পার হয়ে গন্তব্যে চলে এল কিশোররা। অদ্ভুত আকৃতির টাওয়ারটার কোন জানালা নেই। বিভিন্ন সাইজের পাথর দিয়ে তৈরি। প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু।

হেনরি বলল, 'এক সময় টাওয়ারটা আরও উঁচু ছিল। ভেঙেচুরে এখন শুধু সামনের অংশটা কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে।'

আগে আগে চলল হেনরি। সরু একটা খোলা জায়গা। ব্রচে ঢোকার একমাত্র পথ। প্যাসেজটা বড় জোর দুই ফুট চওড়া। দশ ফুট পুরু দেয়ালের মাঝখান দিয়ে সুড়ঙ্গের মত চলে গেছে।

পাথরের অসাধারণ কারুকাজগুলো দেখতে দেখতে কিশোর বলল, 'সাংঘাতিক দেখতে!'

একটু পর পরই পাথরের আয়তাকার ফাটল। পাথরের ফলক দিয়ে বন্ধ করা। মেঝের মত লাগছে দেখতে।

'এই ছোট ঘরগুলো কোন কাজে ব্যবহার করা হতো?' জানতে চাইল মুসা।

হেনরি বলল ইতিহাসবিদদের নিজেদের কাছেও ব্যাপারটা পরিষ্কার নয়। কারও মতে শত্রু পক্ষের হামলার সময় গ্রামের সমস্ত বাসিন্দা ঢুকে পড়ত ব্রচে, বন্ধ করে দিত প্রবেশ পথ, বিপদ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকত।

'হয়তো পুরো একটা পরিবার আশ্রয় নিত এ ধরনের ছোট ঘরে,' বলে চলল হেনরি। 'এদিকে একটা গ্যালারি ছিল গোল পেঁচানো সিঁড়িসহ। প্রতি তলাতেই অধিবাসীরা যেতে পারত। মাঝখানে বড় একটা চুলাও ছিল রান্না করার জন্যে। এসো, তোমাদের একটা জিনিস দেখাই।'

কিশোরদেরকে নিয়ে একটা নিচু দেয়ালের সামনে চলে এল হেনরি। আঙুল

তুলে দেয়ালের নিচে দেখাল। 'ওখানে কুয়া ছিল। কুয়া থেকে লোকে পানি তুলত।'

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'এই মৌচাক তো ছিল নিরেট পাথরের তৈরি, চারপাশ দিয়ে আটকানো। মানুষ শ্বাস নিত কিভাবে?'

হেনরি বলল, 'বেশির ভাগ ঐতিহাসিকের ধারণা, টাওয়ারের চূড়া ছিল খোলা আর জাফরি কাটা। সেখান দিয়ে চলাচল করত বাতাস। ফলে শ্বাস নিতে সমস্যা হতো না।'

'লোকে আরামেই থাকত মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল মুসা।

'থেকে দেখবে নাকি?' হাসল রবিন।

দু'হাত নাড়ল মুসা। 'না না, ওসব করতে যাচ্ছি না। আমার কাছে হোটেলই ভাল।'

ওর কথা শুনে হেসে উঠল অন্যরা। সূত্রের আশায় খোঁজাখুঁজি করতে লাগল কিশোর। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না।

'এখানে কারও গোপন আস্তানা থাকার কোন আলামত তো পাচ্ছি না,' শেষে বলল সে।

এরিনা ঘুরল হেনরির দিকে। 'এদিকে আর কোন ব্রচ আছে?'

হেনরি মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল আছে। কিশোর গোঁ ধরল সেখানে যাবে। হেনরির পিছু পিছু আরেকটা মৌচাকে হাজির হলো ওরা। শুরু করল তদন্ত। হঠাৎ উত্তেজিত গলায় বলে উঠল গোয়েন্দাপ্রধান, 'কতগুলো লোম দেখতে পাচ্ছি এখানে। ভেড়ার চামড়াও আছে।'

'ভেড়াচোররা এ জায়গাটা ব্যবহার করে বলে সন্দেহ করছ?' জিজ্ঞেস করল এরিনা।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'এই লোম আর চামড়া দিয়ে বোঝা যাচ্ছে তারা বিক্রি বা জবাই করার জন্যে জ্যান্ত ভেড়া নিয়ে অন্য কোথাও যায় না। এখানে বসেই জবাই করে। শুধু লোম আর চামড়া দরকার ওদের।'

শুনে 'অঁক' করে উঠল রবিন। 'তার মানে এটা একটা কসাই খানা?'

কিশোর জবাবে কিছু বলল না। হেনরিকে খুঁজছে। আশপাশে না দেখে ধারণা করল হেনরিও ওদের মত তদন্তে নেমে পড়েছে। ঠিকই ধরেছে কিশোর। একটু পরেই ফিরে এল হেনরি। জানাল একটা বড় গর্তে প্রচুর হাড়গোড় দেখে এসেছে। তার ধারণা ওগুলো ভেড়ার কঙ্কালের অবশিষ্ট।

'তার মানে এটা শুধু কসাইখানা নয়, ভেড়াদের গোরস্তানও,' গম্ভীর হয়ে গেল রবিন।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল, ভেড়াচোররা ভেড়া চুরি করে এনে লুকিয়ে রাখত উপত্যকায়, ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলত। তারপর ট্রাকে করে নিয়ে আসত এই ব্রচে। এখানে ভেড়াগুলোকে জবাই করত তারা, ছাল-চামড়া ছড়িয়ে, মাংস নিয়ে, নাড়ীভুঁড়িসহ বাকি অংশ মাটিতে পুঁতে ফেলত পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে।

‘এক্ষুণি একবার ওয়াগনার হাউসে যাওয়া দরকার,’ কিশোর বলল। ‘পুলিশকে ফোন করব।’

ঝড়ের বেগে বাড়ি ফিরে এল ওরা। থানায় ফোন করল কিশোর। ঘটনা শুনে অ্যালিস্টার বললেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্রোচে লোক পাঠিয়ে চোরগুলোকে হাতেনাতে ধরার ব্যবস্থা করবেন।

‘কোন খবর পেলেই জানাব তোমাকে,’ প্রতিশ্রুতি দিলেন কিশোরকে।

পরদিন সকালে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের ফোন এল। জানালেন, ‘ব্রোচে গিয়ে কাউকে ধরা যায়নি। তবে তোমার ধারণা অমূলক নয়। ক্লাইডের কাছে ডামবারটনে ইন্সপেক্টররা একটা অবৈধ শিপমেন্টের খবর পেয়েছে। ভেড়ার চামড়া আর লোম নিয়ে একটা ফ্রেইটার আমেরিকা গেছে।’

সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে কথা শেষ করে বন্ধুদেরকে ডাকল কিশোর। ‘ডামবারটন হলো লক লোমোন্ডের দক্ষিণে যেখানে হাউসবোটগুলো ছিল। আমি শিওর ধাওয়া খেয়ে কিম ব্রাগনার ওখানেই যাচ্ছিল।’

রবিন বলল, ‘কিন্তু পেইশা বা অন্যদের তো খোঁজ পাওয়া গেল না। কোথায় তারা?’

শ্রাগ করল কিশোর। ‘ওরা গোলাবাড়িতে নেই, হাউসবোটে নেই, ব্রচেও নেই। আমার ধারণা অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে। সঙ্কেতের অপেক্ষা করছে।’

‘কার কাছ থেকে?’ জিজ্ঞেস করল এরিনা।

‘কিম ব্রাগনারের কাছ থেকে’।

কিশোরের জবাব শুনে অবাক হয়ে গেল ওরা। তবে গোয়েন্দাপ্রধানের কথায় যুক্তি আছে। পেইশার রুমের ব্যাগপাইপের সুরের কথা মনে পড়ে গেল মুসা আর রবিনের।

‘ওই সময় কিমই বোধহয় ঘরে বসে বাঁশির সুর প্র্যাকটিস করছিল,’ রবিন বলল। ‘বেন নেভিসেও তো একই সুর বাজছিল।’

‘এবার ওদের ধরা পড়তেই হবে,’ দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল কিশোর। ‘লেডি ওয়াগনার, আমি চিলেকোঠায় আপনার মায়ের যে ঘাগরাটা দেখেছি, সেটা পরে ছদ্মবেশ নেব। মেয়ে দেখলে সহজে সন্দেহ করবে না চোরেরা। বেন নেভিস পাহাড়ে উঠে সেই জায়গায় যাব যেখান থেকে স্কটিস হোয়া হেই সুরটা বাজাচ্ছিল বংশীবাদক ।’

‘ওখানে গিয়ে কি করতে চাও?’

‘বাঁশি বাজাব।’

‘তুমি ওই সুর বাজাতে পারো?’ অবাক হলেন লেডি ওয়াগনার।

কিশোর জানাল প্রথম কয়েকটা চরণ বাজাতে পারে ও। ভাল হয় না। ‘তবে ওতেই আশা করি কাজ চলে যাবে। কারণ বংশীবাদককেও সব সময় গানের প্রথম চরণগুলোই বাজাতে শুনেছি। বাজানোও তেমন ভাল হয় না। একটা চ্যান্টারও দরকার হবে আমার শিস দেয়ার জন্যে। কারণ ভেড়াচোরদের দ্বিতীয় সঙ্কেত ছিল শিস। আমাকে একটা চ্যান্টার জোগাড় করে দিতে পারবেন?’

গোটা ব্যাপারটাতে বেশ মজা পাচ্ছেন লেডি ওয়াগনার। বললেন, 'হেনরি আগে এক কারখানায় রীড মেকারের কাজ করত। ওর কাছে অনেক ব্যাগপাইপও আছে। যদিও যন্ত্রটা একদমই বাজাতে পারে না সে। আমি ওকে বলে দিচ্ছি ব্যাগপাইপ নিয়ে আসতে,' রশি ধরে টান দিয়ে ঘণ্টা বাজালেন তিনি।

একটু পরে ঘরে ঢুকল হেনরি। লেডি ওয়াগনারের কথা শুনে অবাক। কিশোরদেরকে সাহায্য করতে রাজি হয়ে গেল সে। নিজের ছোট বসার ঘরে নিয়ে গেল সবাইকে। এখানেই ব্যাগপাইপ জমিয়ে রাখে সে

'খুব ভাল অবস্থায় আছে ব্যাগপাইপগুলো,' গর্বিত কণ্ঠে ঘোষণা করল সে। 'বাজিয়ে দেখো।'

মুচকি হাসল কিশোর। পরীক্ষা করতে বসে গেল। ঠিকই বলেছে হেনরি। ব্যাগপাইপগুলো সত্যিই ভাল অবস্থায় আছে। কিশোর হালকা একটা ব্যাগপাইপ বেছে নিল যাতে বয়ে নিতে কষ্ট না হয়। স্কটিস হোয়া হেইর সুর তুলল বাঁশিতে। পরপর কয়েকবার গানটার প্রথম চরণগুলো প্র্যাকটিস করল।

'শিস দেয়া যায় এমন একটা রীড বানিয়ে দেবেন আমাকে?' হেনরিকে অনুরোধ করল কিশোর।

'অবশ্যই দেব,' রাজি হলো হেনরি। 'এক ঘণ্টার মধ্যে পেলে চলবে?'

কিশোর বলল, 'খুব চলবে।'

লেডি ওয়াগনার ওদেরকে নিয়ে নিজের বসার ঘরে চলে এলেন। মুসা জানতে চাইল, 'তোমার পরিকল্পনাটা কি শুনি।'

হাসল কিশোর। 'ঠিক করেছি আজ সন্ধ্যায় আমরা চারজন মিলে বেন নেভিসের উপত্যকায় যাব। সূর্যাস্তের সময় আমি উঠে যাব পাহাড়ে, যেখানে বংশীবাদককে দেখেছিলাম। তারপর দুটো সঙ্কেতই দেব, হোয়া হেই বাজানো এবং শিস। যদি চোরের দল ওখানে থেকে থাকে–আমার ধারণা থাকবে–তাহলে আমার সঙ্কেত পাওয়া মাত্র ঘটতে শুরু করবে ঘটনা।'

'তোমার প্ল্যানটা দারুণ,' তারিফ করল মুসা। 'তবু মনে হয় নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে সঙ্গে পুলিশ নিয়ে যাওয়া উচিত।'

লেডি ওয়াগনারও একই কথা বললেন। নিজেই ফোন করে দিলেন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টকে। অ্যালিস্টার জানালেন সন্ধ্যার আগেই দু'জন পুলিশ অফিসারকে ওয়াগনার হাউসে পাঠিয়ে দেবেন।

ঘণ্টাখানেক পর হেনরি রীড নিয়ে এল কিশোরের জন্যে। সাথে চ্যান্টার। জিনিস দুটো পেয়ে খুব খুশি কিশোর। তখনই বসে গেল শিস প্র্যাকটিসে।

নির্ধারিত সময়ে ওয়াগনার হাউসে পৌঁছে গেল দুই পুলিশ অফিসার–ক্রুগার আর পিটার। দু'জনের হাতেই দূরবীন।

ক্যারি সবার জন্যে টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার দিয়ে দিল। দুটো গাড়িতে চড়ে রওনা হয়ে গেল দুই দল। ক্যাম্পসাইটে পৌঁছে আগে খেয়ে নিল ওরা, তারপর রহস্য নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠল। বিকেলের আলো ম্লান হতে শুরু করেছে, এই সময় পাহাড়ে উঠতে শুরু করল সবাই।

ক্রুগারের হাতে কিশোরের ব্যাগপাইপ। নিচু গলায় কিশোরের সঙ্গে বকবক করে চলেছে সে। কিশোরের সাথে ভালই জমেছে তার।

গন্তব্যের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছেছে ওরা, বাম দিকে পাথর আর গাছের আড়াল থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ হলো। দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোর। ক্রুগারকে দাঁড়াতে বলে ব্যাপারটা কি দেখে আসার জন্যে নিজেই এগিয়ে গেল। দূর প্রান্তে, একটা ঝোপের ধারে একটা ভেড়ার বাচ্চা দেখতে পেল ও। অজ্ঞাত কারণে ভয়ে কাঁপছে। গলা দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করছে। বাচ্চাটাকে দেখে মায়া লাগল কিশোরের। ওটাকে অভয় দেয়ার জন্যে এগিয়ে গেল।

ঠিক তখনই টের পেল কেউ রয়েছে ওর পেছনে। ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। কাছের একটা গাছের ডালে বসে আছে একটা প্রকাণ্ড বনবিড়াল। ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত!

বিশ

বনবিড়ালটার শিকার ছিল ভেড়ার বাচ্চাটা। মাঝখানে কিশোর এসে পড়ায় ওটা ভয়ানক রেগে গেছে। ভেড়ার বদলে এখন ওকেই আক্রমণ করে বসবে নাকি কে জানে!

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল কিশোরের। সে শুনেছে খুব জোরে চিৎকার করলে এবং পাথর ছুঁড়ে মারলে ভয়ে পালিয়ে যায় বনবিড়াল। চিৎকার করলে ভেড়াচোরেরা পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু উপায় নেই। ঝুঁকিটা নিতেই হবে। বনবিড়ালটা তাকে প্রাণে মারতে না পারলেও আঁচড়ে খামচে মারাত্মক আহত করতে পারবে।

চিৎকার করে উঠল সে, 'যা। ভাগ। ভাগ বলছি!' পাথর খুঁজতে লাগল মরিয়া হয়ে। বড়সড় এক খণ্ড পাথর পেয়ে ছুঁড়ে মারল দাঁত মুখ খিঁচাতে থাকা হিংস্র প্রাণীটার দিকে।

ভড়কে গেল বনবিড়াল। ঝাঁপ দিল কিশোরকে সই করে। লাফ দিয়ে সরে গেল কিশোর। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো বনবিড়াল। তবে আর আক্রমণ চালাল না কিশোরের ওপর। ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে গোটা দুই ধমক দিল। পরের বার বাগড়া দিলে আর ছাড়বে না বুঝিয়ে দিয়ে যেন সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ল একটা ঝোপের মধ্যে।

উত্তেজনা, চিৎকার, পাথর ছোঁড়া একসঙ্গে এত সব করে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছে কিশোর। বড় বড় দম নিতে নিতে বসে পড়ল ভেড়ার বাচ্চাটার পাশে। ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এখানে এসেছিলি কেন মরতে? যা, মায়ের কাছে চলে যা।' বাচ্চাটার পিঠে আলতো চাপড় দিল সে।

উতরাইয়ের দিকে ছুটে চলে গেল বাচ্চাটা।

চিৎকার শুনে ছুটে এল মুসা, রবিন আর দুই পুলিশ ইন্সপেক্টর। কি ঘটেছে ওদেরকে জানাল কিশোর। আশঙ্কা প্রকাশ করল চিৎকার শুনে ভেড়াচোরেরা পালিয়ে যেতে পারে।

'তবু চেষ্টা করে দেখি চোরগুলোকে ধরা যায় কিনা,' বলে উঠে পড়ল কিশোর।

দলবল নিয়ে পাহাড়চূড়ায় উঠে এল ও। কিশোরের হাতে ব্যাগপাইপ ধরিয়ে দিয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল ক্রুগার। একা হয়ে গেল কিশোর। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সুর তুলল বাঁশিতে।

দুই ইন্সপেক্টর চোখে দূরবীন লাগিয়ে চষে ফেলছে গোটা এলাকা। পাহাড় থেকে অনেক নিচে, একটা খাদের মধ্যে একপাল ভেড়া দেখতে পেল ওরা। ভেড়াগুলোর সঙ্গে চারজন মেষপালকও রয়েছে।

'দেখছেন কিছু?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

মুসার হাতে দূরবীন তুলে দিল পিটার। যদি মেষপালকদের কাউকে চিনতে পারে। অনেকক্ষণ লোকগুলোকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করল মুসা। তারপর উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'একজনকে চিনেছি! পেইশা!'

ঠিক ওই মুহূর্তে ক্রুগারের দূরবীনে ধরা পড়েছে একটা বড়সড় ট্রাক। থেমে আছে একটা মেঠো পথের ধারে। পিটারকে বলল, 'চলো, গিয়ে দেখে আসি কি হচ্ছে ওখানে।' গোয়েন্দাদের বলল, 'তোমরা এখানেই থাকো। কিশোর, ঠিক বিশ মিনিট পর শিস দেয়া শুরু করবে।'

ক্রুগারের দিকে হাত বাড়াল রবিন, 'আপনার দূরবীনটাও দিয়ে যান। কি ঘটছে এখান থেকে দেখতে পারব তাহলে আমরা।'

ক্রুগার হেসে ওর দূরবীনটা দিয়ে দিল রবিনকে।

উতরাই বেয়ে নামতে শুরু করল দুই পুলিশ অফিসার।

ব্যাগপাইপের চ্যান্টার বদল করল কিশোর। ঘড়ির দিকে চোখ রাখল। রবিন দূরবীন দিয়ে ভেড়ার পালের ওপর নজর রাখতে ব্যস্ত।

পার হয়ে গেল বিশ মিনিট। শিস বাজানো শুরু করল কিশোর।

দূরবীনে চোখ রেখে কি কি দেখছে কিশোরকে জানাতে লাগল রবিন। 'লোকগুলোর হাতে বন্দুকের মত কি যেন। ওগুলো দিয়ে স্প্রে করছে ভেড়াগুলোর ওপর।'

কিশোর, মুসা এবং এরিনা নিচের দৃশ্য অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। মিনিটখানেক পরে ভেড়াগুলোকে টপাটপ মাটিতে পড়ে যেতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠল ওরা।

বিষ দিয়ে কুকুরকে মেরে ফেলার পর যেমন ভাবে গাড়িতে তোলে মিউনিসিপ্যালিটির লোক, তেমনি করে নিঃসাড় ভেড়াগুলোকে চ্যাংদোলা করে তুলে তুলে ট্রাকের মধ্যে ছুঁড়ে মারতে লাগল লোকগুলো। দেখতে দেখতে ভরে গেল ট্রাক। স্টার্ট দিল গাড়ি। চলে যেতে শুরু করল।

ভয়ানক নিষ্ঠুর এই দৃশ্য দেখে বাকহারা হয়ে পড়েছে রবিন আর মুসা।

গর্জে উঠল মুসা, 'পুলিশ অফিসাররা করছেটা কি? ধরছে না কেন ওদের?'

'হয়তো ওদের পিছু নেবে বলে ধরেনি,' কিশোর বলল।

ট্রাকটা দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেছে।

'আর কিছু করার নেই এখানে,' আবার বলল কিশোর। 'ওয়াগনার হাউসে ফিরে যাই চলো। পুলিশের খবরের জন্যে অপেক্ষা করি।'

নিরাপদে অক্ষত শরীরে সবাইকে বাড়ি ফিরতে দেখে স্বস্তি পেলেন লেডি ওয়াগনার। সব শুনে অবাক হলেন। বললেন, 'খুব দেখালে তোমরা যা হোক।'

হাসল কিশোর। 'দেখানো এখনও শেষ হয়নি। হারানো ব্রোচটা খুঁজে বের করা বাকি রয়ে গেছে।'

রাতে ঘুম হলো না কিশোরের। ক্রুগার আর পিটার কি করছে অনুমানের চেষ্টা করল। শেষে তার মনে হলো, 'ওরা অন্ধকারে ইনফ্রারেড ক্যামেরা ব্যবহার করেছে ছবি তোলার জন্যে। ওগুলো পরে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করবে।'

পরদিন খুব সকালে ফোন এল কিশোরের কাছে। ও যা অনুমান করেছিল তা-ই ঘটেছে। ট্রাকের লোকজন ধরা পড়েছে, ভেড়া পাচারের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ততার কথা শিকারও করেছে। সুপারিনটেনডেন্ট কিশোর এবং তার বন্ধুদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব থানায় যেতে অনুরোধ করলেন। কিশোর তার বন্ধুদের নিয়ে তখনই রওনা হয়ে গেল।

থানায় বসে সব রহস্যের সমাধান পাওয়া গেল। ক্রুগার আর পিটার জানাল কিভাবে তারা পিছু নিয়ে ট্রাকটাকে কব্জা করেছে। চোরদের প্রতিটা কর্মকাণ্ডের ছবি তুলে রেখেছে ওরা। অপরাধের সবচেয়ে বড় প্রমাণ ওই ছবিগুলোই।

চোরের শিরোমণি মিস্টার পেইশা রেগে আগুন। বারবার আফসোস করতে লাগল গ্লাসগো হোটেলে যদি তার নাম ভুল করা না হতো, নির্বোধ কিম ব্রাগনার তার বসকে খুশি করতে গেইলিক ভাষায় ভেড়া পাচারের কথা অনুবাদ না করত, তাহলে আর ওদেরকে ধরা পড়তে হতো না। জানা গেল, দরজা খোলা পেয়ে পেইশার ঘরে ঢুকেছিল কিম। হোটেলের ঝাড়ুদারনি দরজা খোলা রেখে নিচে গিয়েছিল আলমারি থেকে পরিষ্কার তোয়ালে আনতে। সেই ফাঁকে কিম ঘরে ঢুকে আলমারিতে মেসেজটা রেখে চলে আসে।

'তুমি,' কিশোরের দিকে ফিরে গরগর করে উঠল পেইশা , 'ইনভারনেস-শায়ারে যাতে আসতে না পারো সে-রকম নির্দেশ দিয়েছিলাম কিমকে। কিন্তু গাধাটা সে কাজটাকেও লেজেগোবরে করে দিয়েছে।'

কিশোর জানতে পারল রকি বীচে ওদের গাড়ির ওপর ট্রাক উঠিয়ে দিয়েছিল এই কিম ব্রাগনারই, সে-ই পশমী কাপড়ে মুড়ে হুমকি পত্র পাঠিয়েছিল। ওকে ভয় দেখানোর জন্যে ডাকবক্সে বোমা রাখার জন্যেও দায়ী কিম। টমকে ফোনে হুমকি দিয়েছে সে-ই। স্কটল্যান্ডে কিশোরের গাড়ি খাদে ফেলে দেয়ার চেষ্টাও করেছিল কিম। ভেবেছিল কিশোরকে জখম করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে পারলে সে আর তদন্ত করতে পারবে না।

কিমকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিয়ে আসা হলো। ধমক দিলেন সুপারিনটেনডেন্ট, 'যা যা করেছ, ভাল চাও তো সব খুলে বলো!'

জ্বলন্ত চোখে কিশোরের দিকে তাকাল আমেরিকান লোকটা, 'তুমি খুব চালাক ছেলে, কিশোর পাশা। এতটা যে বিচ্ছু, কল্পনাই করতে পারিনি। তাহলে আরও সাবধান হতাম। হ্যাঁ, রকি বীচে পত্রিকায় তোমার গল্পটা আমিই সরবরাহ করেছিলাম যাতে আমার এবং পেইশার ওপর কেউ সন্দেহ করতে না পারে।' কি মনে পড়তে হাসল। 'তুমি খুব চালাক তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে একবার অন্তত আমার কাছে ধরা খেয়েছ। চুরি করা পাস নিয়ে এডিনবার্গে কোর্ট বিল্ডিঙে ঢুকে কিভাবে বোকা বানিয়ে দিয়েছিলাম, মনে আছে?'

জবাব দিল না কিশোর।

জবাবের অপেক্ষায় থাকলও না কিম। বার বার সুপারিনটেনডেন্টের ধমক খেয়ে স্বীকার করল, আমেরিকায় পাচার হয়ে যাওয়া লোম আর ভেড়ার চামড়া দেখে রাখার দায়িত্ব তার ওপরে ন্যস্ত ছিল।

'যখন জানলাম তুমি স্কটল্যান্ডে যাচ্ছ,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল কিম, 'ঠিক করলাম তোমার আগেই চলে আসব এখানে। তোমাদের প্রতিটা পদক্ষেপের ওপর নজর রাখব। আমি যে এখানে আসছি সেটা জানিয়ে মিস্টার পেইশার ঘরে একটা মেসেজ রেখে আসি। ব্যাগপাইপ দিয়ে সঙ্কেত দেয়ার বুদ্ধিটাও আমারই। মিস্টার পেইশার রুমে আমাকেই তুমি ব্যাগপাইপ প্র্যাকটিস করতে শুনেছ।'

কিশোর ফিরল কিমের দিকে। 'আপনার গেইলিক কোড মেসেজের অনেকটাই অনুমান করে ফেলেছি আমরা। পুরোটা কি হবে?'

পেইশা জানাল, ওই মেসেজে চোরের দলের ট্রাক রুটের কথা লেখা ছিল। লেখা ছিল গভীর একটা খাদের পাশ দিয়ে এগোতে হবে। ভেড়া বহনকারী ট্রাকের পেছনের খাঁচার দরজা শুধু বন্ধ করলেই চলবে না, তালা লাগিয়ে দিতে হবে। লোম আর চামড়া নিয়ে গিয়ে হাউসবোটে রেখে ডামবারটনে পাচারের নির্দেশের অপেক্ষা করতে হবে।

কিশোর বলল মেসেজে আঁকা সবগুলো ছবিরই মানে বুঝতে পেরেছে ও, কেবল দোলনার মত জিনিসটার পারেনি। জিজ্ঞেস করল, 'ওটা দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে?'

চট করে পরস্পরের দিকে তাকাল পেইশা ও কিম। জবাব দিল না। ওদের উদ্দেশে প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে মারল কিশোর, 'আপনাদের কোনজনের স্ত্রীর সঙ্গে আমার চেহারার মিল আছে?'

আবারও চোখাচোখি করল দুই চোর। অবশেষে কাঁধ ঝাঁকাল কিম। 'আমার। ওকে সাথে করে এখানে নিয়ে এসেছিলাম। আকারে উচ্চতায় তোমার সমান। চেহারায়ও সামান্য মিল আছে। তোমার পত্রিকার ছবির সঙ্গে মিলিয়ে ওর চুল কেটে প্লাস্টিকের নাক লাগিয়ে, গালের ভেতর রবারের প্যাড পুরে দিয়ে ছেলে সাজিয়ে ফেললাম। বছর কয়েক আগে কালজীন দুর্গে গিয়েছিল ও। নৌকার মত দেখতে একটা দোলনা দেখেছিল ওখানে। আমাদের ছেলেটা যখন হলো, তাকে শোয়ানোর জন্যে ঠিক ওই রকম দোলনা বানিয়েছিল সে। পেইশা সেটা দেখেছে। ওই দোলনা এঁকে ওকে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছি আমার স্ত্রী এসে গেছে।'

'মানুষ বটে আপনি!' ঘৃণায় নাক কুঁচকাল কিশোর। 'আপনাদের অপরাদের জগতে স্ত্রীকেও টেনে এনেছেন। তারমানে তাকে দিয়েই আমার সই জাল করিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা তুলেছিলেন? ওষুধের দোকান থেকে তাকেই ফোন করে জানিয়েছিলেন আমার অটোগ্রাফ পেয়ে যাওয়ার কথা?'

মাথা ঝাঁকাল কিম। জেরার মুখে স্বীকার করল 'উইদাউট স্ট্যাম্প' কথাটা লিখে তার স্ত্রীর কথাই বোঝাতে চেয়েছে। ওদের দলের সব চোরের হাতেই একটা বিশেষ চিহ্ন উল্কি দিয়ে এঁকে রাখা হয়েছে, পরস্পরকে চেনার জন্যে। নেই কেবল ওই মহিলার হাতে। উইদাউট স্ট্যাম্প–তারমানে 'ছাপহীন'। এই জালিয়াতিটা শুধু পেইশা আর কিমের ব্যক্তিগত গোপন পরিকল্পনা। দলের আর কাউকে জানানো হয়নি ভাগ দেয়া লাগবে বলে।

রহস্যের সমাধান করার জন্যে পুলিশ অফিসাররা ভূয়সী প্রশংসা করল তিন গোয়েন্দার।

কিশোর বলল, 'আরও একজন কিন্তু আমাদের সাহায্য করেছে। রকি বীচে পল কিমের মুখোশ সে-ই খুলে দিয়েছে। সে আমাদের বন্ধু।'

হাসল মুসা। 'তার নাম টমাস মার্টিন।'

'তাকে আমার অভিনন্দন জানিয়ো,' সুপারিনটেডেন্ট বললেন। কিশোরের দিকে ফিরলেন, 'আসামীদের আর কোন প্রশ্ন করতে চাও?'

'হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস মিস্টার কিম এবং সঙ্গীরা বোধহয় জানে লেডি ওয়াগনারের বাড়ি থেকে একটা মূল্যবান ব্রোচ চুরি গেছে। জানতে চাই সেটা কোথায়?'

প্রথমে মুখ খুলতে চাইল না আসামীদের কেউ। সুপারিনটেনডেন্টের কড়া ধমক খেয়ে শেষে পেইশা স্বীকার করল, 'লেডি ওয়াগনারের পরিচারিকা ক্যারি তার এক বন্ধুকে বলেছিল, তার মনিব, মিসেস মারিয়া পাশা নামে তাঁর এক ভাগ্নীকে পোখরাজ বসানো একটা হিরের ব্রোচ উপহার দেবেন। ব্রোচের কথা আমি ক্যারির বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারি। সিদ্ধান্ত নেই আমি আর কিম মিলে ওটা চুরি করব। বিক্রি করে যে টাকা পাব, ভাগাভাগি করে নেব দু'জনে।'

'বাপরে বাপ, কি লোভ! যা দেখে সবই খেতে চায়!' পেইশার দিকে মুখ তুলে তাকাল কিশোর। 'ব্রোচটা এখন কোথায়?'

'লেডি ওয়াগনারের পুকুরের তলায়,' জবাব দিল পেইশা। কিভাবে ওখানে গেল ওটা, তা-ও স্বীকার করল সে। ব্রোচ চুরি করতে গিয়ে লেডি ওয়াগনারের কুকুরের তাড়া খায় সে। আরেকটু হলেই ওটা তাকে কামড়ে দিত। ভেড়া অজ্ঞান করার স্প্রে গানটা সঙ্গেই ছিল তার। উপায় না দেখে স্প্রে করে দেয় কুকুরটার ওপর। বেশি ওষুধ ছিটানো হয়ে গিয়েছিল। কুকুরটা ছটফট করে মরে যায় কিছুক্ষণের মধ্যে।

পেইশা জানাল, ঠিক ওই সময় সে দেখে লেডি ওয়াগনার বাগানে বেড়াতে এসেছেন। তার পোশাকের সঙ্গে আটকানো রয়েছে বহুমূল্য ব্রোচটা। ওটা কিভাবে হাতানো যায় ভাবছে সে, এ সময় কাকতালীয় ঘটনা ঘটল। বোধহয় ঠিকমত

লাগানো হয়নি, লেডি ওয়াগনারের পোশাক থেকে ওটা খুলে পড়ে গেল মাটিতে।

'উনি ঘরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি আমি,' পেইশা বলল। 'তারপর তুলে নিই ব্রোচটা। হঠাৎ একটা পুরুষ কণ্ঠ শুনে দৌড় মারি। কপাল যেদিন খারাপ হয় অঘটন ঘটতেই থাকে। তা ছাড়া তাড়াহুড়ো করতে গেলে যা হয়। কিসের সঙ্গে যেন পা বেঁধে পড়ে যাই। ব্রোচটা হাত থেকে ফস্কে পানিতে পড়ে যায়। এক রাতে ওই বাড়িতে আবার হানা দিই ব্রোচটা উদ্ধারের আশায়। কিন্তু ওবাড়ির দু'জন কর্মচারী ওদিকে হাঁটাহাঁটি করছিল বলে ছেড়ে দিই ব্রোচ উদ্ধারের আশা। কিম আর আমি ঠিক করেছিলাম কিশোররা স্কটল্যান্ড ছেড়ে চলে যাওয়ার পরপরই আবার হানা দেব ওবাড়িতে।'

সমস্ত রহস্যের কিনারা হয়ে গেছে।

প্রাসাদে ফিরে এল গোয়েন্দারা। উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে সবার মুখ।

লেডি ওয়াগনার জানতে চাইলেন কি হয়েছে। সর্বশেষ খবর শুনে তিনিও উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তিন গোয়েন্দা তাড়াতাড়ি সাঁতারের পোশাক পরে ফেলল। তারপর চলল পুকুরের দিকে। ক্যারি আর হেনরিও ওদের সঙ্গী হলো।

বার বার পুকুরে ডুব দিতে থাকল ওরা। পুকুরের তলা খুঁজল তন্নতন্ন করে। জিনিসটা খুঁজে পেল শেষে মুসা। পানির নিচে পুকুরের তলায় জলজ আগাছার মধ্যে কিছু একটা চকচক করতে দেখল সে।

আগাছা সরিয়ে হাতে নিল ওটা। উঠে এল ওপরে।

পোখরাজ আর হীরে বসানো সেই ব্রোচ!

হাত নেড়ে সবাইকে দেখাল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে।

আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন লেডি ওয়াগনার। 'সত্যি সত্যি পেলে তাহলে! ওহ্ কি যে খুশি লাগছে আমার! আহারে, কত কষ্ট করতে হয়েছে তোমাদেরকে এজন্যে।'

পুকুর পাড়ে উঠে এল মুসা। ব্রোচটা বাড়িয়ে দিয়ে হাসিমুখে বলল, 'আপনার হাসি দেখে আমাদের সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে গেছে। নিন।' বন্ধুদের দিকে তাকাল সে। 'তোমরা কি বলো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সবাই।

লেডি ওয়াগনার হাসলেন। কিশোরের দিকে তাকালেন। 'ওহহো, তোমাকে একটা খবর দিতে ভুলে গেছি। আজ তোমার চাচা আসছে এখানে। আমার ভাগ্নী জামাই।'

শুনে খুশি হলো কিশোর।

বিকেলে টমকে ফোন করল সে। সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা জানাল। 'তোমাকে নিশ্চিন্ত করার জন্যেই ফোনটা করলাম। তোমার জন্মদিনে যোগ দিতে পারব আমরা। ঠিক সময়েই ফিরে আসব।'

ফোন ছেড়ে দিল কিশোর। পাশেই দাঁড়ানো ছিল মুসা আর রবিন।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে মুসা বলল, 'যাক, ভালয় ভালয়ই শেষ হলো সব। কানমলা, নাকে খত, আর কোনদিন যদি আমাদের কারও ছবি পত্রিকায় দিয়েছি।

উফ্, কি ঝামেলাটাই না গেল।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'গোয়েন্দাদের কখনও পত্রিকায় ছবি দিতে নেই। তাহলে অপরাধী ধরা মুশকিল হয়ে-পড়ে।'

'তবে এবার ওই ছবির কল্যাণে অনেক সহায়তাও পেয়েছি আমরা,' কিশোর বলল। 'পথে পথে লোকজন কি সাহায্যটাই না করল।'

'ভাল কথা মনে করেছ,' বলে উঠল মুসা। 'আমি আরেকবার মিসেস কারগুনারের বাড়িতে যাবই, যা-ই বলো আর না বলো। যা রান্না! উফ্!'

'পরিবেশটাও দুর্দান্ত,' স্বীকার করল কিশোর। 'আসলেই যাওয়া দরকার। ও বাড়িতে থেকে আরেকবার রাতের দৃশ্য দেখার লোভ সামলাতে পারছি না আমিও।' এরিনার দিকে তাকাল সে। 'এরিনা, এতই যখন করলে, তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে।'

'তা তো যাবই,' হাসল এরিনা। 'তোমাদেরকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে না? কথা দিতে পারি, মিসেস কারগুনারের বাড়ির মত ভাল রান্না হবে না ওখানে, তবে খুব একটা খারাপও হবে না। ওখানকার প্রকৃতিও তোমাকে মোহিত করবে।'

'আসলে স্কটল্যান্ড দেশটাই ভারী সুন্দর,' কিশোর বলল। 'আর সুন্দর এখানকার মানুষগুলোর মন। সুযোগ পেলেই আবার আমি চলে আসব এখানে।'

'সাথে করে আবার কোন রহস্য নিয়ে এসো কিন্তু,' হাসল এরিনা। 'আর দয়া করে আমাকে খবর দিয়ো তোমার সহকারী হওয়ার জন্যে।'

হাসল মুসা। 'কিশোর, মাঝে মাঝে সত্যি তোমাকে বড় ঈর্ষা হয়। সারা দুনিয়ার সবাই যেন তোমার সহকারী হওয়ার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে, কোনমতে একবার মিশলেই খালি হয়।'

'সেটা কি আমার দোষ?'

'উঁহু, গুণ,' হাসিমুখে জবাবটা দিয়ে দিলেন লেডি ওয়াগনার। হঠাৎ আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন, 'মেরি যে কেন তোর জন্যে এত পাগল, তোকে না দেখলে বুঝতাম না।'

সবাইকে অবাক করে দিয়ে কিশোরকে জড়িয়ে ধরলেন লেডি ওয়াগানার। টুক করে চুমু খেয়ে বসলেন গালে। 'আজ থেকে আমি তোর সত্যিকারের নানী। স্কটল্যান্ডে এলে আমার সঙ্গে যদি দেখা করে না যাস, কান ধরে গিয়ে আমেরিকা থেকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসব। এখানে আমার ক্ষমতা তো দেখেই গেলি। পারব যে সেটা বুঝিস?'

***

ভূতের খেলা

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

(এ-বইটি 'গোয়েন্দা রাজু' সিরিজে 'আজব ভূত' নামে ছাপা হয়েছিল। এখন সেটাকে 'তিন গোয়েন্দা'-য় রূপান্তরিত করে 'ভূতের খেলা' নামে ছাপা হলো। গোয়েন্দা রাজু সিরিজের 'আবু সাঈদ' ছিল রকিব হাসানেরই ছদ্মনাম।)

এক

'কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলে কেমন হয়?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'দিয়ে কি বলব? লধশরা রহস্য খুঁজছে?' হাসতে হাসতে বলল কিশোর।

কিশোরের গোয়েন্দা বাহিনীর নাম 'লধশ'। এটা একটা সাঙ্কেতিক শব্দ। 'রহস্যভেদী'র প্রথম অক্ষর 'র' নিয়ে তার সঙ্গে 'দল' যুক্ত করে হয়েছে 'রদল'। বাংলা বর্ণমালায় 'র'-এর পরের অক্ষর 'ল', 'দ'-এর পরের অক্ষর 'ধ', আর 'ল'-এর পরের 'শ', এই তিনটে মিলে হয়েছে 'লধশ'।

'মন্দ হয় না কিন্তু,' তুড়ি বাজাল মুসা। 'মজাই হবে।'

সেপ্টেম্বরের সুন্দর এক সকাল। কিশোরদের গ্রীনহিলসের বাড়ির বাগানের দেয়ালে বসে আছে ওরা। শরতের বাতাসে ডালিয়া আর আপেলের সুগন্ধ। ওদের পায়ের তলায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে টিটু।

'একটু গতর খাটানো দরকার তোর, বুঝলি,' কিশোর বলল।

তার কথা যেন বুঝতে পারল টিটু। লাফিয়ে উঠে সামনের দু'পা তুলে দিল মনিবের হাঁটুতে।

'বিরক্ত লাগছে? তোকে আর কি বলব, বসে থেকে থেকে আমাদেরই অবস্থা কাহিল। কাজকর্ম কিছুই নেই, বুঝলি। এ-রকম চললে লধশ আর বেশিদিন টিকবে না।'

'আজকাল বাবলিও তাই বলে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মুসা। বাবলি মুসার চাচাত বোন। পাশের শহরে থাকে। ছুটি পেলেই চলে আসে চাচার বাড়ি বেড়াতে। শুঁটকি টেরির সঙ্গে যেমন 'তিন গোয়েন্দা'র চিরশত্রুতা, 'লধশ' অর্থাৎ 'রহস্যভেদী দল'-এর সঙ্গে বাবলির তেমন চিরশত্রুতা। 'বাবলি বলে,' মুসা বলল, 'তোমাদের জারিজুরি খতম। রেগে উঠি, তর্ক করি, কিন্তু জোর পাই না।'

'অত হতাশ হওয়ার অবশ্য কিছু নেই,' মনে হলো বন্ধুকে ভরসা দিচ্ছে কিশোর, আসলে তো দিল নিজেকেই। 'দেখো, কারা আসছে।'

পথের মোড় ঘুরে আসতে দেখা গেল 'লধশ'-এর অন্য দুই সদস্য ডলি আর অনিতাকে। কিশোরদের দেখে এগিয়ে এল ওরা। ময়লা ফেলার একটা ঠেলাগাড়ি ঠেলে নিয়ে আসছে।

'এই,' ডেকে জিজ্ঞেস করল ডলি, 'কোন খবর-টবর আছে? রহস্য-টহস্য?'
'নাহ্!' একই সঙ্গে মাথা নাড়ল কিশোর আর মুসা।
'তাহলে চলে এসো না আমাদের সঙ্গে,' পরামর্শ দিল অনিতা। 'খামোকা বসে থেকে থেকে সময় কাটে নাকি?'
বাগানের গেটের কাছে পৌঁছে গেছে দু'জনে। ওদের দেখে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে গেল টিটু।
'হাউফ!' করে নিঃশ্বাস ফেলে ঠেলাগাড়ির হাতলটা ছেড়ে দিল ডলি। 'একেবারে ঘেমে গেছি! জিরিয়ে নিই। ময়লা কুড়ানো যে কী কষ্ট! আর মানুষগুলোই বা কেমন! আরে বাপু কলা খাবি, কমলা খাবি, ভাল কথা; তা খোসাগুলো একটু দেখেশুনে ফেললেই পারিস। তা না, ফেলবে একেবারে পথের ওপর। এদিকে কুড়াতে কুড়াতে আমাদের জান শেষ। তিনটে মাত্র রাস্তা ঘুরেছি তাতেই এই অবস্থা, আর বাকি তো সব বাদই!'
'আসলে লিটার-বিন থাকা দরকার,' কিশোর বলল, 'তাহলে আর যেখানে সেখানে ময়লা ফেলত না লোকে।'
'কাউন্সিলের মিটিঙে নাকি এ-পরামর্শ দেয়া হয়েছিল,' অনিতা বলল, 'চাচার কাছে শুনলাম। কিন্তু বিপক্ষে ভোট পড়েছে বেশি। লিটার-বিন বসাতে নাকি অনেক খরচ।'
'কলার খোসায় আছাড় খেয়ে পড়ে কোমর ভাঙলে বুঝত মজাটা!'
কিশোরও তার সঙ্গে একমত। তার ধারণা, মিটিঙে সে থাকলে বুঝিয়ে-শুনিয়ে সদস্যদের রাজি করাতে পারতই। বলল সে-কথা।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল অনিতা। 'ও, জানো না। ভিলেজ কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, গ্রামের সবাই মিলে রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখবে। বাবা গিয়েছিল মিটিঙে। এসে জানিয়েছে। কি আর করব। পরিষ্কার রাখছি!'
'সর্বনাশ! তাই নাকি!' আঁতকে উঠল মুসা। 'শুনিনি তো!'
'এখন তো শুনলে,' ডলি বলল। 'চিন্তা কোরো না, তোমাদের পালাও আসবে।' বলতে বলতে আবার ঠেলাগাড়ির হাতল ধরল। 'ভাল কথা, মিশা কই? আমাদের সাথে যাবে বলেছিল।'
'চাচি কাজ করাচ্ছে,' কিশোর বলল। 'ঘর ঝাড়তে লাগিয়ে দিয়েছে।'
মিশা মেরিচাচির বোনের মেয়ে। বোন মারা গেছেন। মিশার বাবা আবার বিয়ে করেছেন। মিশাকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছেন নিঃসন্তান মেরিচাচি। কিশোরেরও বাবা-মা নেই। দুর্ঘটনায় মারা গেছেন দু'জনেই। নিজের সন্তানের মত দু'জনকে মানুষ করেন মেরিচাচি। বলেন, 'এদের দায়িত্ব নেয়ার জন্যেই খোদা আমাকে সন্তান দেননি।' তবে সে-জন্যে তাঁর কোনো দুঃখ নেই। কিশোর আর মিশাকে নিয়ে খুব সুখী।
মিশার ঘর ঝাড় দেয়ার কথা শুনে নিজের দুঃখটা যেন অনেকটা হালকা হলো ডলির। 'এই অনিতা, এসো, দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না।'
ওদেরকে চলে যেতে দেখল কিশোরেরা। চুপ করে রইল কয়েক মিনিট। বাগানের এই রোদ আর নীরবতার মাঝে ঝিমুনি আসছে। ফিরে গিয়ে আবার

আগের জায়গায় শুয়ে পড়ল টিটু, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম।

এই সময় চাচি ডাকলেন, 'কিশোর, এই কিশোর, ভাঙতি আছে তোর কাছে?'

লাফ দিয়ে দেয়াল থেকে নেমে বাগানের পথ ধরে দৌড় দিল কিশোর। পিছনে মুসা। দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন মেরিচাচি। বললেন, 'অন্ধদের জন্যে সাহায্য নিতে এসেছে। আমার কাছে পাঁচ ডলারের নোট। খুচরো আছে তোর কাছে?'

'দেখি। লধশদের ক্যাশবাক্সে আছে বোধহয় কিছু।'

ছাউনিতে ঢুকল কিশোর। বাইরে দাঁড়িয়ে রইল মুসা।

'রাখলাম কোথায়?' কয়েকটা টিন ঘেঁটে দেখল কিশোর। একটা ফুলদানির ভিতরে দেখল। 'মিটিংই করি না কতদিন, মনে থাকবে কি করে?'

'তোমার মনে থাকার কথাও নয়,' মুসা বলল। 'আমারও নেই। হিসেব রাখে বব, ও-ই জানে...'

'এই যে, পেয়েছি...'

চামড়ার একটা পার্সের গা থেকে ফুঁ দিয়ে ধুলো ওড়াল কিশোর। নাকে ধুলো ঢুকে যাওয়ায় মুখ বিকৃত করে ফেলল। টাকা নিয়ে ফিরে এল দু'জনে।

হলঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক তরুণ, হাতে একটা চাঁদার বাক্স।

কিশোরের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাড়িয়ে দিলেন চাচি, 'এই যে।'

টাকাটা নিয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল লোকটা। ওটা বাক্সে ফেলে একবার ঝাঁকানি দিল। বাক্সের ভিতরে ঝনঝন করে উঠল খুচরো পয়সা। ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

'কাল আমাদের বাড়িতেও একজন এসেছিল চাঁদা নিতে,' মুসা বলল। 'ওই লোকটা ভাল ছিল। একে কিন্তু একটুও ভাল লাগল না আমার।'

'চেহারা দেখে তো আর মানুষ চেনা যায় না। আর না জেনে কাউকে খারাপ বলাও উচিত নয়।' উপদেশ দিয়ে আবার রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন চাচি।

লোকটার সম্পর্কে কিশোরও একটা মন্তব্য করতে যাচ্ছিল, থেমে গেল ঘণ্টার শব্দে। দ্রুত দরজা খুলতে এগোল সে। ডলি আর অনিতা দাঁড়িয়ে। ভীষণ উত্তেজিত।

'জলদি একটা মিটিং ডাকো!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অনিতা।

'কি হয়েছে?' কিশোর আর মুসা দু'জনেই অবাক।

'ছাউনিতে চলো,' ডলি বলল। 'ওখানেই বলব।'

'চলো,' পা বাড়াল কিশোর।

'কিশোর, কে?' উপরতলা থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল মিশা।

'অনিতা আর ডলি। মিশা, আমরা ছাউনিতে যাচ্ছি।'

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। দুড়দাড় করে নেমে এল মিশা, হাতে ঝাড়ন। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'মেলা কাজ! শেষ আর হতে চায় না...'

রান্নাঘরের দরজা খোলা। উঁকি দিলেন চাচি। মিশার কথা কানে গেছে। মৃদু

হেসে বললেন, 'থাক, অনেক হয়েছে কাজ। গেলে যা ওদের সঙ্গে।'

ছাউনিতে ঢুকল কিশোর, মুসা, ডলি, অনিতা ও মিশা।

কিশোর দরজাটা লাগিয়ে দিল।

তুবড়ি ছুটল ডলির মুখে, 'মিল লেন-এ সাংঘাতিক একটা জিনিস পেয়েছি! এই দেখো!'

নোটবুক থেকে ছেঁড়া একটা কাগজের টুকরো বের করে দিল সে। কি লেখা আছে পড়ার জন্যে কিশোরের কাঁধের উপর দিয়ে ঝুঁকে এল মিশা আর মুসা। কয়েকটা শব্দ আর নম্বর লেখা রয়েছে কালো কালিতে: '২৮ ২৯ জি. এসএইচ. এল. টিল'।

'খাইছে!' মুসা বলল। 'মানে কি এর?'

'অদ্ভুত বলেই তো আনলাম,' অনিতা বলল।

'হুঁ,' আনমনে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ভাবছে।

'কোনও ধরনের সঙ্কেত এটা,' ডলি বলল। 'হয়তো কোন ডাকাত-টাকাতের দল, ব্যাংক লুট করতে চায়...'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' সুর মেলাল মিশা।

'অন্য কিছুও হতে পারে,' বলল অনিতা। 'যা-ই হোক, অনেক দিন পর মিটিং করার মত একটা কিছু পাওয়া গেল।'

'কি জানি!' মুসা বলল। 'তবে মানে বোঝার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোলে অবাক হব না।'

'হুঁ,' আবার বলল কিশোর। 'আর কিছু যখন পাচ্ছি না, বসে থাকার চেয়ে এটা নিয়েই বরং মাথা ঘামাই।'

দুই

লধশের আরও দুই সদস্য রবিন ও বব অনুপস্থিত। আপাতত পাঁচজনেই মাথা খাটাতে বসল। কিছু বুঝতে পারলে অন্য দু'জনকে জানাবে।

'লেখা দেখে কিন্তু মনে হয় না লোকটা লেখাপড়া তেমন জানে,' সঙ্কেতটার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'হাতের লেখা দেখেছ? এ-রকম একজন মানুষ কঠিন কোন সঙ্কেত লিখতে পারবে না। মাথায়ই ঢুকবে না তার।'

'তা ঠিক,' একমত হলো ডলি। 'এখন ভেবে বের করা যাক, আঠাশ উনত্রিশের মানে কি?'

মুসা বলল, 'দুই হাজার আটশো উনত্রিশ হতে পারে। মাঝে ফাঁক রেখে লিখেছে।'

'কেন?' মিশা গম্ভীর। 'কি বোঝাতে চেয়েছে? দূরত্ব? নাকি সময়...'

'সময়ই হবে!' বাধা দিয়ে বলল অনিতা। 'হয়তো দেখা করার একটা সময় ঠিক করেছে ওরা। এক জায়গায় মিলিত হয়ে আলোচনা করবে। দুই হাজার

আটশো ঊনত্রিশতম সেকেন্ড। ষাট দিয়ে ভাগ করলে...'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'উঁহু, যে লিখেছে, সে অত কঠিন অঙ্ক বুঝবে না। আরও সহজ কিছু বলো। এক জায়গায় গিয়ে দেখা করার কথাটা মনে হচ্ছে ঠিকই। সময়ের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা যাক।'

'চব্বিশের বেশি ঘণ্টা নেই যখন,' মুসা বলল, 'হয়তো মিনিট বুঝিয়েছে।'

'কিংবা তারিখ!' চেঁচিয়ে উঠল মিশা।

চট করে ঘড়িতে তারিখ দেখল কিশোর। 'আজ আঠাশ!' অবাক হয়ে বলল সে। 'তাই তো! দিনের কথাই বলেছে। আলোচনার সময়টা নিশ্চয় ঠিক করেছে আঠাশ আর ঊনত্রিশের মাঝামাঝি কোন একটা সময়। তারমানে আজ আর কালকের মধ্যে...'

'মধ্যরাত!' চিৎকার করে উঠল অনিতা। 'রাত বারোটার কথা বলেছে!'

'বলেছিলাম না তোমাকে,' অনিতার দিকে তাকিয়ে বলল উত্তেজিত ডলি, 'রহস্য পেয়ে গেছি!'

'নম্বরের সমাধান নাহয় হলো,' কিশোর বলল, 'বাকিগুলোর মানে কি?'

আলোচনা চলল। একেকজন একেকভাবে ব্যাখ্যা করছে। কোনটাই সঠিক বলে মনে হলো না কিশোরের।

বাগানের বাইরে কার পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল।

'কিশোর,' দরজার বাইরে থেকে চাচি বললেন, 'একটু আয় তো। মুদির দোকানে যেতে হবে।'

'দোকান!' উরু চাপড়ে বলল কিশোর, 'ঠিক! এই তো পেয়ে গেছি! শপ! এস আর এইচ হলো শপ বানানের প্রথম দুটো অক্ষর। জি দিয়ে হয় গ্রোসার। জি. এসএইচ. মানে গ্রোসার'স শপ, অর্থাৎ মুদির দোকান!'

'কি করছিস তোরা?' চাচি বললেন আবার। 'কিশোর, সালাদ ক্রীম লাগবে। চট করে গিয়ে মিস্টার বারবারের দোকান থেকে এক বোতল এনে দিবি?'

কিশোর বলল, 'এই, সবাই বসো। আমি যাব আর আসব।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরোতে হলো তাকে।

ফিরে এল খানিক পরেই। ভিতরে ঢুকে দেখল কোন একটা বিষয়ে সবাই উত্তেজিত। কিশোর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে তার আগের জায়গায় বসতেই অনিতা বলল, 'মুসার কথাই ঠিক। মুদির দোকানে ডাকাতির মতলব করেছে কেউ।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ডলি। 'জি. এসএইচ. দিয়ে গ্রোসার'স শপ। এল. দিয়ে...এল. দিয়ে...থাক, ওটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আর টিলের মানে তো সবারই জানা, দোকানদারদের দেরাজ।'

'ঠিক বলেছ,' কিশোর বলল।

'কিন্তু এল-এর মানে কি?' অনিতার প্রশ্ন। 'কি বোঝাতে চায়?'

'লক!' উত্তেজনা ফুটল কিশোরের চোখে। 'লক মানে তালা। তারমানে বোঝাতে চেয়েছে তালা লাগানো দেরাজ। আজ রাতেই গ্রোসারি শপের দেরাজের তালা ভেঙে ডাকাতির ফন্দি এঁটেছে! সময় কম! জলদি চলো, রবিন আর ববকে

খবর দিই। দোকানের মালিককে গিয়ে সাবধান করতে হবে।'

তিন

নাকেমুখে গুঁজে দুপুরের খাওয়া শেষ করল মিশা আর কিশোর। তারপর ছুটে বেরোল ঘর থেকে। পিছে পিছে চলল টিটু।

কিশোর বলে দিয়েছে, কাগজের টুকরোটা যেখানে কুড়িয়ে পেয়েছে ডলি আর অনিতা, সেখানে সবাইকে অপেক্ষা করতে। তারপর একসাথে যাবে মিস্টার বারবারের দোকানে। মূল সূত্রটা যেখানে পাওয়া গেছে সেই জায়গাটা দেখা দরকার। কিশোরের ধারণা, সূত্রটা কখন পেয়েছে, ঠিক কোন জায়গায়, এ-কথা দোকানদারকে বলা গেলে সেটা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য হবে।

দুই মিনিটেই টিটুকে নিয়ে মিল লেনে পৌঁছে গেল কিশোর আর মিশা। বাড়ি থেকে বেশি দূরে না জায়গাটা। সরু একটা গলি, দু'ধারে উঁচু দেয়াল।

মুসা, অনিতা, বব, রবিন এসে অপেক্ষা করছে। ডলি এল সবার পরে, সব সময়ই দেরি হয় তার।

'ওদেরকে সব বললাম,' রবিন আর ববের কথা বলল মুসা। 'চলো।'

'এক মিনিট,' হাত তুলল রবিন। 'এত শিওর হলে কি করে, মিস্টার বারবারের দোকানই লুট করতে যাচ্ছে? মুদি দোকান তো আরও দুটো আছে। এ-ছাড়া মিসেস লেনিঙের জেনারেল স্টোর আছে। ওগুলো নয় কেন?'

তাই তো! থমকে গেল কিশোর। এ-প্রশ্নটা তো তাদের মাথায় আসেনি? চাচি বললেন তখন মিস্টার বারবারের দোকানে যেতে, ব্যস, তাঁর দোকানের কথাই শিকড় গেড়েছে মনে। কোন সূত্র তো নেই।

না না আছে, ভাবল কিশোর। বলল, 'তালা লাগানো দেরাজ একমাত্র মিস্টার বারবারের দোকানেই আছে। নতুন ধরনের তালা, দেরাজের ডিজাইনটাও নতুন। জানো না, সুযোগ পেলেই গর্ব করে ওটার কথা সবাইকে শুনিয়ে দেন মিস্টার বারবার? তবে যত নতুন তালাই হোক, ডাকাতদের জন্যে কিছু না। ঠিক ভেঙে ফেলবে, দেখো।'

জবাব পেয়ে গেছে রবিন, আর কোন খুঁত বের করতে পারল না। সবাই মিলে রওনা হলো মিস্টার বারবারের দোকানের দিকে।

কয়েক পা এগিয়েই অনিতা থেমে গেল। হাত তুলে দেখাল, 'ওই জায়গায় পেয়েছি কাগজটা। ওই যে, ঘাস।'

সবাই দেখল। এগিয়ে গিয়ে ঘাসগুলো শুঁকে দেখল টিটু।

গভীর মনোযোগে জায়গাটা পরীক্ষা করল কিশোর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বোলাল আশপাশে। হাত তুলে দেখাল, 'দেখো, ঘাস মাড়ানো। যে লোক মেসেজটা লিখেছে, সে এখানে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল।'

'যে লিখেছে সে, না যে নিয়ে এসেছে?' ববের প্রশ্ন। 'যদি লিখে থাকে, তাহলে এখানে ওটা পড়ে থাকবে কেন? আমার মনে হয় একজন এখানে ছিল, অন্য আরেকজন নিয়ে এসেছে। যে ছিল, সে মেসেজটা পড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। যুক্তিতে তাই বলে না?'

'হ্যাঁ,' ঘাড় নাড়ল কিশোর, 'ঠিকই বলেছ।'

'এই দেখে যাও,' খানিক দূর থেকে ডেকে বলল মিশা, 'সিগারেটের টুকরো। অনেক।'

অন্যেরাও এসে দাঁড়াল ওখানটায়। নিচু হয়ে একটা পোড়া টুকরো তুলে নিল কিশোর। খালি একটা প্যাকেটও পড়ে থাকতে দেখা গেল।

'উইনেক্স সিগারেট,' বিড়বিড় করে বলল কিশোর।

ব্র্যান্ডটা মুসার চেনা।

'এই, কি সাফ করলে তখন?' ঠাট্টা করে অনিতা আর ডলিকে বলল মুসা। 'ময়লা তো সব পড়েই আছে। যাও, তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে এসো।'

জ্বলে উঠল ডলি। 'ফেলতামই তো! কাগজটা পেয়ে যাওয়ায় আর মনে ছিল না!'

হাত তুলল কিশোর। 'হয়েছে, হয়েছে, অত রেগে যাওয়ার কিছু নেই...'

'এই,' তাড়াতাড়ি বাধা দিল অনিতা, 'পায়ের ছাপগুলো নষ্ট কোরো না! ওই যে, দেয়ালটার গোড়ায়।'

'বেশ স্পষ্ট তো,' রবিন বলল। 'ছাপগুলো চেপে বসেছে।' আগের রাতে বৃষ্টিতে নরম হয়ে ছিল মাটি, গভীর হয়ে পড়েছে পায়ের ছাপ।

'ছাঁচ তুলে নিলে তো পারি,' পরামর্শ দিল বব।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক,' মাথা দোলাল মিশা, 'প্লাস্টারের ছাঁচ। কিশোর, কি বলো?'

'ভালই হবে।' কিশোরের দিকে ফিরল রবিন। কিশোরকে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর, চুপ করে আছো যে? কি ভাবছ?'

'অ্যাঁ!...হ্যাঁ। বুদ্ধিটা ভালই,' জবাব দিল কিশোর। 'ছাউনিতে প্লাস্টার আছে, কিনতে হবে না। এখুনি বানিয়ে ফেলা যাক। বব, রবিন, তোমরা ভাল ছাঁচ বানাতে পারো...'

'যাচ্ছি,' বব বলল।

'দাঁড়াও, আগে কথা শেষ করি। তোমরা ছাঁচ বানাবে। মেয়েরা, শোনো, তোমরা সিগারেট যে সব দোকানে বিক্রি হয়, সে-সব দোকানে গিয়ে জানার চেষ্টা করবে, এখানে উইনেক্স সিগারেট কারা কারা খায়, মানে, কাদের প্রিয় ব্র্যান্ড।'

'আমার বাবা খায়!' বলতে গিয়েও বলল না মুসা।

কিশোর বলল, 'মিস্টার বারবারের দোকানে যাব আমি আর মুসা।'

সে থামতেই 'হুফ! হুফ!' করে উঠল টিটু। যেন বলতে চায় কাজের তালিকা থেকে আমাকে বাদ দেয়া হয়েছে কেন? আমি কি লধশের কেউ না?

'আরে যাবি যাবি, তুইও যাবি,' হেসে বলল কিশোর। টিটুর মাথায় আলতো চাপড় দিল।

কিন্তু যাবার জন্যে চিৎকার করেনি টিটু, দৌড় দিল রাস্তার মাথার দিকে। সবাই দেখল ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাবলি আর তার বান্ধবী নিনা। গোপনে নজর রাখছিল ওদের উপর।

বিরক্তিতে নাক কুঁচকাল মিশা। 'ঠিক এসে দেখে ফেলল! ওদের যন্ত্রণায়...' কথাটা শেষ করল না সে।

'মাছির কাছে খবর পায় নাকি?' রবিনও বিরক্ত। 'এক ঘণ্টাও হয়নি কাজ শুরু করেছি আমরা, ব্যস, পেয়ে গেল খবর!'

পথের মাথায় পৌঁছে গেছে টিটু। গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিল। বাবলি আর নিনাকে ওখান থেকে তাড়িয়ে তবে ছাড়ল। জিভ বের করে বেশ গর্বের ভঙ্গিতে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল আবার।

'চলো, যাওয়া যাক,' কিশোর বলল। 'কাকে কি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মনে আছে তো?...গুড। ছ'টায় ছাউনিতে দেখা করব সবাই। কে কী জানলাম, আলোচনা করে ঠিক করব এরপর কী করা যায়। নতুন সঙ্কেত, উইনেক্স।'

চার

অনেক বড় দোকান মিস্টার বারবারের। হাই স্ট্রীটে। আস্ত কাঁচ লাগানো বড় বড় দুটো জানালা। উঁকি দিয়ে দেখল কিশোর আর মুসা, এক মহিলার সঙ্গে কথা বলছেন মিস্টার বারবার। মহিলাকে চেনে ওরা, তাঁর নাম মিসেস হেরিংটন।

'দাঁড়াও,' মুসাকে বলল কিশোর, 'মহিলা বেরিয়ে যাক। সারা গাঁয়ের লোককে জানানোর কোন দরকার নেই। চোরের কানে গেলে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে।'

দাঁড়িয়েই আছে দুই গোয়েন্দা। মিসেস হেরিংটন আর বেরোন না। বিভিন্ন কোম্পানির টিনজাত মটরশুঁটি দেখছেন, কোনটা যে কিনবেন তা-ই ঠিক করতে পারছেন না। অবশেষ একটা টিন পছন্দ করে কিনলেন তিনি। দাম মিটিয়ে দিয়ে এগোলেন দরজার দিকে। টাকাটা দেরাজে তুলে রাখলেন মিস্টার বারবার।

বাইরে বেরিয়ে দুই গোয়েন্দাকে দেখে আবার দাঁড়িয়ে গেলেন মিসেস হেরিংটন। 'আরে কিশোর যে। মুসাও আছ। কিনবে নাকি কিছু? দিনটা ভারি সুন্দর, তাই না? কিন্তু হলে হবে কি, বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ পাচ্ছি আমি। নামবে, যে কোন সময় ঝমঝম করে নামবে। হ্যাঁ, ভাল কথা, কোভেলোটিতে বন্যা হয়েছে, সে-খবর শুনেছ? সেদিনকার ঝড়ের পরেই নাকি হয়েছে। আবারও যদি বৃষ্টি হয়...'

অতিরিক্তি কথা বলেন মহিলা। ঘাবড়ে গেল দুই গোয়েন্দা। ওদের ভয় হলো আবহাওয়ার কথা না একটানা চালিয়ে যান বিকেল পর্যন্ত! ওদেরকে বাঁচিয়ে দিলেন মিসেস হেরিংটনের বান্ধবী মিস ডেনভার। দোকানের পাশ দিয়ে যেতে

যেতে থামলেন। মিসেস হেরিংটনকে ডাকলেন। দু'জনে আবহাওয়ার কথা আলোচনা করতে করতে চলে গেলেন।

'বাপরে বাপ!' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'মাথা ধরে যাবার অবস্থা!'

দোকানে ঢুকল ওরা। দরজা পেরোতেই একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। কেউ ঢুকলে আপনাআপনি বাজে ওটা।

মুখ তুলে ওদের দেখে হাসলেন মিস্টার বারবার। কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আরে, তোমরা। কি লাগবে?'

'না, কিছু লাগবে না,' মাথা চুলকাল কিশোর। অস্বস্তি লাগছে। কেউ জিনিস কিনবে না বললে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন মিস্টার বারবার। 'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

'আপনাকে সাবধান করতে এসেছি, মিস্টার বারবার,' মুসা বলল।

'সাবধান? কি হয়েছে?' সর্বক্ষণ লেগে থাকা হাসিটা মুছল না তাঁর মুখ থেকে, তবে অবাক হয়েছেন বোঝা যায়।

খুব জরুরি ব্যাপার বলতে এসেছে, ওরকম মুখভঙ্গি করে রেখে পকেট থেকে কাগজটা বের করল কিশোর। মিস্টার বারবারকে দেখিয়ে বলল, 'পড়ুন।'

পড়লেন তিনি। 'বোকার মত কি সব লিখেছে?'

'বোকার মত নয়। আপনার দোকান লুট করার ফন্দি।'

'আজ রাতেই ডাকাতি করতে আসবে ওরা,' যোগ করল মুসা।

'তাই নাকি?' গুরুত্ব দিলেন না মিস্টার বারবার। বিরক্তি ফুটল চোখে। 'দেখো, তোমাদেরকে ভাল ছেলে বলেই জানি। যাও এখন, খেলগে। ফালতু কথা বলার সময় নেই আমার।'

বড় করে দম নিল কিশোর। শান্ত থাকতে চাইছে। বুঝেশুনে কথা বলতে হবে দোকানির সঙ্গে। রেগে গেলে তাঁকে বোঝানো আরও শক্ত হবে। বুঝিয়ে বলল, 'দেখুন, নম্বরটা দেখুন। এর মানে হলো আটাশ আর ঊনত্রিশ তারিখের মাঝামাঝি সময়। বাকি লেখাটার মানে হলো মুদি দোকান, আর তালা দেয়া দেরাজ।'

কিশোর থামতে মুসা মুখ খুলল, 'এই সাঙ্কেতিক মেসেজ লিখে বোঝাতে চেয়েছে আজ এবং কালকের মাঝামাঝি সময় কিছু করতে যাচ্ছে ওরা। তার মানে আজ মধ্যরাত।'

'মুদির দোকানে,' কিশোর বলল। 'রাত দুপুরে তালা দেয়া দেরাজের কাছে কেন যায় বাইরের লোকে? নিশ্চয় জিনিসটার চেহারা দেখার জন্যে নয়।'

'কি বলছ?' এইবার যেন কিছুটা টনক নড়ল দোকানির। 'দেরাজ থেকে টাকা লুট করতে আসবে?'

'তা ছাড়া আর কি?'

আরেকবার মেসেজটা পড়লেন মিস্টার বারবার। হাসি চলে গেছে মুখ থেকে। গভীর হয়েছে কপালের ভাঁজ, কুঁচকে গেছে ভুরু। 'এখন মনে হচ্ছে তোমাদের কথা ঠিক হলেও হতে পারে। এখানে একমাত্র আমার দোকানেই এ-রকম দেরাজ আছে।'

'ঠিকই বলছি আমরা,' জোর দিয়ে বলল কিশোর।

'তাহলে এখন কি করতে চান?' মুসার প্রশ্ন। দোকানে খদ্দের ঢোকার আগেই আলোচনা শেষ করে ফেলতে চায়।

ঘণ্টা বেজে উঠল। ঘরে ঢুকলেন বৃদ্ধ মিস্টার মরিস। হাতে একটা শপিং বাস্কেট, জিনিসের ভারে কাত হয়ে পড়েছেন একদিকে। দাঁতের ফাঁকে পাইপ। দেখতে দেখতে ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল তামাকের গন্ধ। তবে কড়া কিংবা ঝাঁঝাল নয়, কেমন মিষ্টি, মধু মধু গন্ধ।

'এক মিনিট মিস্টার মরিস, প্লীজ,' হাত তুলে হেসে বললেন মিস্টার বারবার। 'ওদেরকে বিদেয় করে আসি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বৃদ্ধ বললেন। 'তাড়া নেই আমার। রিটায়ার্ড মানুষ, কাজ নেই, সময় কাটানোই হয়ে গেছে মুশকিল।'

দোকানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছে মিস্টার মরিসের। সুন্দর করে সাজানো চকলেটের প্যাকেটগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিশোর আর মুসাকে নিয়ে দরজার দিকে এগোলেন মিস্টার বারবার। বাইরে বেরিয়ে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'এখনই পুলিশকে ফোন করব আমি। দেখি, আসুক, কোন ব্যাটা চুরি করতে আসে।'

'তাই করুন,' খুশি হলো কিশোর। মিস্টার বারবারের হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, 'কাল খবর জানতে আসব আবার।'

'এসো। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে।'

আবার দোকানে ঢুকে গেলেন মিস্টার বারবার।

খুশি মনে ফিরে চলল দুই গোয়েন্দা। ছ'টা বাজেনি এখনও।

মিল লেন-এ পৌঁছে দেখল, পথের মাথায় কড়া পাহারা দিচ্ছে টিটু। বাবলি আর নিনাকে দেখলেই তাড়া করবে। বিরক্ত করতে দেবে না রবিন ও ববকে। ছাঁচ বানাতে ব্যস্ত দু'জনে।

কিশোরদেরকে দেখে আনন্দে ঘেউ ঘেউ করে উঠল টিটু।

এগিয়ে এসে তার মাথা চাপড়ে আদর করল কিশোর। বলল, 'লক্ষ্মী ছেলে।'

মুখ তুলে তাকাল বব আর রবিন। পায়ের ছাপের ছাঁচ তোলা শেষ করেনি এখনও।

'এটাই শেষ,' জানাল রবিন। 'বারোটা নিয়েছি। ওগুলো ছাউনিতে শুকোতে রেখে এসেছি। এটাই শেষ।'

'ছাপের ওপর পাউডার ফেলছ কেন?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'জানো না নাকি?' বব বলল। 'মাটির রস শুষে নেবে এই পাউডার। তাতে ছাঁচগুলো উঠে আসবে ঠিকমত, নষ্ট হবে না।'

'ওস্তাদ হয়ে গেছ,' বব আর রবিনের কাজ দেখতে দেখতে প্রশংসা করল কিশোর। 'এই, কেউ এসেছিল নাকি? দেখেছে তোমাদের?'

'না,' মাথা নাড়ল বব। 'আসবে কি, টিটু কি ঢুকতে দেয় নাকি কাউকে?'

'ভাল।'

প্লাস্টার ঠিকমত বসছে কিনা, নখ দিয়ে খুঁচিয়ে দেখল রবিন। বলল, 'মিনিটখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে। যেতে পারব।'

'তোমরা কি করে এলে?' বব জানতে চাইল। 'মিস্টার বারবার কি বললেন?'

'ছাউনিতে গিয়ে বলব,' জবাব দিল কিশোর। ঘড়ি দেখল। 'ঠিক ছ'টায় মিটিং। এখন কথা শুনতে গেলে সময় নষ্ট হবে। কাজটা সেরে ফেল।'

পাঁচ

গির্জা থেকে ঘণ্টা শোনা গেল, ছয়টা বাজে।

'উইনেক্স!' দরজার বাইরে থেকে চাপা গলায় বলল মুসা।

ছাউনির দরজা খুলে দিল কিশোর।

এক এক করে ভিতরে ঢুকল মুসা, রবিন, বব। মেয়েরা আগেই এসে বসে আছে।

ছিটকানি লাগিয়ে দিয়ে এসে তার জায়গায় বসল কিশোর। গম্ভীর গলায় বলল, 'এবার রিপোর্ট শোনা যাক। প্রথমে আমাদের কথাই বলি। মিস্টার বারবারের দোকানে গিয়েছিলাম। তাঁকে বোঝাতে পেরেছি, সাবধান করে দিয়ে এসেছি। পুলিশকে ফোন করবেন তিনি। নিশ্চয় রাতে দোকানের আশেপাশে লুকিয়ে পাহারায় থাকবে পুলিশ, চোর দেখলেই খপ করে ধরবে। আগামী কাল আবার দোকানে যাব, কি হয়েছে জানতে।' এক মুহূর্ত থামল সে। ববের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বব, তোমাদের খবর বলো। ছাপগুলো ঠিকমত নিতে পেরেছ?'

'পেরেছি। মোট তেরোটা ছাপ নিয়েছি আমরা। এই যে শেষটা, শুকায়নি এখনও। বাকিগুলো তোমার পিছনের তাকে তুলে রেখেছি। দেখাচ্ছি একটু পরেই। তবে তার আগে বলি, কি আবিষ্কার করেছি আমরা।' নাটকীয় ভঙ্গিতে থামল বব।

আগ্রহে সামনে ঝুঁকল কৌতূহলী শ্রোতারা। এমনকি টিটুও কান খাড়া করে ফেলেছে।

'এক রকম নয়, দুই ধরনের পায়ের ছাপ আছে,' বব জানাল। 'তারমানে অন্তত দু'জন লোক একজোট হয়েছে ডাকাতি করার জন্যে। মিস্টার বারবারের দোকানে ঢুকবে। পুলিশকে এ-খবরটাও জানিয়ে দেয়া দরকার।'

'হুঁ! আমিও এটাই সন্দেহ করেছিলাম,' ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'দেখি, ছাপগুলো দেখি?'

অনিতার দিকে তাকাল রবিন। 'অনিতা, ওগুলো দেবে, প্লীজ? তোমার পিছনেই আছে।'

'নিশ্চয়ই।'

বারোটা ছাঁচ বের করে দিল অনিতা। অন্যেরা তাকে ওগুলো মেঝেতে নামাতে সাহায্য করল।

একটা ছাঁচ তুলে নিয়ে ডলি বলল, 'গোড়ালি দেখেছ এটার? সাধারণ জুতো নয়, বুটের ছাপ।'

'হ্যাঁ,' একমত হয়ে বলল মুসা। 'উঁচুনিচু জায়গায় কিংবা পাহাড়ে ওঠার সময় এ-রকম বুট পরে লোকে। জুতোর দোকানদাররা হিল-ওয়াকিং বুট নাম দিয়েছে এগুলোর।'

'এই ছাঁচটা আবার অন্যরকম,' শেষ যে ছাঁচটা তুলে এনেছে, সেটা দেখিয়ে বলল রবিন। 'মাত্র তিনটে পেয়েছি এ-রকম।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর।

অন্য আরেকটা ছাঁচ দেখিয়ে মিশা বলল, 'আর এই যে এটা, দেখো, সোল কেমন চ্যাপ্টা আর মসৃণ।'

'যদ্দূর মনে হয় ওয়েলিংটন বুটের ছাপ এটা,' রবিন বলল। 'এই যে সোলের গায়ে আঁকা বর্ম–ওয়েলিংটন বুটেই থাকে।'

একটা ছাঁচ হাতে নিল কিশোর। উল্টেপাল্টে দেখল। 'সোলের গায়ে কিছু লেখা রয়েছে, বোধহয় ব্র্যান্ডনেম। পড়া যায় না…'

'আমারটা পড়া যাচ্ছে!' মিশা বলল। 'দেখো-দেখো, আমারটায় স্পষ্ট ফুটেছে! এফ…আই…হ্যাঁ-হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, ফিশারম্যান!'

ফিশারম্যান! ধক করে উঠল মুসার বুক। তার বাবাও ফিশারম্যান বুট পরেন! উইনেক্স সিগারেট, ফিশারম্যান বুট, এভাবে মিলে যেতে আরম্ভ করেছে কেন!

ডলি বলল, 'আমার বাবারও একজোড়া ফিশারম্যান ব্র্যান্ডের ওয়েলিংটন বুট আছে।'

'তা থাকতেই পারে। চালু জিনিস,' রবিন বলল। 'নাহ্, এভাবে এগোনো যাবে না। ধরা যাবে না অপরাধীকে।'

'অপরাধটা এখনও ঘটেনি,' কিশোর বলল। 'ঘটবে আজ রাতে। তখন দেখা যাবে ধরা যায় কিনা।…এবার তৃতীয় রিপোর্টটা শোনা যাক। মেয়েরা, বলো।'

'বলার তেমন কিছু নেই,' মিশা বলল। 'গাঁয়ে খুব বেশি লোক উইনেক্স সিগারেট খায় না। তামাকের দোকানের মালিক বলল, ওটার গন্ধ নাকি পছন্দ করে না লোকে। তার কাছ থেকে মাত্র তিনজন লোক ওই জিনিস কেনে।'

'তাদের একজন আমার বাবা,' মুসা বলল কাঁপা গলায়।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মিশা। 'একজন তোমার বাবা, দ্বিতীয়জন পুলিশ ক্যাপ্টেন স্বয়ং, আর তৃতীয়জন মিস্টার বারবার নিজেই।'

'তারমানে এত কষ্ট করে এই সূত্র নিয়ে এসে লাভ হলো না কিছু,' অনিতা বলল। 'মুসার বাবাকে সন্দেহ করার কথা কল্পনাই করা যায় না। পুলিশ ক্যাপ্টেন

তো চোর ননই। আর নিশ্চয় নিজের দেরাজ ভেঙে টাকা লুট করতে যাবেন না মিস্টার বারবার।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'এগোনো যাচ্ছে না।'

মুসা বলল, 'এত ভাবার কি আছে? আজ রাতেই তো সব শেষ হয়ে যাবে। চুরি করতে গেলেই ধরা পড়বে ব্যাটারা। ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে মিস্টার বারবার নিজেই খবর দেবেন। কাল সকালে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে পুরো ঘটনাটা কেবল শুনে আসব আমরা, ব্যস।'

কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারল না কিশোর।

*

সে-রাতে সহজে ঘুমাতে পারল না গোয়েন্দাদের কেউ। রাতে দেরি করে শু'লো। তার পরেও মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে যেতে লাগল উত্তেজনায়। সবার মনেই এক ভাবনা, কি শুনবে সকালে গিয়ে?

পরদিন স্কুলের আগেই মিস্টার বারবারের দোকানে হাজির হলো মুসা ও কিশোর। কিন্তু দোকানে পৌঁছে দেখল বিশাল জানালার সামনে বসানো শাটার তখনও বন্ধ।

'কি ব্যাপার?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল মুসা। 'অন্য দিন তো এতক্ষণে খুলে যায়। খুব সকালে দোকান খোলেন মিস্টার বারবার...'

'নিশ্চয় রাতে কিছু ঘটেছে।'

ভয় ভয় করতে লাগল ওদের। মিস্টার বারবারের কিছু হয়নি তো? ধাতব শাটারে কিল মারতে আরম্ভ করল দু'জনে। বিকট আওয়াজ হতে লাগল। খানিক পরেই খুলে গেল উপরতলার জানালা।

'অ, তোমরা!' কঠিন কণ্ঠ শোনা গেল।

জানালায় দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার বারবার। 'ভাল খেল দেখিয়েছ যা হোক! সারাটা রাত আমাকে জাগিয়ে রেখেছ, কি যে টেনশন গেছে! আবার এসেছ এখন...যাও, ভাগো, নইলে খারাপ হবে বলে দিলাম!'

অবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। মেজাজ এত খারাপ কেন দোকানির?

'খারাপটা কি করলাম আমরা?' প্রতিবাদ জানাল কিশোর। 'আমরা তো আপনার ভালই চেয়েছি। সব কিছু জেনে এসে হুঁশিয়ার করে দিয়েছি আপনাকে।'

'হুঁশিয়ার করেছ, না? বিচ্ছু ছেলে! সব তোমাদের শয়তানী! সারাটা রাত বসে থেকেছি আমি, আমার সাথে সাথে ক্যাপ্টেনও। ভাল চাইলে ক'দিন তাঁর সামনে পোড়ো না। কপালে ভোগান্তি আছে তাহলে।'

মুসা বলল, 'কিন্তু...কিন্তু আমরা মেসেজটা পেয়েছি...'

ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন মিস্টার বারবার, 'ছাই পেয়েছ! সব তোমাদের বানানো কথা!'

প্রতিবাদ করতে গেল মুসা। এতই রেগে গেলেন মিস্টার বারবার, জানালায়

রাখা একটা ফুলের টব তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারার হুমকি দিলেন। চেঁচিয়ে বললেন, 'জলদি ভাগো!'

'খাইছে! সত্যি সত্যি মারবেন নাকি?' ফিসফিস করে বলল মুসা।

'বলা যায় না। প্রচণ্ড খেপে গেছেন,' কিশোর বলল। 'চলো। এখানে থেকে কোন লাভ নেই আর।'

ছয়

স্কুলের গেটের কাছে এক তরুণকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। হাতে একটা চাঁদা তোলার বাক্স। বাক্সটা নাড়ছে। ঝনঝন করে বাজছে ভিতরে রাখা মুদ্রা। এতিম বাচ্চাদের জন্যে চাঁদা তুলছে।

অনেক মা-ই বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে আসছেন। গেটের কাছে থামছেন তাঁরা। টাকা-পয়সা, যার যা ইচ্ছে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন বাক্সের ভিতরে। কিছু কিছু ছেলেমেয়েও চাঁদা দিচ্ছে টিফিনের পয়সা থেকে। আহারে, এতিম, কত কষ্টে আছে! ছোট-বড় সবারই করুণা জাগায়।

কিশোর আর মুসা গেটের কাছে পা দিতেই ক্লাশ শুরু হওয়ার ঘণ্টা পড়ল। গেটের কাছে সেই তরুণ আর ওরা দু'জন ছাড়া অন্য কেউ নেই তখন।

ঘণ্টা শুনে ছেলেরাও তাড়াহুড়ো করে ঢুকতে গেল, লোকটাও আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই ভেবে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল।

'এই লোকটাই চাঁদা তুলতে গেছিল না সেদিন?' কিশোরের প্রশ্ন।

কথা বলার সময় নেই। ঘণ্টা পড়ে গেছে। ক্লাশরুমের দিকে ছুটল দু'জনে। এক মিনিট দেরি করে ফেলল। তবে ভাগ্য ভাল, টীচার ওদেরকে দেখেননি। চুপচাপ গিয়ে যার যার সীটে বসে পড়ল দুই গোয়েন্দা। চাঁদা-তোলা লোকটার কথা ভুলে গেল।

নতুন কিছুই ঘটল না সেদিন স্কুলে। অনেক কথা পেটে গিজগিজ করছে লধশদের। ছুটির পর আর তর সইল না, ছাউনিতে হাজির হলো।

'চোরেরা কেন আসেনি জানো?' রবিন বলল, 'আমরা যে সন্দেহ করেছি, এটা ওরা জেনে ফেলেছে।'

'অসম্ভব!' মানতে পারল না ডলি। 'কি করে জানবে? আমরা সাংঘাতিক সতর্ক ছিলাম। কাউকে কিচ্ছু বুঝতে দিইনি।'

'ঠিক,' তার সঙ্গে একমত হলো বব। 'ছাঁচ তোলার সময় কাউকে চোখে পড়েনি আমাদের। কড়া পাহারা দিয়েছে টিটু, দেখলে চেঁচানো শুরু করত।'

'গ্রোসারি শপে তোমরা কথা বলার সময় কেউ শুনে ফেলেনি তো?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'উঁহু!' মাথা নাড়ল মুসা।

'শুনেছে!' হাত তুলল কিশোর। 'আমরা মিস্টার বারবারের সঙ্গে কথা বলার সময় মিস্টার মরিস ঢুকেছিলেন। আমাদের কথা তাঁর কানে গিয়ে থাকতে পারে। তবে শেষ কয়েকটা কথা, ওটুকু শুনে কিছু বোঝা মুশকিল।'

'তা ছাড়া তিনি পাইপ টানছিলেন,' মনে করিয়ে দিল মুসা। 'চোরদের কেউ নন। উইনেক্স সিগারেট টানেন না তিনি।'

চুপ হয়ে গেল সবাই। জটিল হয়ে উঠেছে রহস্য। বোঝা যাচ্ছে না কিছু। ছাউনির ভিতরে স্তব্ধ নীরবতা। মিনিটের পর মিনিট কাটছে। অসহ্য হয়ে উঠল পরিবেশ। হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দরজার দিকে ছুটে গেল টিটু। তাজ্জব হয়ে দেখল লধশরা, সাদা একটা খাম ঠেলে দেয়া হচ্ছে দরজার নীচ দিয়ে।

সাধারণ খাম।

কী আছে ভিতরে?

প্রায় উড়ে গিয়ে ওটার কাছে পড়ল যেন কিশোর। ঝড়ের গতিতে গিয়ে দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে গেল রবিন আর মুসা।

বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। শরতের শুরুতে রাত নামে তাড়াতাড়ি।

'ওই যে, ওখানে!' চিৎকার করে বলল রবিন। 'কে জানি পালাচ্ছে!'

পাতাবাহারের ঝাড়ের আড়ালে একটা অস্পষ্ট মূর্তিকে হারিয়ে যেতে দেখা গেল। ডালপাতায় ঘষা লেগে মৃদু খসখস শব্দ হলো। চোখের ভুল নয়।

দৌড়ে পিছু নিল রবিন। সঙ্গে মুসা আর টিটু।

'জলদি করো!' মুসাকে বলল রবিন। 'রাস্তায় উঠে গেছে!'

পাঁচ সেকেন্ড পর ওরাও রাস্তায় এসে উঠল। কিন্তু নির্জন, ফাঁকা রাস্তা। কাউকে চোখে পড়ল না।

চেপে রাখা দমটা শব্দ করে ছাড়ল রবিন। 'দূর, পারলাম না! ঠিকই পালাল!'

গরগর করছে টিটু। হঠাৎ তীরবেগে ছুটতে শুরু করল। পথের মোড়ে একটা স্ট্রীট লাইট জ্বলছে। সেদিকে যাচ্ছে সে। মুহূর্ত পরেই সেটার নিচে এসে হাজির হলো নিনা আর বাবলি। দেখে এগিয়ে গেল মুসা ও রবিন।

'কি হলো, অত ছোটাছুটি কিসের?' নিনা জিজ্ঞেস করল।

'একটু আগে কাউকে দেখেছ এদিকে?' বাবলিকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'হ্যাঁ, দেখলাম একটা লোক দৌড়ে চলে যাচ্ছে।'

'কোনদিকে গেল? দেখতে কেমন?'

মুচকি হাসল বাবলি। 'বলব কেন?'

অনেক কষ্টে মেজাজ ঠিক রাখল মুসা। 'জলদি বলো!'

'বললেও লাভ হবে না। ধরতে পারবে না। যা জোরে দৌড়াচ্ছিল!'

'গেছে কোনদিকে?' ধৈর্য হারাল রবিন।

নিনা বলল, 'মিল লেন-এর দিকে গেছে।'

'দেখতে কেমন?' আবার প্রশ্ন করল মুসা।

মনে করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল নিনা।
বাবলি বলল, 'পরনে জিনস, গায়ে চামড়ার জ্যাকেট।'
'চেহারা কেমন?' চিৎকার করে উঠল উত্তেজিত মুসা। 'আগে কখনও দেখেছ ওকে?'
'না। অন্ধকারে ভালমত দেখিনি। তবে মনে হলো বয়েস কম।'
'এই? আর কিছু না?'
'ও, না না, দেখেছি,' নিনা জবাব দিল। 'ওয়েলিংটন বুট। ভাইয়ারটার মত।'
'তারমানে ওদেরই একজন!' বিড়বিড় করল মুসা।
'কাদের একজন?' জানতে চাইল বাবলি।
'সেটা তোমার জানার দরকার নেই!' ধমক দিয়ে বলল মুসা। 'খবরদার, যা দেখলে, কাউকে গিয়ে বলবে না, যদি ভাল চাও!'
'কেন, বললে দোষ কি?' নিনা বলল, 'কিছু লুকাচ্ছ নাকি?'
মুসার হাত ধরে টানল রবিন, 'এসো, যাই। পিছু নিয়ে আর লাভ নেই, পাওয়া যাবে না লোকটাকে।'
ছাউনিতে ফিরে এল দু'জনে। থমথমে হয়ে আছে পরিবেশ, সবাই গম্ভীর। নীরবে খামের ভিতরে পাওয়া কাগজটা বাড়িয়ে দিল কিশোর।
রবিন আর মুসাও দেখল। খবরের কাগজ থেকে অক্ষর কেটে নিয়ে পর পর সাজিয়ে শব্দ তৈরি করা হয়েছে, আঠা দিয়ে লাগানো হয়েছে সাদা কাগজের উপর। ইংরেজি লেখাটার বাংলা মানে করলে দাঁড়ায়: *ভাল চাইলে আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবে না। আর সাবধান করব না মনে রেখো।*
'শয়তান!' গাল দিল বব।
'মুদির দোকানে কেন চুরি করতে যায়নি বোঝা গেছে এতক্ষণে,' মুসা বলল। 'আমাদের ব্যাপারে সব জেনে গেছে ব্যাটারা। চুরি করে চোখ রেখেছিল।'
কাগজটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। বলল, 'লেখাপড়া কিছুই তো জানে না। এক লাইনে চারটে বানান ভুল।'
'লেখাপড়া না জানলেও দৌড়াতে পারে ভালই,' রবিন বলল। 'ওয়েলিংটন বুট পরে এসেছিল।'
'কি করে জানলে?' মিশার প্রশ্ন।
'বাবলি আর নিনা দেখেছে।'
'ওদের জ্বালায় আর শান্তিতে থাকার জো নেই! সারাক্ষণই ঘুরঘুর করছে আমাদের ছাউনির আশেপাশে।'
'ঘুরঘুর করাতে এই একটিবার অন্তত আমাদের উপকারই হয়েছে,' রবিন বলল। 'ওরা না দেখলে আমরা জানতেই পারতাম না কে এসেছিল, কী ধরনের লোক।'
দরজায় জোরে জোরে থাবা পড়ল। চমকে গেল সবাই। লোকটা ফিরে এল? নাকি নিনা আর বাবলি? না পুলিশ ক্যাপ্টেন?
'সঙ্কেত?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কালো জামের জেলি!' বাইরে থেকে জবাব দিলেন চাচি। হাসলেন।

'কালো জামের জেলি' লধশদের সঙ্কেত নয়। তবু দরজা খুলতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করল না মুসা। হাত বাড়াল, 'কই, দিন।'

'বানিয়েছি নাকি, যে দেব,' হেসে বললেন চাচি। 'বলতে এলাম, জাম পেড়ে আনতে পারলে বানিয়ে দিতে পারি। পারবে?'

'পারব না মানে!' সমস্বরে চিৎকার করে বলল চার-পাঁচটা কণ্ঠ। কালো জামের জেলির কথা শুনে জিভে জল এসে গেছে ওদের। 'কাল স্কুল ছুটির পরেই যাব।'

সাত

পরদিন বিকেল পাঁচটায় স্কুল ছুটির পর গাঁয়ের বাইরে রাস্তার মাথায় জমায়েত হলো লধশরা। কালো জাম আনার জন্যে ঝুড়ি নিয়ে এসেছে হাতে করে। দল বেঁধে এগোল পাহাড়ের দিকে। ওদের জানা আছে কোথায় পাওয়া যাবে কালো জাম।

মাঠ পেরিয়ে পাহাড়ী পথে এসে উঠল দলটা। আগে আগে চলেছে টিটু। পথের দু'পাশে গরু-ভেড়া চরছে।

কালো জামের কথা মাথায় থাকলেও আরও একটা কথা ঘুরছে ওদের মনে। ডলি আর অনিতার কুড়িয়ে পাওয়া সেই রহস্যময় মেসেজ।

'কাল রাতে একটুও ঘুমাতে পারিনি,' ডলি বলল। 'সারাক্ষণই কেবল মনে হয়েছে, জানালার বাইরে ঘোরাঘুরি করছে কে যেন!' শেষ দিকে গলা কেঁপে গেল তার।

'ভয় তাড়াও। মন থেকে ভয় তাড়াও,' গম্ভীর কণ্ঠে উপদেশ দিল মুসা। 'এমনটা চলতে থাকলে শেষে বিছানার নিচেও কেউ লুকিয়ে আছে ভাবতে শুরু করবে। একা ঘুমাতে সাহস পাবে না, বাপ-মায়ের বিছানায় গিয়ে উঠবে, দুদু খাওয়া বাচ্চার মত।'

'আর তুমি যে ভূতের ভয়ে সারাক্ষণ কাবু হয়ে থাকো!' জবাব দিতে এক মুহূর্ত দেরি করল না ডলি।

জবাবে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল মুসা। তর্কটা আগে বাড়তে দিল না কিশোর, ঝগড়া বেধে যাবে। বাধা দিয়ে বলল, 'একটা কথা কিন্তু ঠিক, আমাদের ওপর চোখ রাখা হচ্ছে। মেসেজে হুমকি দেয়া হয়েছে। কথা না শুনলে ক্ষতিও করবে।' চট করে তাকাল এদিক ওদিক। 'এ-মুহূর্তেও নজর রেখেছে কিনা কে জানে!'

তর্ক বন্ধ হয়ে গেল। সাবধানে চারদিকে নজর রাখতে রাখতে এগোল লধশদের দলটা।

পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছে গেছে ওরা। পুরানো একটা মিল দাঁড়িয়ে আছে খানিক দূরে। উঁচু স্তম্ভটা তালগাছের মত খাড়া উঠে গেছে অনেক উপরে। একটা সরু পথ এগিয়ে গেছে ওটার দিকে, পথের দুই ধারে খাড়া টিলা। জায়গাটা খুবই পরিচিত ওদের।

'ওখানে লুকিয়ে নেই তো কেউ!' ফিসফিসিয়ে বলল মিশা।

'লুকানোর মত জায়গাই কিন্তু!' সুর মেলাল অনিতা।

'ভয় পাচ্ছ নাকি?' অভয় দেয়ার চেষ্টা করল কিশোর। 'লোকগুলো যে-ই হোক, ওরা বলে দিয়েছে ওদের কাজে বাগড়া না দিলে কিছু করবে না। কিন্তু ওরা জানে না বাগড়া দেয়ার মত কোন সূত্র নেই আমাদের হাতে।'

'ঠিক,' কিশোরের কথাটা পছন্দ হলো ববের। 'তা ছাড়া রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা কি আর চোখ রাখা সম্ভব? আর এখন যাচ্ছি আমরা জাম পাড়তে, মোটেও ইন্টারেস্টেড হবে না ওরা।'

'চোরেরা না হলেও অন্যেরা হচ্ছে!' গুঙিয়ে উঠল রবিন, 'দেখো, কে আসছে!'

পথের মোড়ে বাবলি আর নিনাকে দেখতে পেল সবাই। ওদের হাতেও ঝুড়ি।

'নাহ্, আর পারা যায় না!' বিরক্ত হয়ে হাত নাড়ল ডলি। 'একেবারে জোঁকের মত লেগে থাকে! কোথাও যাওয়ার উপায় নেই!'

'মাকে বলেছিলাম জাম পাড়তে যাচ্ছি,' মুসা বলল, 'বাড়িতেই ছিল তখন বাবলি। নিশ্চয় শুনেছে। এবার ওর ঘাড় না মটকেছি তো আমার নাম মুসা আমান না!'

কাছে চলে এসেছে বাবলি আর নিনা। মুসার কথা কানে গেছে।

মুচকি হেসে বলল বাবলি, 'অত রাগ করছ কেন? জাম গাছগুলো কি তোমাদের একার? সবাই জাম পাড়তে পারে। অনেক আছে, কম পড়বে না তোমাদের ভাগে।'

'তাই তো,' বাবলির সঙ্গে গলা মেলাল নিনা, 'অনেক আছে। তবে আগেভাগে যারা পাড়বে, তারা ভালগুলো পাবে। পাড়তে পারাটাও অবশ্য একটা ক্ষমতার ব্যাপার।' আড়চোখে মুসার দিকে তাকাল সে।

বাবলিদের গা-জ্বালানো কথাবার্তা টিটু বুঝতে না পারলেও ওদের ভাবভঙ্গি মোটেও পছন্দ হলো না তার। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গরগর করে উঠল সে।

'এই কুত্তা, সর!' ধমক দিল বাবলি। 'পথ ছাড়!'

'এই টিটু, সরে আয়,' ডাক দিল কিশোর। অহেতুক ঝগড়া করতে ভাল লাগছে না এখন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সরে এল টিটু। বাবলি আর নিনার পায়ে একটা করে কামড় বসাতে পারলে ভীষণ খুশি হতো সে।

*

ঠিকই বলেছে বাবলি। কালো জামের অভাব নেই। ঝুড়ি বোঝাই করে ফেলল ওরা। পাড়ার সময় যে যত পারল খেতে থাকল। বেশি খেল ডলি আর অনিতা।

ঠোঁট, জিভ কালো করে ফেলল।

ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছে ওরা, এই সময় চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'আরি কাণ্ড দেখো, এখানেও মেসেজ!'

কাঁটার ভয় না করে একটা ঝোপের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিল সে।

'কী, রবিন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'পুরানো খবরের কাগজ! এই কাঁটার মধ্যে ফেলল কে?'

'খবরের কাগজ! তাই তো, অবাক কাণ্ড!'

হাত বাড়িয়ে ওটার নাগাল পেল না রবিন। ডাল সরিয়ে ঢুকে যাচ্ছে ভিতরে, কাঁটা ফুটছে গায়ে, কিন্তু না বের করে ছাড়বে না। ঝোপের ভিতর থেকেই বলল, 'পুরানো, তবে নষ্ট হয়নি। বৃষ্টি পড়েনি, এমনকি শিশিরও না। একেবারে শুকনো।'

'তারমানে আজই ছুঁড়ে ফেলেছে এখানে,' অনুমান করল মুসা।

হাতে কাগজটা নিয়ে, অনেক কষ্টে কাঁটা বাঁচিয়ে ঝোপ থেকে বেরোল রবিন। 'এখানে খবরের কাগজ ফেলেছে, ব্যাপারটা কেমন লাগছে না?'

'হ্যাঁ, কেমনই লাগছে! অদ্ভুত!' একমত হলো কিশোর। 'এতদূরে ঝোপের মধ্যে কাগজ ফেলতে এল কে?'

কাগজটা রবিনের হাত থেকে নিয়ে ভাঁজ খুলল মুসা। 'আরি! কত ফুটো দেখেছ!'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে সবাই। চারকোনা ছোট ছোট ফুটোয় ভরা কাগজটা।

উত্তেজিত কথা কানে যেতে কি হয়েছে দেখার জন্যে এগিয়ে এল মিশা, অনিতা, ডলি আর বব। টিটুও এল। নিনা আর বাবলির পিছন পিছন অনেক দূর চলে গিয়েছিল সে। ওরা চলে গেছে এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ফিরে এসেছে। ছুটতে ছুটতে আসায় জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে।

'একটা জিনিস লক্ষ করেছ?' বব বলল। 'শুধু বড় হাতের অক্ষরগুলো কেটে বাদ দিয়েছে।'

'অক্ষরগুলো বের করে নিয়েছে মনে হয়,' মিশা বলল।

হঠাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল কিশোর। একটা খাম বের করল। ছাউনিতে সেদিন দরজার নিচ দিয়ে এটাই ঠেলে দেয়া হয়েছিল।

খাম থেকে মেসেজ লেখা কাগজটা বের করে ভাঁজ খুলল সে। ঘাসের উপর বিছাল। বলল, 'রবিন, আমি পড়ছি। তুমি ফুটোগুলো দেখে কোন অক্ষরটা কোনখান থেকে কাটা হয়েছে বের করার চেষ্টা করো।'

কাজটা কঠিন না, আবার সহজও না। কিশোর পড়তে লাগল, বাকি সবাই রবিনকে সাহায্য করল।

মাথা দোলাল কিশোর, 'হুঁ, আর কোন সন্দেহ নেই, এই কাগজ থেকেই অক্ষর কেটে শব্দ তৈরি করে পাঠানো হয়েছে আমাদের কাছে।'

'এই লুকাও, লুকাও, জলদি লুকিয়ে ফেলো!' চোখ বড় বড় করে চারপাশে

তাকাতে লাগল ডলি। 'কেউ দেখে ফেলবে!'

'কে দেখবে?' বব বলল। 'আশেপাশে তো কাউকে দেখছি না। এটা যে পেয়ে যাব, কল্পনাই করবে না ওরা। মনে করেছে কাঁটাঝোপে ফেলে গেছে, কে আর খুঁজে পাবে?'

'ব্যাটারা গাধা,' রবিন বলল। 'আমি হলে পুড়িয়ে ফেলতাম।'

'আমিও,' কিশোর বলল। 'খুব বোকামি করেছে।'

'কিন্তু...' কথাটা বলতে গিয়েও বলল না অনিতা।

'কিন্তু কি?' মুসার প্রশ্ন।

'এমনও তো হতে পারে, ইচ্ছে করেই এখানে ফেলে রেখে গেছে আমাদের চোখে পড়ানোর জন্যে?'

'তা কেন চাইবে?'

'চোখে পড়াতে চাইবে কেন?' ভুরু কুঁচকাল কিশোর।

'জানি না! কথাটা মনে হলো, তাই বললাম,' অনিতা বলল।

'বড় বেশি কাকতালীয় ব্যাপার মনে হচ্ছে না?' মিশা বলল। 'আমাদের চোখে পড়ানোর জন্যেই যদি ফেলে রেখে গিয়ে থাকে, কি করে জানল কালো জাম পাড়তে ঠিক এখানটাতেই আসব আমরা? অন্য কোথাও-ও তো যেতে পারতাম।'

'হয়তো একটা চান্স নিতে চেয়েছে,' চোখ বড় বড় হয়ে গেল ডলির। 'এখানেই আসব কিনা শিওর ছিল না ওরা, তবে জাম পাড়তে যে আসব এ-খবরটা নিশ্চয় জেনে গিয়েছিল। কি করে জানল?' বলতে বলতে চোখ চলে গেল ঝোপের দিকে। যেন ওটার ভিতরে লুকিয়ে থেকে এখন ওদের উপর নজর রাখছে চোরেরা।

আট

ডলির সন্দেহটা সবার মাঝে সংক্রামিত হলো। সব চুপচাপ। কোথাও কোন নড়াচড়া নেই। শব্দ নেই। গাছ, ঝোপঝাড় আর পাহাড়ের চূড়ার পুরানো মিলটার উপর ঘুরে বেড়াতে লাগল ওদের দৃষ্টি।

'কাউকেই তো দেখছি না,' কিশোর বলল। 'তবে সাবধান থাকতে হবে আমাদের। আলাদা হয়ে যাওয়া দরকার। মুসা, রবিন, তোমরা দু'জন আমার সঙ্গে এসো। টিটুকে নিয়ে রাস্তার পাশে খুঁজব আমরা। বব, বাকি সবাইকে নিয়ে তুমি সোজা চলে যাও গাঁয়ের মেইন রোডে। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা না ফিরলে সবার বাড়িতে গিয়ে খবর দেবে।'

সবাই রাজি, শুধু অনিতা বাদে। বলল, 'কেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আসতে পারি না? আমার ইচ্ছে করছে।'

'ইচ্ছে করলে এসো। তবে ভয় পাওয়া চলবে না।'

'পাব না।'

জামের ঝুড়ি নিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে মেইন রোডের দিকে এগোল বব, মিশা ও ডলি। অন্যেরা খুঁজতে চলল। কি খুঁজবে জানে না ওরা। টিটুকে খবরের কাগজটা শুঁকিয়ে নিল। যে ফেলে গেছে ওটা, তাকে খুঁজে বের করতে বলল। সোজা গাঁয়ের দিকে রওনা দিল টিটু। বহু বলেও তাকে বোঝানো গেল না, গোঁ ধরেছে যেন গাঁয়েই যাবে।

'আশ্চর্য! কাগজের ব্যাপারে মোটেও ইন্টারেস্টেড নয় ও,' কিশোর বলল। 'যা, বিদেয় হ। ববদের সঙ্গে চলে যা। তোকে ছাড়াই খুঁজতে পারব আমরা।'

অনুমতি পেয়ে উল্টো কাজটা করল টিটু। এতক্ষণ যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে গিয়েছিল, এখন দাঁড়িয়ে রইল।

'চলো, রাস্তা ধরে আরেকটু উঠে দেখি,' রবিন বলল। 'দেখি, কিছু পাই কিনা।'

কিছুদূর গিয়ে আরেকটা পথ পাওয়া গেল। আড়াআড়ি কেটেছে প্রথমটাকে। আর এগোনো কঠিন। কাদা হয়ে আছে রাস্তায়। প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল। তাতে কাদা হয়েছে। গরু হেঁটে গিয়ে সেটা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

'ইস্, কী কাদা!' মুখ বাঁকাল মুসা। 'এর ভেতর দিয়ে যেতে পারব না। ঘুরে গেলে কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। এই কাঁটা পেরোনো অসম্ভব।'

'বুট পরা থাকলে কাদা মাড়িয়েও যেতে পারতাম।' হাত তুলে দেখাল রবিন, 'ওই দেখো, কাদার মধ্যে জুতোর ছাপ। ওয়েলিংটন বুটের মতই লাগছে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ,' অনিতা বলল। 'হিল-ওয়াকিং বুটও আছে।'

'বুট ছাড়াও কাদা পার হওয়া যায়।' পা থেকে জুতো-মোজা খুলতে আরম্ভ করল কিশোর। 'কাদা আমাকে আটকাতে পারবে না।'

মুসা, রবিন আর অনিতাও জুতো খুলে ফেলল। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। অন্ধকারের দেরি নেই। তা ছাড়া ববকে বলে দিয়েছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে না ফিরলে বাড়িতে খবর দিতে।

জুতো-মোজা বওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এখানে কেউ জুতো চুরি করতে আসবে না। পথের পাশেই ওগুলো ফেলে রেখে কাদায় পা দিল ওরা। আগে নামল মুসা। তাকে অনুসরণ করল রবিন আর অনিতা। গোড়ালি পর্যন্ত ডেবে গেল কাদায়।

ফ্যাকড়া বাধাল টিটু। কিছুতেই কাদায় নামতে চাইল না। বাধ্য হয়ে তাকে কোলে তুলে নিল কিশোর।

পিছলে পড়ার ভয়ে মেপে মেপে পা ফেলল সবাই। আছাড় খেয়ে কাদায় মাখামাখি হতে চায় না।

নিরাপদেই কাদার ওপারে এসে পৌছল।

ওপাশে জুতোর ছাপ বেশ স্পষ্ট।

'অনুসরণ করে যাওয়া যাবে সহজেই,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ, ছাপ খুব পরিষ্কার,' কিশোর বলল।

'ভাগ্যিস কাদাটা হয়েছিল,' সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে মুসাকে। 'কাজ সহজ করে দিল আমাদের।'

ছাপ অনুসরণ করে নির্জন একটা পোড়ো খামারবাড়িতে এসে পৌঁছল ওরা। একটা পাশ ধসে পড়েছে বাড়িটার। আইভি লতায় ছেয়ে আছে। গাছ গজিয়েছে ভাঙা জানালায়। চিমনির মাথায় কাকের বাসা।

'খারাপ জায়গা! ভয় লাগে!' অনিতা বলল। 'লাখ টাকা দিলেও রাতে একা আসতে পারব না এখানে।'

'এখন রাত নয়,' কিশোর বলল। 'অকারণ ভয় পাচ্ছ, অনিতা। এলেই যখন, ঝামেলা কোরো না।'

বাড়ির কাছে একটা ঝোপের আড়ালে সবাইকে লুকিয়ে পড়তে বলল সে। চুপ থাকতে ইশারা করল। ভিতরে কেউ আছে কিনা বোঝার জন্যে একটা পাথর তুলে নিয়ে দরজা সই করে ছুঁড়ে মারল।

পচে গেছে দরজার কাঠ। নরম হয়ে গেছে। শব্দ হলো ধ্যাপ করে। পাথরের আঘাতে দাগ হয়ে গেল।

ঝোপের আড়ালে চুপ করে বসে অপেক্ষা করতে লাগল গোয়েন্দারা।

পার হয়ে গেল কয়েক মিনিট। কিছুই ঘটল না। সাড়া এল না ভিতর থেকে। কেউ বেরোল না।

'আমি যাচ্ছি।' উঠে দাঁড়াল কিশোর।

টিটুকে সাথে নিয়ে সাবধানে এগিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতরে। পিছনে এল অন্য তিনজন।

বড় একটা অন্ধকার ঘরে ঢুকেছে ওরা। আইভি লতায় ছাওয়া একটা জানালার সামান্য যে ফাঁক-ফোকর আছে সেখান দিয়ে ম্লান আলো আসছে ঘরে।

অন্ধকার চোখে সয়ে এলে পাথরের বিশাল ফায়ারপ্লেসটা দেখতে পেল ওরা। কালো হয়ে আছে। একসময় নিশ্চয় গনগন করে জ্বলত ওখানে সতেজ লাল আগুন। এখন ওখানে কাঠ নেই, ছাইয়ের উপর পড়ে রয়েছে ছাত থেকে ভেঙে পড়া কয়েক টুকরো টালি।

আঙুল তুলে দেখাল কিশোর, 'পেঁচা!'

অন্যেরাও মুখ তুলে তাকাল।

'তিনটে!' মুসা বলল।

ছাতের একটা অংশ বসে গেছে। ওখানে বর্গার উপরে একটা ফোকর। সেই ফোকরে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে পেঁচাগুলো।

'চোখ পাকিয়ে তাকায় না কেন?' অনিতা বলল, 'গোল গোল চোখ?'

'ঘুমিয়ে আছে,' কিশোর বলল। 'খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে দেখো না কি করে।'

'থাক, জাগানোর দরকার নেই,' মুসা বলল। 'ঘুমের মধ্যে খোঁচা দিলে আমিও রেগে যাই।'

'দেখো!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'আমাদের আগে কেউ ঢুকেছিল!'

নিচু হয়ে ঘরের কোণ থেকে কি যেন তুলে নিল সে। বন্ধুদের দেখাল। হাতের ছড়ানো তালুতে কয়েকটা উইনেক্স সিগারেটের পোড়া টুকরো। আরও অনেকগুলো টুকরো পড়ে রয়েছে মেঝেতে।

'গোটা পঞ্চাশেক হবে,' বলল রবিন। 'তারমানে বহু সময় কাটিয়েছে এখানে লোকগুলো।'

'চোরের আস্তানা নাকি?' মুসার প্রশ্ন। 'মেঝেতে দেখো, ধুলোর মধ্যে কত পায়ের ছাপ।'

এগিয়ে গিয়ে সিগারেটের টুকরোগুলো শুঁকল টিটু। তারপর দাঁত বের করে মৃদু গরগর করে উঠল।

'বেরিয়ে যাওয়া দরকার,' অনিতা তাড়া দিল। 'কখন আবার এসে পড়ে ব্যাটারা। আর বেরোতে পারব না তাহলে, আটকা পড়ব। বেরোনোর একমাত্র পথ ওই দরজা।'

অনিতার কথায় একমত হতে পারল না কিশোর। যে জানালা দিয়ে আলো আসছে সেটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঠেলে দেখল খোলা যায় কিনা। কিন্তু আইভির জালের জন্যে নড়াতেই পারল না পাল্লা।

এইবার সায় জানাল, 'হ্যাঁ, ওটাই একমাত্র পথ। লতাগুলো এখানে শিকের কাজ করছে। বেরোনো যাবে না এদিক দিয়ে।'

'ওপরে উঠে লুকানো যায় অবশ্য,' রবিন তাকিয়ে রয়েছে ছাতের দিকে। 'ডেবে গেছে, তবে আমাদের ভারে ছাতটা ভেঙে পড়বে বলে মনে হয় না। ভাল দিকটায় থাকব আমরা। সহজে খুঁজে পাবে না চোরেরা।'

'তাই মনে হচ্ছে। বীমটা খুব শক্ত, নইলে এতদিনে ভেঙে পড়ত,' কিশোর বলল। 'যা দেখার দেখলাম। আর দেরি করে লাভ নেই। চলো বাড়ি যাই।'

বেরিয়ে এল ওরা।

বাইরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন অনিতা। পুরানো বাড়িটার ভিতরের পরিবেশ কেমন যেন অদ্ভুত, গা ছমছম করে।

আঁধার হয়ে আসছে। গোধূলির আলোয় এগিয়ে চলল ওরা। কাদা পেরোনোর সময় আগের মতই সাবধান হলো, ফলে এবারেও পা পিছলে আছাড় খেল না কেউ। ওপাশে এসে তুলে নিল যার যার জুতো-মোজা। তবে পায়ে যে-রকম কাদা লেগেছে পরার আর উপায় নেই।

'আস্ত একটা সাবান লাগবে এই কাদা তুলতে,' অনিতা বলল। 'গরম পানি তো লাগবেই।'

'ওসব কিছুই লাগবে না,' কিশোর বলল। 'যাওয়ার পথে ঝর্না থেকেই ধুয়ে নিতে পারব।'

'জলদি চলো। রাত হয়ে যাচ্ছে,' সময় নষ্ট করতে রাজি নয় মুসা। বেশি রাত করে গেলে মা বকা দেবেন।

ঝর্নাটা বেশি দূরে না। ওখানে এসে পা ধুয়ে নিল সবাই। টিটুর ওসব বালাই

নেই, সে প্রাণভরে পানি খেয়ে নিল।

কিশোরদের বাড়িতে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে মিশা, ডলি আর বব। ওদেরকে জানানো হলো সব। সবাই মিলে ঠিক করল আগামীকাল আবার যাবে খামার-বাড়িটাতে। দিনের আলোয় দেখবে, আরও কোন তথ্য জানা যায় কিনা। ছাউনির দরজার নিচ দিয়ে ঠেলে দেয়া সেই চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে অস্বস্তিতে ভুগছে ওরা, কেবলই মনে হচ্ছে, অদৃশ্য থেকে কে যেন চোখ রাখছে ওদের উপর!

নয়

পরদিন শনিবার। দুটো নাগাদ বেরিয়ে পড়তে পারল দলটা খামার-বাড়ির উদ্দেশে। এবার আর টিটুকে নিল না সাথে। লুকিয়ে থাকার সময় শব্দ করে সব ফাঁস করে দিতে পারে, এই ভয়ে। অনেক কুঁই-কাঁই করল বেচারা যাওয়ার জন্যে, কিন্তু দেখেও দেখল না কিশোর।

বাড়িটাতে যাওয়ার আরও পথ আছে। কাদা না মাড়িয়েও যাওয়া যায়। সেই পথই ধরল ওরা আজ। সাইকেল চালিয়ে এল পুরানো মিলটা পর্যন্ত, সেখানে একটা খাদের মধ্যে সাইকেলগুলো রেখে বনের ভিতর দিয়ে এগোল পায়ে হেঁটে।

এসে দাঁড়াল বাড়িটার পিছন দিকে। দরজাটা সামনে। কেউ চোখ রাখলে ওদিক দিয়েই রাখবে। গোয়েন্দাদের উপর তার নজর পড়ার কথা নয়। চিমনির উপর কা-কা করছে কয়েকটা কাক। ঝগড়া করছে। উড়ে যাচ্ছে। আবার গিয়ে বসছে।

'লুকানোর একটা ভাল জায়গা বের করতে হবে,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'তারপর চোখ রাখব দরজার ওপর।'

'কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে?' রবিন বলল। 'না-ও তো আসতে পারে আজ ওরা।'

'তা পারে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তবে আসার সম্ভাবনাই বেশি, যদি এটা ওদের আস্তানা হয়ে থাকে।'

'ভেতরে গিয়ে দেখলেই তো পারি,' মুসা পরামর্শ দিল। 'আমরা কাল যাওয়ার পর আর এসেছিল কিনা?'

'বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। ভেতরেই হয়তো আছে এখন।'

'কিংবা আমরা ভেতরে ঢুকলে এসে হাজির হতে পারে,' বব বলল।

'সাথে পিস্তল-টিস্তল রাখে না তো?' ভয়টা চাপা দিতে পারল না মিশা।

'রাখতেও পারে,' বলল রবিন।

আরও ভয় পেয়ে গেল মিশা। চিঠিতে দেয়া হুমকির কথা ভাবছে। অন্যেরাও ভয় পাচ্ছে ভিতরে ভিতরে, তবে প্রকাশ করছে না।

দরজায় চোখ রাখতে হলে পাশ দিয়ে ঘুরে আসতে হবে। কিশোরের পিছনে এগোল সবাই। দরজাটা দেখা যেতেই দাঁড়িয়ে গেল।

'ভাগাভাগি হয়ে যাব আমরা,' নিচু কণ্ঠে বলল কিশোর। 'রবিন, বব, তোমরা রাস্তা ধরে খানিকটা গিয়ে লুকিয়ে পড়ো। কাউকে আসতে দেখলেই পাথর ছুঁড়ে মারবে বাড়ির দেয়ালে। আমরা বুঝে যাব।'

'আচ্ছা,' রবিন বলল।

'আর একদম নড়বে না, আমি বললে তারপর যা করার করবে।'

রবিন আর বব রওনা হয়ে গেলে মেয়েদের দিকে ফিরল কিশোর। 'তোমরা ছড়িয়ে পড়ো। একেকজন একেক জায়গায় লুকাবে। বেশি দূরে যাবে না। যাতে সবার সঙ্গে সবাই যোগাযোগ রাখতে পারি আমরা। আমি আর মুসা বসছি বাড়ির কাছে।'

'ঠিক আছে,' অনিতা বলল। পা টিপে টিপে এগোল।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ফিরে তাকাল একবার ডলি। তারপর ঢুকে পড়ল একটা ঝোপে।

ছড়ানো, মস্ত একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকল কিশোর আর মুসা। উবু হয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে দরজাটা।

দ্রুত কেটে গেল প্রথম একটা ঘণ্টা। চুপ করে আছে গোয়েন্দারা। খামার-বাড়ির চিমনিতে মহা হট্টগোল বাধিয়েছে কয়েকটা কাক। এক জিনিস বেশিক্ষণ ভাল লাগে না। একঘেয়ে হয়ে গেল ব্যাপারটা। বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গেল রবিন। শেষে সময় কাটানোর জন্যে পকেটনাইফ বের করে ঝোপের একটা ডাল কেটে সেটাকে চাঁছতে আরম্ভ করল। চ্যাপ্টা একটা বড় পাথরের উপর শুয়ে পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বব। দূরের মেইন রোডটা দেখা যায় এখান থেকে। গাড়ি আসছে-যাচ্ছে, করার মত আর কোন কাজ না পেয়ে সেগুলো গুনতে লাগল সে।

ঘাস ছিঁড়ে দাঁতে কাটছে অনিতা। মিশা আর ডলি বসেছে খুব কাছাকাছি। একে অন্যের দিকে চকলেট ছুঁড়ে মেরে খেলতে শুরু করল ওরা। মাঝে মাঝে মুখে পুরছে দু'একটা।

তবে কিশোর আর মুসা চুপচাপ রয়েছে।

দুই ঘণ্টা পেরোল। খামার-বাড়ির ধারেকাছে এল না কেউ। আসবে না নাকি?

পেরোল আরও একটা ঘণ্টা।

পায়ে খিল ধরে যাচ্ছে রবিনের। নড়ানো দরকার। গাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঝিমুনি এসে যাচ্ছে ববের। মেয়েরা আর নীরব থাকতে না পেরে কথা শুরু করে দিল। ইতিমধ্যে ঘাস দিয়ে একটা ছোট ঝুড়ি বানিয়ে ফেলেছে অনিতা, সেটা অন্য দুই বান্ধবীকে দেখাল।

ধমক লাগাল কিশোর। চুপ করতে বলল।

আবার নীরবতা।

মিনিট পনেরো পরে হঠাৎ ঠুক করে একটা পাথর এসে লাগল দেয়ালে। চমকে উঠল কিশোর আর মুসা।

'সঙ্কেত!' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। 'কেউ আসছে!'

মুসার কাছাকাছি রয়েছে মিশা। তার কাছে খবরটা চালান করে দিল সে।

মিশা জানাল ডলিকে।

এভাবেই খবরটা আবার ফেরত গেল ববের কাছে, পাথরটা সে-ই ছুঁড়েছিল।

পায়ের শব্দ শোনা গেল। পাথরের উপর থেকে নেমে পড়ল বব। রাস্তাটা আর চোখে পড়ছে না এখন। অনেকটা নিচে বসেছে রবিন, তার চোখে পড়ছে পায়েচলা পথটা। উত্তেজনায় বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে মিশা, অনিতা, ডলির। নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে আছে কিশোর আর মুসা। কান চেপে ধরেছে মাটিতে, যাতে এগিয়ে আসা পায়ের শব্দ শুনতে পায়। পথের মোড় থেকে কণ্ঠস্বর কানে এল আবছাভাবে। একটু পরেই দেখা যাবে কারা আসছে।

সূর্য ডুবছে, লম্বা হচ্ছে ছায়াগুলো। খামার-বাড়ির দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর আর মুসা। দুটো লম্বা ছায়া পড়তে দেখল দেয়ালে। চোখের পাতা সরু হয়ে গেল দু'জনেরই, রাস্তার দিকে তাকাল। কিন্তু চোখে রোদ পড়ায় দেখতে অসুবিধে হলো। ধীরে এগোচ্ছে রহস্যময় আগন্তুকেরা, ভারি পদশব্দ। যে-কোন মুহূর্তে গোচরে এসে যেতে পারে···

'ধুর!' দাঁতে দাঁত চাপল মুসা। 'বাবলি!'

'চুপ!' চাপা গলায় ধমক দিল তাকে কিশোর।

রাস্তা ধরে খামারবাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে বাবলি আর নিনা। পা টেনে টেনে এগোচ্ছে, কারণ পায়ে বড় মানুষের ভারি বুট।

বাবলির পায়ে ওয়েলিংটন বুট। ফিশারম্যান ব্র্যান্ড। একবার দেখেই চিনে ফেলল মুসা, ওগুলো তার বাবার জুতো। নিনার পায়ে হিল-ওয়াকিং বুট। ওর বড় ভাইয়ের।

এই তাহলে ব্যাপার! সব রহস্যের পিছনে ওই শয়তান মেয়ে দুটো! চকিতে সব বুঝে ফেলল কিশোর।

ডলি আর অনিতাকে রাস্তা থেকে জঞ্জাল সাফ করতে দেখেছিল ওরা। তাড়াতাড়ি একটা মেসেজ লিখে ফেলে রেখে এসেছিল এমন জায়গায় যাতে সহজেই চোখে পড়ে দু'জনের। ইচ্ছে করেই ভুল বানানে লিখেছে সত্যিকারের চোর-ডাকাতের কাজ বোঝানোর জন্যে। তারপর সূত্র হিসেবে কাঁটাঝোপের মধ্যে রেখে এসেছে অক্ষর কেটে নেয়া খবরের কাগজটা। সিগারেটের টুকরো আর বুটের ছাপ ফেলে এসে বোঝাতে চেয়েছে, ওসব বড় মানুষের কাজ।

বুঝতে পারছে মুসাও। গত কয়েক দিনে কি হেনস্তাটা হয়েছে, মনে করে রাগে জ্বলছে সে। এতক্ষণে বুঝতে পারল, প্রতিটি ঘটনা ঘটার পর পরই কেন বাবলি আর নিনাকে দেখা গেছে। ছাউনির দরজার নিচ দিয়ে চিঠিটাও ওরাই রেখে এসেছিল। একটা লোককে দৌড়ে যেতে দেখার কথাটাও ওদের বানানো। ঝোপের মধ্যে পাওয়া খবরের কাগজের গন্ধ শুঁকে এ-জন্যেই গাঁয়ের দিকে যেতে

চেয়েছিল টিটু। নিনা আর বাবলির পিছু নিতে চেয়েছিল কুকুরটা।

কী ঠকানোটাই না ঠকিয়েছে লধশদের! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলল মুসা, প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না। কিন্তু কিভাবে নেবে? পিছন থেকে চুপি চুপি গিয়ে কাঁচি দিয়ে এক পোঁচে বাবলির বেনিটা কাটবে? হ্যাঁ, তাই করবে। আর নিনাকে কি শাস্তি দেয়া যায়? চুলের খুব অহঙ্কার মেয়েটার। মাথা ন্যাড়া করে মাথায় পচা ডিম ভাঙলে ঠিক হয়। আরেক কাজ করা যায়। পায়ে দড়ি বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে দেয়া যায় গাছের মাথায়, সিনেমায় দেখা জংলীরা বন্দিকে যেভাবে শাস্তি দেয়...

উঠতে গেল মুসা। হাত টেনে ধরে বসিয়ে দিল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'যাবে না। শোধ আমরা নেব, তবে অন্যভাবে।'

চোখ বন্ধ করে ফেলল মুসা। জোরে দম নিয়ে বের করে দেয়ার চেষ্টা করল রাগটা। শয়তানগুলোর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে মাথা দুটো ঠুকে দেয়ার ইচ্ছেটা দমন করা খুব সহজ নয়।

খামার-বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে বাবলি আর নিনা। দু'জনের হাতেই বড় শপিং ব্যাগ।

'এত্ত ভারি!' দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল বাবলি। 'চাচা যে কি করে হাঁটে এগুলো পরে!'

ভিতরে ঢুকে পড়ল দু'জনে। খোলা রইল দরজাটা। ওদের কথাবার্তা শুনতে পেল কিশোর আর মুসা।

'কদ্দিন খেলব এ-খেলা?' নিনার কণ্ঠে বিরক্তি। 'আর পারিনে বাপু, পায়ে বড় বড় ফোসকা পড়ে গেছে।'

'ইচ্ছে করলে অনেকদিন চালিয়ে যেতে পারি,' বাবলির জবাব। 'ছাগলগুলো বুঝতেই পারেনি কিছু। ভাবছে, না জানি কি জটিল রহস্য পেয়ে গেছে! তদন্ত চালিয়েই যেতে থাকবে। আর আমরাও ওদেরকে সূত্র দিয়েই যেতে থাকব। বাঁদর-নাচ নাচিয়ে ছাড়ব।'

'এত বোকা ওরা, আগে বুঝিনি। আহারে, কিশোরের জন্যে দুঃখই হচ্ছে। নিজেকে শার্লক হোমস মনে করে। অথচ এই সামান্য রহস্যের কিনারা করতে পারছে না...হি-হি!'

ঝোপের ভিতরে শুয়ে রাগে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে কিশোরের। রাগটা সামলাল অনেক কষ্টে।

'এই, সিগারেটের টুকরোগুলো দেখেছে ওরা। ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। ভাগ্যিস সব নিয়ে যায়নি,' বাবলি বলল। 'তাহলে আর জোগান দিতে পারতাম না। চাচা অত বেশি খায় না।'

'অ্যাশট্রে খালি করতে দেখেছেন নাকি তোকে?'

'দেখেছে। বললাম, পরিষ্কার করে দিচ্ছি। খুশিই হয়েছে।' খিলখিল করে হাসল বাবলি।

হাতের মুঠো শক্ত হয়ে গেছে মুসার। ছুটে গিয়ে দুম করে একটা কিল মেরে

ওর পিঠ বাঁকা করে দেয়ার ইচ্ছেটা দমন করতে খুব কষ্ট হলো।

বকর-বকর করেই চলেছে মেয়ে দুটো।

'আজকের দিনটা পুরানো মেসেজ নিয়েই ভেবে মরুক,' বাবলি বলছে। 'কাল নতুন আরেকটা দেব। কিশোর পাশার রোম খাড়া করে দেব।...কাল সন্ধেবেলা এসে আরেকটা মেসেজ ফেলে যাব এখানে।'

'আমার ভয় করছে রে। কখন আবার চলে আসে ওরা। মুসাকে ভয় লাগে আমার, ধরে যা মারে না...'

'সব কিছুতে গায়ের জোর খাটাতে চায় গাধারা। তবে ভয় নেই, আসবে না। মুসা বলেছে, কিশোরের চাচি আজ বিকেলে কালো জামের জেলি বানাবেন। সবাই সাহায্য করবে তাঁকে।'

মনে মনে হাসল মুসা। মিথ্যে গল্পটা বানিয়ে বলে ভালই করেছে, খুশি লাগল তার। দেখল, ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে আবার বাবলি ও নিনা। মুসার কানে কানে কিশোর বলল, 'চুপ করে থাকো। একদম নড়বে না!'

রাস্তায় নেমে হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়াল নিনা। 'নাহ্, আর পারছি না! খুলে ফেলি?'

'খোলো। তবে খালি পায়ে রাস্তায় হাঁটবে না, ছাপ পড়তে পারে। ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটো।'

নিনা জুতো খোলার পর কি ভেবে বাবলিও বুট খুলে রাস্তা থেকে নেমে গেল। জুতোগুলো ভরে নিয়েছে শপিং ব্যাগে। হাসাহাসি করে কথা বলতে বলতে চলেছে। আগের দিন কি করে বুট এনেছিল, বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোর আর মুসার। কালো জাম পাড়াটা ছিল ছুতো। ও ঝুড়িতে করেই জুতোগুলো এনেছিল।

বাবলি আর নিনা দূরে চলে গেলে ঝোপ থেকে বেরোল কিশোর আর মুসা। অন্যদেরকে বেরোতে বলল।

বেরিয়েই রাগে ফুঁসে উঠল মিশা, 'এত বিচ্ছু মেয়ে জীবনে দেখিনি আমি!'

ডলি আর অনিতা এত রেগেছে, কথাই বলতে পারছে না। রাগে সাদা হয়ে গেছে ববের মুখ।

'শান্ত হও,' কিশোর বলল। 'প্রতিশোধ আমরা ঠিকই নেব। মাথা গরম করলে চলবে না। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে এখন একটা প্ল্যান ঠিক করতে হবে আমাদের।'

আলোচনা করতে করতে বাড়ি চলল লধশরা। গাঁয়েও পৌছল, প্ল্যানও ঠিক হয়ে গেল ওদের। এখন শুধু সেটা প্রয়োগের অপেক্ষা।

দশ

অনেক ঘটনা ঘটল সেদিন সন্ধ্যারাতে।

ন'টার সময় হাই স্ট্রীটের পাশ দিয়ে, ছায়ায় গা ঢেকে, আলো এড়িয়ে হেঁটে চলল কিশোর, বব ও রবিন। পরনে গাঢ় রঙের পোশাক, অন্ধকারে ভালমত দেখা যায় না। পায়ে নরম সোলের জুতো।

অবশেষে নিজেদের স্কুলে পৌঁছল ওরা। রাতের এ-সময়ে বাড়িটায় মানুষ থাকার কথা নয়, নেইও। কোন শব্দ নেই। আলো নেই স্কুল বাড়ির কোন ঘরে। শুধু একধারে কেয়ারটেকারের ঘরের জানালায় দেখা যাচ্ছে ম্লান নীলচে আলো।

'টেলিভিশন দেখছেন,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'কিছু শুনতে পাবেন না।'

'টিভি দেখলে আওয়াজ নেই কেন?' রবিনের প্রশ্ন। 'সাইলেন্ট ফিল্ম দেখছেন?'

'শব্দ কমিয়েও রাখতে পারেন,' বলল বব।

দাঁড় করিয়ে রাখা দুটো গাড়ির আড়ালে এসে বসে পড়ল ওরা। ভালমত দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল আশেপাশে আর কেউ আছে কিনা। হঠাৎ পিস্তলের আওয়াজ শোনা গেল। চমকে গেল ওরা। চারপাশে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল আওয়াজটা কোনখান থেকে এসেছে। বোঝা গেল, কেয়ারটেকারের ঘর থেকে। গুলির শব্দ। টেলিভিশনে ছবি চলছে। ভলিউম ঠিকই বাড়ানো আছে, এতক্ষণ ছবির নীরব অংশ চলছিল বলে কোন শব্দ শোনেনি গোয়েন্দারা।

'নিশ্চয় ওয়েস্টার্ন কিংবা মারামারির ছবি চলছে,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'ভালই হলো। দরজা ভাঙার শব্দ শুনতে পাবেন না।'

শেষবারের মত আরেকবার চারপাশটা দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

খেলার মাঠের কিনারে দেয়াল, সেটার কাছে চলে এল তিনজনে। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ঠেস দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াল বব, যাতে তার কাঁধে ভর দিয়ে উপরে উঠে যেতে পারে কিশোর। লাফ দিয়ে নামল অন্য পাশে, খেলার মাঠে।

কিশোরের পর দেয়ালে উঠল বব। নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে প্রায় টেনে-হিঁচড়ে তুলল রবিনকে। দু'জনেই লাফিয়ে নামল মাঠে।

রওনা হয়ে গেছে ততক্ষণে কিশোর। স্কুল বাড়ির বাঁ-দিকে। খোয়া বিছানো পথ এড়িয়ে চলছে, শব্দ হওয়ার ভয়ে। মাঠের ঘাসের উপর দিয়ে নিঃশব্দে চলা সহজ। বাঁ-দিকেই রয়েছে সাইন্স ল্যাবরেটরি। ফিজিকস আর কেমিস্ট্রি ল্যাবের পাশ কাটিয়ে এসে বায়োলজি ল্যাবের সামনে থামল।

প্রয়োজনটা ওদের এখানেই।

সাবধানে ল্যাবরেটরির দিকে এগোল ওরা। ভাগ্য ভালই বলতে হবে। একটা

জানালা খোলা পাওয়া গেল। রবিনের মনে পড়ল, শুক্রবার বিকেলে বায়োলজি টীচার ওটা খুলেছিলেন রাসায়নিক পদার্থের বিশ্রী গন্ধ বের করে দেয়ার জন্যে। তারপর আর বন্ধ করা হয়নি। নিশ্চয় লাগাতে ভুলে গিয়েছিলেন।

তাতে সুবিধেই হলো ওদের। ঢুকে পড়ল সহজে। ঘরের কোথায় কি আছে ওদের জানা, কাজেই আলো জ্বালানোর ঝুঁকি নিতে হলো না। তা ছাড়া ছাতের স্কাইলাইট দিয়ে চাঁদের আবছা আলো আসছে। তাকে সাজিয়ে রাখা অসংখ্য জারের উপর পড়ে অদ্ভুত ভাবে চমকাচ্ছে সেই আলো। একটা জারের সামনে এসে থমকে গেল বব, যদিও চেনা, তবু এই পরিবেশে ওটাকে দেখে কিছুটা ঘাবড়েই গেল সে। ফরমালডিহাইডে ভেজানো একটা সাপ। দিনের আলোয় একরকম লাগে, রাতে চাঁদের আলোয় লাগছে পুরোপুরি অন্যরকম।

ল্যাবরেটরির পিছন দিকে এগিয়ে গেল ওরা। যা নিতে এসেছিল পেয়ে গেল এখানে।

*

বাড়ির চিলেকোঠায় বসে পুরানো ছেঁড়া চাদর দিয়ে পোশাক তৈরি করছে মিশা আর ডলি। অদ্ভুত পোশাক।

'গোল করে কাটা খুব কঠিন,' মিশা বলল।

সতর্ক করল ডলি, 'বেশি বড় করে ফেলো না আবার।'

ছোট দুটো গোল ছিদ্র করল মিশা। 'এবার?'

'নিচটা এ-রকম করে কাটতে হবে।' কাঁচি দিয়ে কেটে দেখিয়ে দিল ডলি। 'দেখে যাতে মনে হয় সত্যি সত্যি।'

গভীর মনোযোগে ওদের কাজ দেখতে দেখতে হঠাৎ ঘাউ করে উঠল টিটু। যেন কি করে কাটতে হবে সে-ও বোঝাতে চাইছে মিশাকে।

মিশা বলল, 'চুপ থাক। পণ্ডিতি করতে হবে না আর।'

*

অনিতা তখন ওদের বাড়ির গ্যারেজে বাবার যন্ত্রপাতির বাক্স ঘাঁটছে। হাঁপিয়ে গেছে খুঁজতে খুঁজতে। কালিতে মাখামাখি হাত। যে জিনিস খুঁজছে, পায়নি এখনও।

হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়ার যখন অবস্থা, তখন পাঁচ নম্বর বাক্সটায় পেয়ে গেল ওগুলো। চওড়া হাসি ফুটল মুখে। নিঃশ্বাস ফেলল বড় করে।

চারটে লম্বা লম্বা শিকল বের করে আনল। নিয়ে গিয়ে বসল ওয়ার্ক-বেঞ্চে। রঙ করতে হবে এখন ওগুলোয়।

*

খুব স্বাভাবিক চেহারা করে বাবা-মা আর বাবলির সঙ্গে বসে টেলিভিশন দেখছে মুসা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে লধশের সবাই জরুরি কাজে ব্যস্ত হলেও কেবল তারই যেন কোন কাজ নেই। কিন্তু টেলিভিশন দেখতে বসে সবচেয়ে জরুরি কাজটাই করছে সে। বাবলিকে চোখে চোখে রাখছে।

টিভি দেখা হলে উঠে পড়ল সে। শোবার ঘরে চলল। তার পিছু নিল বাবলি। সিঁড়িতে উঠে উসখুস করতে লাগল।

'কি, কিছু বলবে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আচ্ছা, চোরগুলোকে ধরতে পারেনি পুলিশ, না? মুদি দোকানে যারা চুরি করার ফন্দি করেছিল?'

'না,' হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা। 'ধরবে কি? কোন সূত্রই পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আশ্চর্য! এতই চালাক!' হাসল বাবলি। হাসিমুখে চলে গেল নিজের ঘরের দিকে।

কোনমতে রাগ চেপে ঘরে এসে ঢুকল মুসা। দরজায় ছিটকানি লাগিয়ে এসে বসে পড়ল বিছানায়। বালিশে কিল মেরে গায়ের ঝাল কিছুটা কমাল। ওই বাবলি শয়তানটার জন্যে যত হেনস্তা তার। নইলে সবাই যখন মজার কাজে ব্যস্ত, সে একলা কিনা ঘরে বন্দি, বিছানায় শুয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। কাল সব চুকেবুকে যাক! তারপর দেখাব মজা! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে গায়ের জোরে আরেকটা কিল মারল বালিশে।

মন অনেকটা শান্ত হলে বিছানা থেকে উঠল সে। পর্দা টেনে দিয়ে ঘুমানোর অভ্যাস তার। জানালার কাছে গিয়েই বাগানে চোখ পড়ল, একটা আলোর ঝলক দেখল বলে মনে হলো! প্রথমে ভাবল চোখের ভুল, কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন আবার দেখল তখন আর ভুল বলে উড়িয়ে দিতে পারল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। আবার দেখা গেল আলো। নির্দিষ্ট একটা সময় বিরতি দিয়ে দিয়ে জ্বলতেই থাকল আলোটা। ফিরে এসে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে আবার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে।

বাবলি!

নিজের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে টর্চের সাহায্যে সঙ্কেত দিচ্ছে। মর্স কোড!

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। ঘন মেঘের আড়ালে চলে গেছে চাঁদ। তাকে দেখেনি বাবলি।

ওই সঙ্কেত মুসাও বোঝে। বাবলি জানাচ্ছে: *আগামী কাল সানডে মার্কেটে দেখা করবি। অপারেশন লধশের ব্যাপারে তখন আলোচনা করব। গুড নাইট। বাবলি।*

রাস্তার ওপাশের আরেকটা বাড়িতে জ্বলে উঠল আবার টর্চ। নিনাদের বাড়ি ওটা। মর্স কোডে জবাব দিল নিনা: *ঠিক আছে। ন'টায় বাস্কেট স্টলে দেখা হবে। গুড নাইট। নিনা।*

বাবলির জানালা বন্ধ হয়ে গেল।

মুচকি হাসল মুসা। বিড়বিড় করে বলল, 'যেয়ো ওখানে, কপালে দুঃখ আছে তোমাদের!'

এগারো

সানডে মার্কেটটা বেশ বড়। ন'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি থাকতেই পৌঁছে গেল সেখানে মুসা। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে চোখ রাখল ঝুড়ির দোকানটার উপর। ওখানেই দেখতে পেল সেই লোকটাকে, স্কুলের গেটে সেদিন এতিম বাচ্চাদের জন্যে চাঁদা সংগ্রহ করছিল যে লোকটা।

মিনিট দুই পরে নিনা এল। মুসাকে দেখেই চোখ ফিরিয়ে নিল আরেক দিকে।

ন'টা বাজতে এক মিনিটে এল বাবলি। নিনার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে গেল ভিড়ের দিকে। পিছু নিল মুসা। ফিরে তাকাল একবার বাবলি। তারপর হঠাৎ নিনার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল একসারি দোকানের মাঝের একটা গলিতে। দৌড়ে গেল মুসা। কিন্তু উধাও হয়ে গেছে মেয়ে দুটো। কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য আবার ওদেরকে খুঁজে বের করে ফেলল সে। একটা সব্জির দোকানের কাছে মাটিতে বসে আছে ওরা।

'আমাদের পিছে লেগেছ কেন?' রেগে উঠল বাবলি।

'কচি খুকি তো,' হেসে বলল মুসা, 'হারিয়ে যাও যদি। পাহারা দিচ্ছি।'

'সারাদিনই থাকবে নাকি এখানে?' শঙ্কিত মনে হলো নিনাকে।

'দরকার হলে নিশ্চয় থাকব। অন্তত ছ'টা পর্যন্ত তো থাকবই। তারপর অবশ্য আর পারব না।'

'কেন? তারপর কি বোলতায় কামড়াবে?'

'সিনেমায় কামড়াবে।'

'সিনেমায় কামড়ায় কি করে?'

'ও তুমি বুঝবে না। লধশরা সবাই মিলে আজ সিনেমায় যাবে।'

'নিনা,' বাবলি বলল, 'বাড়ি যা। ছ'টায় আবার দেখা হবে।'

বাড়ি ফিরে চলল বাবলি। পিছু নিল মুসা। গির্জার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখা গেল সেই তরুণকে, চাঁদা তুলছে। বিড়বিড় করে কিছু বলল বাবলি। বোঝা গেল না।

*

সারাটা দিন বাবলির ছায়াসঙ্গী হয়ে রইল যেন মুসা। একটা মিনিটের জন্যে চোখের আড়াল করল না। এমনকি যখন নিজের শোবার ঘরে যাবে বলল বাবলি, তখনও না। কিছুতেই তাকে খসাতে পারল না বাবলি।

দু'জনের কাছেই দুপুরটা আজ অস্বাভাবিক দীর্ঘ মনে হলো।

ছ'টা বাজার ঘণ্টা শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল দু'জনেই। জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল মুসা। বাবলিকে বলে গেল, তাড়াতাড়ি না গেলে সিনেমা হলে

পৌছতে দেরি হয়ে যাবে।

বাবলির তাড়া নেই। নিজের ডেস্কের ড্রয়ার খুলে একটা কাগজের টুকরো বের করল। তাতে বড় হাতের ইংরেজি অক্ষরে যা লিখল তার বাংলা করলে দাঁড়ায়: *শেষবারের মত সাবধান করছি। এরপর খুন হয়ে যাবে!*

ইচ্ছে করেই বানান ভুল করল দুটো।

*

গাঁয়ের বাইরে বন্ধুদের সাথে দেখা করল মুসা। সিনেমায় যাবার কথা বলে বাবলিকে ফাঁকি দিয়ে এসেছে সে।

মলিন হয়ে আসছে দিনের আলো। আগে আগে চলেছে কিশোর। তার পিছনে বব আর রবিন, কালো কাপড়ে মোড়া একটা বোঝা বয়ে নিয়ে চলেছে। স্কুলের ল্যাবরেটরি থেকে নিয়ে এসেছে। ডলি আর মিশার হাতে সাদা কাপড়ের দুটো পুঁটলি। তাদের পিছনে মুসা আর অনিতা, ভারি একটা ক্যানভাসের ব্যাগের দুই হাতল ধরে বয়ে নিয়ে চলেছে দু'জনে।

পুরানো মিলটার কাছে এসে কাদা এড়ানোর জন্যে মোড় নিয়ে রাস্তা থেকে নেমে বনের ভিতর দিয়ে এগোল।

পুরানো খামার-বাড়িতে পৌছতে পৌছতে সূর্য ডুবে গেল। টর্চ জ্বেলে ভিতরে ঢুকল কিশোর। বব আর রবিন বাদে বাকি সবাই ঢুকল ওর সঙ্গে।

ভিতরে ঢুকে অবাক হলো গোয়েন্দারা।

হাত তুলে দেখাল মিশা, 'দেখো, আগুন জ্বেলেছিল কেউ!'

ঘরের কোণে পড়ে থাকা কয়েকটা টিন দেখাল অনিতা, 'কাল ওগুলো ছিল না!'

'নিনা রেখে গেছে,' কিশোর বলল। 'বাবলি আসতে পারেনি। তাকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রেখেছে মুসা।'

'যদি না আসে ওরা?' ডলির প্রশ্ন।

'আসবেই। বলেছে যখন আসবে, কিছুতেই না এসে থাকতে পারবে না,' মুসা বলল।

'জলদি রেডি হওয়া দরকার আমাদের,' তাগাদা দিল কিশোর।

কাটা চাদরগুলো খুলল মিশা আর ডলি। দুটো চাদর দেখিয়ে মিশা বলল, 'এ-দুটো রবিন আর ববের জন্যে।'

'আর এই যে শিকল,' ক্যানভাসের ব্যাগ খুলে বের করে দিয়ে বলল অনিতা। রূপালি রঙ করেছে, চকচকে। 'রঙ এখনও ভালমত শুকায়নি। আস্তে করে ধরো।'

ডলি, অনিতা আর মিশাকে নিয়ে উপরতলায় উঠে গেল মুসা। ছাত যেখানটায় বসে গেছে, সেখান থেকে দূরে রইল।

'তাড়াতাড়ি করো,' নীচ থেকে সিঁড়ির মাথায় টর্চের আলো ধরে রাখল কিশোর।

দ্রুত শেষ হয়ে গেল পোশাক পরা। সাদা চাদর পরা চারটে 'ভূত'কে দেখে

হাসি সামলাতে পারল না কিশোর। ভূতগুলোর হাতে আবার একটা করে রূপার শিকল। 'দারুণ! দারুণ! দেখেই কলজের পানি শুকিয়ে যাবে ওদের!'

ঘর থেকে আবার বেরিয়ে এল সে। বব আর রবিনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ঢুকল একটা বড় ঝোপের ভিতরে। কালো কাপড়ে মোড়া জিনিসটা মাটিতে নামিয়ে রেখে বব আর রবিনও ভূত সাজতে আরম্ভ করল। জিনিসটার কালো কাপড়ের মোড়ক খুলল কিশোর। বেরিয়ে পড়ল একটা কঙ্কাল।

'কাজ শেষ করে আবার চুপে চুপে রেখে আসতে হবে ল্যাবে,' কিশোর বলল। 'নইলে বায়োলজি স্যারের ধোলাই আছে কপালে...'

কথা শেষ হলো না। কণ্ঠস্বর কানে এল। নিনা আর বাবলি আসছে।

কঙ্কালটার পাশে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। দুটো টর্চের আলো দেখা গেল। বড়দের বুট পরে পা টেনে টেনে এগিয়ে আসছে বাবলি আর নিনা। কোন সন্দেহ জাগল না ওদের মনে। সোজা এগোল খামার-বাড়ির দিকে।

উপর থেকে ওদেরকে ঘরে ঢুকতে দেখল মুসারা। নীরব হাসিতে ফেটে পড়ল চারজনেই।

'আরি, এই টিনটা এল কোত্থেকে?' অবাক হয়ে বলল নিনা।

'আগুনও জ্বেলেছে দেখি!'

'কার কাজ?'

'কি করে বলব? আশ্চর্য! লধশরা করেনি। মুসা সারাদিন আমার সঙ্গে ছিল।'

'এই বাবলি,' শঙ্কা ফুটল নিনার কণ্ঠে, 'আমার ভাল্লাগছে না! ভয় করছে!'

ওদের কথাবার্তা শুনে উপরতলার চার ভূতও অবাক। সত্যিই তো, কে টিন এনে ফেলল? আগুন জ্বালল কে? ওরা ভেবেছিল, নিনার কাজ।

দ্রুত হাত চালাল বাবলি। পকেট থেকে নোটটা বের করে ফায়ারপ্লেসের উপর ফেলল।

কাজ শেষ করে ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরেছে, এই সময় কানে এল মোটর সাইকেলের শব্দ।

বারো

পাথরের মূর্তি হয়ে গেল যেন বাবলি আর নিনা।

'কে আসছে!' ককিয়ে উঠল নিনা।

টর্চ নিভিয়ে একছুটে ঘরের কোণে গিয়ে লুকাল দু'জনে। উপরতলায় 'ভূতে'রাও অবাক।

ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থেকে হেডলাইটের আলো দেখতে পেল কিশোররা। খামার-বাড়ির সামনে গিয়ে থামল একটা মোটর সাইকেল। এঞ্জিন বন্ধ করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল দু'জন লোক।

'হাতে কি?' ফিসফিস করে বলল কিশোর।
'পিস্তল?' বলল রবিন।
'উঁহু। বাক্সের মত লাগছে,' বব বলল।
ভিতরে ঢুকে টর্চ জ্বালল লোকগুলো। চিনতে পেরে অবাক হলো বাবলি, নিনা আর চার ভূত। লোকগুলো চাঁদা সংগ্রহকারী।
দরজা বন্ধ করে দিয়ে এল একজন। তারপর হাসতে লাগল। দু'জনের হাতে দুটো বাক্স। নাড়া দিতে ঝনঝন করে উঠল।
'আজ একেবারে বোঝাই হয়ে গেছে,' বলল একজন।
'মানুষ যে এত গাধা, জানতাম না,' হাসতে হাসতে বলল দ্বিতীয়জন। 'চাইলেই দিয়ে দেয়।'
'হ্যাঁ, যতদিন ওরা বোকা থাকে, আমাদের জন্যেই ভাল।'
চুপ করে রয়েছে চার ভূত।
ঘরের কোণে ভয়ে কাঁপছে নিনা আর বাবলি।
টর্চ জ্বেলে বোধহয় আগুন জ্বালার জন্যেই ফায়ারপ্লেসের দিকে এগোল প্রথম লোকটা। বাবলির মেসেজের উপর চোখ পড়তে থমকে গেল। নিচু হয়ে তুলে নিল কাগজটা। জোরে জোরে পড়ল।
চমকে গেল দ্বিতীয় লোকটা। 'ঘটনাটা কি?'
'কি আবার!' ধমকে উঠল প্রথম লোকটা, 'আগেই তো বলেছিলাম, জায়গাটা ভাল না! অন্য কোথাও আস্তানা গাড়ি। শুনলে না...'
'এই দেখো, আরও সিগারেটের টুকরো!'
'চলো, সময় থাকতে পালাই! আর একটা মিনিটও এখানে না...'
'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও! ভেদ করে ফেলেছি রহস্য,' দ্বিতীয় লোকটার টর্চের আলো গিয়ে পড়েছে ঘরের কোণে ঘাপটি মেরে থাকা নিনা আর বাবলির উপর। ভয়ে মুখ সাদা হয়ে গেছে দু'জনের।
হা-হা করে হেসে উঠল প্রথমজন। 'সাবধান না হলে খুন হয়ে যাব, না? এসো, এদিকে এসো, জলদি! দেখি, কে খুন হয়।'
সোজা দরজার দিকে দৌড় দিল নিনা আর বাবলি। কিন্তু বেরোতে পারল না। ধরে ফেলা হলো ওদের।
উপর থেকে অসহায় চোখে তাকিয়ে রয়েছে চার ভূত। বাবলিকে যত অপছন্দই করুক, এখন তার ক্ষতি হবার কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে মুসা। কিন্তু কি করবে বুঝতে পারছে না। কিশোর থাকলে ভাল হতো।
বাইরে থেকে সবই শুনতে পেল কিশোররা। এতিম আর অন্ধদের নাম করে চাঁদা তুলে মানুষকে ঠকাচ্ছে বুঝে লোকগুলোর উপর ভীষণ রেগে গেল।
'গাঁয়ে গিয়ে লোক ডেকে আনার সময় নেই!' রবিন বলল।
'গায়ের জোরেও ওদের সঙ্গে পারব না আমরা,' আফসোস করল বব।
'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে হঠাৎ বলে উঠল কিশোর।

*

পুরানো দড়ি খুঁজে বের করল লোকগুলো। নিনা আর বাবলিকে বাঁধতে শুরু করল।

নিনার হাতের বাঁধনে শেষ গিঁটটা দিয়ে একজন বলল, 'ব্যস, হয়েছে, আর ছুটতে পারবে না।'

বাবলিকে বাঁধা শেষ করেছে অন্যজন। 'গাঁয়ের লোকে তোমাদেরকে খুঁজে বের করতে করতে অনেক দূরে চলে যাব আমরা, বুঝলে।' ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল লোকটা বাবলির গালে।

একটা কথাও বলল না নিনা কিংবা বাবলি। তর্ক করলে আরও মার খেতে হবে, এই ভয়ে।

দরজার দিকে পা বাড়াল লোকগুলো।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল নিনা, 'ভূত! ভূত!'

চমকে ফিরে তাকাল লোকগুলো। ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল একজন, 'এই, চেঁচাও কেন? কোথায় ভূত? চালাকির আর জায়গা পাওনি...'

'ও-ওই যে, ওখানে!' ছাতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে নিনা। চোখ ছানাবড়া।

'সত্যিই তো! মাগো!' বাবলিও চিৎকার শুরু করল। 'ছেড়ে দিন আমাদের! ছেড়ে দিন! দোহাই আপনাদের! ঘাড় মটকে মেরে ফেলবে!'

আবার চিৎকার করে উঠল নিনা। পাগলের মত বাঁধন খোলার চেষ্টা করছে। দেখে মনে হচ্ছে চোখ উল্টে দিয়ে পড়ে যাবে।

উপর দিকে তাকাল লোকগুলো। হাঁ হয়ে গেল। ওরাও দেখেছে। সাদা পোশাকের ঝুল নাচিয়ে নাচানাচি করছে ভূতেরা, হাতে রূপার শিকল।

'এই, জলদি চলো! কুইক!' কাঁপা গলায় বলল একজন লোক। 'জায়গাটা সত্যিই ভাল না!'

দরজায় থাবা পড়ল তিনবার।

স্তব্ধ হয়ে গেল লোকগুলো। পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। কি করবে বুঝতে পারছে না। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে নিনা আর বাবলি। হঠাৎ চুপ হয়ে গেল, একটা লোককে ছুরি বের করতে দেখে।

'আমি দরজা খুলছি,' সঙ্গীকে বলল লোকটা। 'বিপদ দেখলেই ছুরি চালাব! তুমি আমাকে সাহায্য করবে।'

পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা। আস্তে করে ছিটকানি নামিয়ে এক টানে খুলে ফেলল পাল্লা। দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল কঙ্কালটা। পড়ল একেবারে লোকটার গায়ের উপর। বিকট চিৎকার দিয়ে গা থেকে কঙ্কালটাকে ঠেলে ফেলে দিল লোকটা। লাফ দিয়ে সরে গেল।

আতঙ্কে বাবলি আর নিনার মতই গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করল দ্বিতীয়জন।

কঙ্কালটাকে মাটিতে ফেলে আর দাঁড়াল না প্রথমজন। ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দ্বিতীয়জনও পিছু নিল তার।

বাইরে বেরিয়ে আবার চিৎকার করে উঠল প্রথমজন, 'সর্বনাশ! চাকা বসে গেছে! দুটো চাকাই লিক! বাবারে, কী ভূতুড়ে জায়গা-গো!'

মোটর সাইকেল ফেলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই বুঝতে পেরেও দ্বিধা করতে লাগল লোকটা। ঠিক এই সময় তার বুক আরও কাঁপিয়ে দিতে ঝোপের ভিতর থেকে ভূতের সাজে বেরিয়ে এল কিশোর, রবিন আর বব। কঙ্কালটাকে দরজায় ঠেস দিয়ে রেখে আবার ঢুকেছিল ঝোপের ভিতরে।

আতঙ্কে রীতিমত কাঁপতে শুরু করল লোকগুলো। মোটর সাইকেলের মায়া কাটাতে দেরি হলো না। এমন দৌড় দিল যেন অলিম্পিক গেমে অংশ নিয়েছে।

ঘরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। মেঝেতে পড়ে রয়েছে টর্চ দুটো। আলো নেভেনি। দেয়ালে আলো-ছায়ার খেলা। মেঝেতে পড়ে আছে হাত-পা বাঁধা বাবলি আর নিনা। ওদের কাছ থেকে সামান্য দূরে কঙ্কালটা। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে চার ভূত।

বাবলি আর নিনার অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে ওদের চারপাশ ঘিরে বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচানাচি শুরু করল ভূতেরা।

অনিতা গোঙাচ্ছে। যেন কবর থেকে উঠে এসেছে রক্তলোভী ভয়ঙ্কর এক অতৃপ্ত প্রেত।

হঠাৎ চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে 'ভউ ভউ' করে উঠল মিশা। ডলি ডেকে উঠল, 'মিয়াঁও! হিঁ-হিঁ-হিঁ হুঁ-হুঁ-হুঁ হাঁ-হাঁ-হাঁ-হাঁ-হাঁ-হাঁ!' এমন বিকট চিৎকার করে উঠল রবিন যে কিশোর পর্যন্ত থমকে গেল।

কাঁদতে ভুলে গেছে বাবলি আর নিনা—কান্নার ভঙ্গিতে হাঁ হয়ে রয়েছে শুধু মুখ। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ। ভয়ে পাথর হয়ে গেছে।

মুসা আর ববকে কঙ্কালটা তুলে নিয়ে এগোতে দেখে হাত তুলে থামতে বলল কিশোর। বলল, 'ব্যস, ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে। এবার থামো সবাই।' ভূতের পোশাক খুলে হাসল সে।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল বাবলি আর নিনা। স্বস্তিতে! ক্ষোভে! দুঃখে! অপমানে!

*

লধশদের দেয়া তথ্যের সাহায্যে দিন কয়েক পরে পাশের এক শহর থেকে দুই ভুয়া চাঁদাবাজকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মানুষকে ফাঁকি দিয়ে যে টাকা জোগাড় করেছিল, বেশির ভাগটাই রয়ে গেছে। খুব একটা খরচ হয়নি। সেই টাকা চাঁদাবাজদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এতিমখানায় পাঠিয়ে দিল পুলিশ।

তার পরদিন এসে লধশদের সঙ্গে দেখা করলেন বিশালদেহী ক্যাপ্টেন রবার্টসন। বললেন, 'কাউন্সিল তোমাদের একটা পুরস্কার দিতে চায়। দেখা করতে বলেছে।'

'যাব,' জবাব দিল কিশোর।ং

'কি পুরস্কার চাইবে?'

ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে সরে গিয়ে দ্রুত আলোচনা সেরে নিল লধশরা। ফিরে এসে কিশোর বলল, 'দুটো লিটার-বিন।'

'লিটার-বিন!' অবাক হলেন ক্যাপ্টেন।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'গাঁয়ের লোকের ময়লা ফেলতে খুব অসুবিধে হচ্ছে। দুটো লিটার-বিন বসিয়ে দিলে ভাল হয়। অসুবিধে আর থাকবে না।'

চুপ করে এক মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন। ধীরে ধীরে হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। মাথা ঝাঁকালেন, 'খুব ভাল জিনিস চেয়েছ। তোমাদের হয়ে আমি নিজে সুপারিশ করব কাউন্সিলকে। চলি এখন, গুড বাই।'

***

ভলিউম ৫৭

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম

তিন গোয়েন্দা।

আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০